সূচীপত্র।

(তৃতীয় অধ্যায়।)

———

তাঁহার হৃদয় অসদভিপ্রায়ী ব্যক্তির ন্যায় অন্তরালে অন্তরালে ঘুরিয়া বেড়ায়। একটুমাত্র অযশের কথা শুনিলেই আশা উদ্যম উৎসাহ একেবারে ভগ্ন হইয়া হৃদয়ে ঘোরতর অশান্তি উপস্থিত হয়। হৃদয়গত স্রোতে পরিচালিত হইয়া যাঁহারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদের এরূপ ব্যস্ততা থাকে না, অশান্তি থাকে না। তাঁহারা কেবল কার্য্যের ফলাফল দেখিবার জন্য উৎসুক। সুফল ফলিলে সুখী হয়েন, বিফল হইলেও দুঃখী হয়েন না বরং ভবিষ্যতে সতর্কতা লাভ করিয়া তাহাতেও সুখ বোধ করেন।

যে অবস্থায় মানবের কোন বিষয় শিক্ষা লাভ করিবার ইচ্ছা জন্মে, যে সময়ে অর্থলিপ্সা উপস্থিত হইয়া ধন উপার্জ্জনের নানা রূপ পথ উদ্ভাবন করে, সেই সেই সময় হইতেই কৃষিকার্য্য শিক্ষা এবং তদ্দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিবার ইচ্ছা বলবতী ছিল। কিন্তু রীতিমত কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিবার কোন উপায় আমাদের দেশে নাই। তথাচ ইচ্ছার বলবত্তা অনুসারে দেশ দেশান্তরের কৃষকদিগের কার্য্যপ্রণালী অনুসন্ধান করিয়াছি। এতৎসম্বন্ধে যেখানে যে পুস্তক, গ্রন্থ, পত্রিকাদি পাইয়াছি তাহাও পাঠ করিয়াছি। যে পর্য্যন্ত কার্য্যক্ষেত্রে প্রবর্ত্তিত হইয়া ফলাফল দেখা না যায়, তাবৎকাল এতৎ সমুদয়ের পর্য্যালোচনার দ্বারাও সিদ্ধকাম হওয়া যায় না। শেষে বহুবিধ যত্ন চেষ্টায় একটী কার্য্যক্ষেত্র সংস্থান করিয়া পরীক্ষার দ্বারা কার্য্যের ফলাফল নির্ণয় এবং তাহার কারণাদি সম্বন্ধে সাধারণ অনুসন্ধান করা হইয়াছে। অদ্য জনসমাজে তাহারই পরিচয় উপস্থিত করা হইতেছে।

একজন সুচিত্রকরের হস্তাঙ্কিত হইলে তিনি নানাবিধ বর্ণ ফলাইয়া উত্তম বর্ণে সুরঞ্জিত করিয়া নানাবিধ ভাব সংযোগে একখানি উৎকৃষ্ট চিত্র প্রস্তুত করিতে পারিতেন। দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত দিয়া যুক্তির পর যুক্তি দিয়া উত্তম ভাষায় এক খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ করিতে পারিতেন, ইহাতে তাহার সম্পূর্ণ অভাব রহিয়াছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে ইহা সম্পাদন করিতে হইয়াছে যে লিখিত বিষয় একবার পাঠ করিয়া দেখার সুযোগ হয় নাই। ভাষার প্রতি একবারেই দৃষ্টি করিতে পারি নাই, অনেক স্থলেই ঠিক কৃষকি ভাষাই রহিয়াছে। এস্থলে পাঠকদিগকে অনুরোধ করিতেছি

ভাষার সৌন্দর্য্য শিক্ষা করিবার জন্য বঙ্গভাষার পর্ণকুটীর এখন আর বড় অসম্পূর্ণ নাই, ভাষা শিক্ষার উপায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে। ইহা কেবল কার্য্য শিক্ষা করিবার জন্য, কার্য্যের কথা থাকিলেই যথেষ্ট মনে করা উচিত।

এই গ্রন্থের লিখিত বিষয় অভ্রান্ত হইয়াছে কি অসম্পূর্ণতা নাই, একথা এক মুহূর্ত্তের জন্যেও হৃদয়ে স্থান দিতে পারি না। তত্রাচ একজন বঙ্গবাসীর "কার্য্যের পরিচয়" এই কথা মনে করিয়া যদি কার্য্যক্ষেত্রে পরিণত হইবার কিছুমাত্র ও উপযোগী সম্ভব হয় অথবা কোন এক ব্যক্তির হৃদয়ে ও যদি আনন্দ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলেও পরিশ্রমের সার্থকতা এবং কৃতার্থতা মনে করিব।

নানাবিধ ফলপুষ্পাদি এবং আরও অন্যান্য বিষয় অসম্পূর্ণ রহিল। সময়াভাবে তাহা সন্নিবেশিত করিতে সমর্থ হইলাম না। সময়ান্তরে দ্বিতীয় ভাগে তাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

কৃষিতত্ত্ব এবং ব্যবসায়ী নামক পত্রিকায় কখন কখন প্রবন্ধাদি লিখিতাম, সম্পাদকের বিনানুমতিতে তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করা নিষিদ্ধ রহিয়াছে। দুর্ভাগ্য বশতঃ সম্পাদক মহাশয় অনুমতিপ্রদান করিলেন না। সুতরাং তাহা সন্নিবেশিত করা গেল না।

"ভারতের বাণিজ্য এবং কৃষি" ভারত সুহৃদ পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল. তাহা হইতে সংগৃহীত কিন্তু কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করিয়া কোন অংশ নূতন লিখিত হইয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য এই, ময়মনসিংহ সারস্বত সমিতি এই পুস্তক মূল্য আমাকে ১০০৲ এক শত টাকা পুরস্কার প্রদান করিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

সিলেট কল্টিভেটিং কোম্পানির আফিস।
পঞ্চাশ,—শ্রীহট্ট। ১২৯০ সন, ভাদ্র।

শ্রীশশিভূষণ গুহ।

ভূমিকা।

চিরাগত পদ্ধতির দ্বারাই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে যে মানব সমাজে একশ্রেণী কার্য্যকারক, এক শ্রেণী সমালোচক; একশ্রেণী কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, একশ্রেণী সেই কার্য্যের দোষ, গুণ সমালোচনা দ্বারা ভুল, ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়া তাহা সংশোধনের জন্য সমাজকে উপদেশ করেন। তাঁহারা কার্য্য না করিয়া জ্ঞানী এবং উপদেষ্টা। এই উভয় শ্রেণীর জীবন ভিন্ন ভিন্ন উপকরণে গঠিত, সদুপদেশযুক্ত বাক্যের দ্বারা, প্রকাশ্য বক্তৃতা দ্বারা এবং নানা বিধ গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা সর্ব্বদা সমাজকে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন।

যে কার্য্য সম্পাদনের জন্য যে সকল উপকরণ এবং শক্তির উপযোগিতা আবশ্যক, তৎসমুদয় উপাদান সংগৃহীত না থাকিলে কি শক্তির উপযোগিতা না থাকিলে সেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে জ্ঞানবান দূরদর্শী ব্যক্তির চক্ষে নিতান্ত কদর্য্য দৃশ্য হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তত্রাচ সর্ব্বদা। এই দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

সামাজিক জীবনে মনুষ্য প্রধানতঃ ধন এবং যশঃলিপ্সায় অধিকাংশ পরিচালিত হয়। ধন লিপ্সায় মনুষ্যকে নানা প্রকার কদর্য্য দুরূহ, কুপথেও পরিচালিত করে। যশঃলিপ্সায় মানবকে ততদূর অধঃপথে পাতিত না করিলেও উভয়ই মানবের হৃদয়াভ্যন্তরে এক প্রকার সুরা ঢালিয়া দিয়া মানবকে উন্মত্ত করিয়া তোলে। তাহাতে অনেক সময় শক্তির উপযোগিতা এবং উপকরণের অভাব সত্ত্বেও সংসারে নানা প্রকার অভিনয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আমি এই দ্বিবিধ প্রলোভনের কোনটীরই পরতন্ত্র হইয়া এই সুমহৎ কার্য্যে ব্রতী হই নাই, অথবা এই গুরুভার মস্তকে উত্তোলন করিয়া লই নাই।

এই দ্বিবিধ শক্তি ব্যতীতও আর একটী শক্তিতে মানবকে পরিচালিত করে। আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের "অনুরোধ"; যে শক্তিতে পরিচালিত হইয়া রামচন্দ্রের ন্যায় সুমহৎ জ্ঞানবান ব্যক্তিকেও সুবর্ণ মৃগের অনুসরণে ধাবিত হইতে হইয়াছিল। এ ভিন্নও কতজন কত সময় দুঃসাধ্য সমরানলে

আত্মসমর্পণ করিয়াছে, কত যে সাধ্যাতীত কার্য্যে ব্রতী হইয়া অসংসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতে পারে। বস্তুতঃ এই শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়াও লক্ষিত বিষয় আয়ত্ত অনায়ত্ত ভাব বিচার করিবার ক্ষমতা বিহীন হইয়া পড়ে। আমাকেও সেই শক্তিতে পরিচালিত হইয়া এই সুমহৎ কার্য্যে ব্রতী হইতে হইয়াছে।

অবশ্য একথা স্বীকার করি যে, একমাত্র বন্ধুর অনুরোধই এই গুরুতর ভার বহনের কারণ নয়, দর্শক বিহীন স্থানে কেহ অভিনয় করিতে ইচ্ছুক হয় না, যে কার্য্যের বিচারক নাই তাহা চিরকাল অসম্পূর্ণ। কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও তদ্রূপ কার্য্যে তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। আমারও কার্য্যগত শক্তির (Practecalty) পরিচয় দর্শকসমাজের বিচারস্থলে উপস্থিত করিবার ইচ্ছা অনেক দিন হইতে হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম, সুযোগ পাই নাই। প্রত্যেক মনুষ্যেরই হৃদয়গত কোননা কোন প্রকার একটা স্রোত থাকে, আমারও হৃদয়গত এই স্রোত অতি মন্দ মন্দ গতিতে প্রবাহিত হইতেছিল। বন্ধু অনুরোধরূপ বায়ু সেই মন্দগতি বিশিষ্ট স্রোতকে উদ্বেলিত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই ত্রিবিধ শক্তির আধিক্যই জ্ঞানীর নিকট একপ্রকার বাতুলতার পরিচয়।

কেহ মনে করিতে পারেন, যে এই ইচ্ছা যশঃ লিপ্সা সম্ভূত; বাস্তবিক তাহা নয়, যশঃ লিপ্সার পরতন্ত্র হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া আর হৃদয়গত স্রোতে পরিচালিত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া এককথা নয়; উভয়ের মধ্যে ঘোরতর বৈষম্য। এই হৃদয়গত গূঢ়ভাবের বৈলক্ষণ্য কিরূপ প্রতিপন্ন হইতে পারে? মানব সমাজে যশঃলিপ্সু ব্যক্তির ন্যায় ভীরু আর দ্বিতীয় নাই। তিনি অসাধারণ বীর হইলেও সামান্য অবলা জনাপেক্ষাও ভীরু, তাঁহার কার্য্যগত বীরত্ব থাকিতে পারে কিন্তু হৃদয়গত বীরত্ব অণুমাত্রও নাই। তাঁহার কর্ণ সর্ব্বদা আত্মগুণ-মধুর-সঙ্গীত শুনিবার জন্য ব্যস্ত; তাঁহার চক্ষু সর্ব্বদা যশঃপতাকার উজ্জ্বলতা পরিলক্ষিত করিবার জন্য লালায়িত; তাঁহার হস্ত কেবল যশের কণা তিল তিল সংগ্রহ করিবার জন্যেই অনবরত লিপ্ত রহিয়াছে। যশঃপতাকায় বিন্দুমাত্র কালীর ছিটা পড়িবে বলিয়া কি সংগৃহীত যশের কণা মাত্র স্খলিত হইবে বলিয়া

আদর্শ কৃষি।

ভারতের কৃষি এবং বাণিজ্য।

কৃষি এবং বাণিজ্যই ধন সঞ্চয়ের প্রধান সোপান। কেহ কেহ কৃষি অপেক্ষা বাণিজ্যের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের এই মতকে অভ্রান্ত বলিয়া কৃষি অপেক্ষা বাণিজ্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে পারি না। বাণিজ্য ধন প্রসব করে না। কৃষি ধনের প্রসবিনী। বাণিজ্য ধন ভাগ বৃদ্ধি করে না। কৃষি ধন ভাগ বৃদ্ধি করে। কৃষি ধনের জীবন, অধিকাংশ স্থলে, শিল্প তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠয়িতা এবং সৌন্দর্য্য-কারক। বাণিজ্য তাহার গতি শক্তি বিধায়ক। শিল্প আর বাণিজ্য না থাকিলে কৃষিজাত দ্রব্য সকলের আদর এবং ব্যবহার কমিয়া যায়। শিল্প, কৃষি এবং বাণিজ্য এই তিনের সামঞ্জস্য ব্যতীত ধন বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু মনে করুন, শিল্প এবং কৃষি ছাড়িয়া আমরা সকলেই বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইলাম। অবলম্বনীয় বস্তু নাই, অথচ অবলম্বনের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে যত্নবান হইলাম, ইহাতে কি হইবে? এক দিনেই সকলের চেষ্টা শেষ হইবে, জগতে হাহাকার শব্দ উঠিবে, বাণিজ্য শেষ হইয়া যাইবে, কিন্তু সকলে কৃষি কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেও বিষয় বিশেষে অসুবিধা হইলেও, "প্রাণ যায়" বলিয়া হাহাকার পড়ে না; বরং বৃথা অভিমান, উচ্চ নীচ বোধ, স্বার্থপরতা প্রভৃতি জাতীয় অসাম্যের মূল সকলের অবর্ত্তমানতা, কথঞ্চিৎ পরিমাণে অত্যাশ্চর্য্য নির্ম্মল সাম্য মূর্ত্তির প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। তুলনা করিলে বাণিজ্য কৃষিতে ঘোরতর বৈষম্য উপলব্ধি হয়। কৃষি প্রকৃতির ক্রোড়ে শিশু সন্তানের ন্যায় অসীভক্ত ভাবে নৃত্য করিয়া বেড়ায়, বাণিজ্য রাজনীতির কুটিলতার চিরসহচর;

উভয়ের মধ্যে বিশুদ্ধ সুখের তারতম্য করিলে কাহারও মন বাণিজ্যে কাহারও মন কৃষিতে আকৃষ্ট হয়। মানব প্রকৃতি একরূপ নহে। কেহ স্বভাবের সরল ভাবেই বিমোহিত, কেহ শিল্পের মনোহর বেশভূষার পক্ষপাতী। বাণিজ্যে চতুরতা, কপটতা, স্বার্থপরতা, সংসারের নানা প্রকার বেশভূষায় সুসজ্জিত, তথাপি অনেকের মন ইহাকে অবলম্বন করিয়াই সুখী। কৃষিতে সরলতা, বদান্যতা, নম্রতা, সহৃদয়তা, প্রভৃতি স্বভাবচিত্র দেদীপ্যমান; ইহাতেও অনেকের সুখ আছে। কৃষিতে সখ্য, বাণিজ্যে সম্মান; কালসহকারে রুচি ভেদে, যেমন সখ্য অপেক্ষা সম্মানের আদর বাড়িয়াছে, তেমন কৃষি অপেক্ষা বাণিজ্যের আদর শতগুণে বৃদ্ধি হইয়াছে। যে দুইটী কথা (সখ্য এবং সম্মান) দ্বারা আমরা বাণিজ্য এবং কৃষির তারতম্য করিলাম; তাহার বিষয় কিছু বলা আবশ্যক। হয়ত কেহ কেহ আমাদের অর্থ না বুঝিয়া উপহাস করিবেন; তজ্জন্যই এই দুইটী কথার সমালোচনার অবতারণা হইল। সম্মান, অহঙ্কার এবং অভিমানের চির সহচর; মানবমনে অল্প স্থানে গম্ভীর ভাবে বাস করে। সখ্য, সর্ব্বান্তঃকরণ ব্যাপিয়া অসতর্ক ভাবে নৃত্য করিয়া বেড়ায়। সখ্যে যে সুখ, তাহা বাক্যে, শব্দে, স্বরে, প্রকাশ করা যায় না; সে সুখ স্বরের অতীত। ভালবাসা মানবের স্বভাব; সেই ভালবাসা বাল্যে এক প্রকার, বার্দ্ধক্যে অন্য প্রকার। বাল্যকালীয় ভালবাসার অন্য নাম সখ্য; আমরা কৃষির সুখের সহিত এই সখ্যতার তুলনা করিলাম। বালক জানে না কেন ভালবাসে, অথচ তাহার স্বভাব ভালবাসার, অন্যকে না ভালবাসিয়া থাকিতে পারে না; কৃষকেরা জানে না কৃষিতে কি সুখ, অথচ তাহাদের দুঃখ নাই, তাহাদের জীবনই সুখের। বাল্যে ভালবাসা কত মধুর, বার্দ্ধক্যে তাহার কেবল মাত্র স্মৃতি থাকে, তত্রাচ কত মধুর। বাণিজ্যে সম্মান সূচক শিল্প চাতুর্য্যের সৃষ্টি, ইহাতেও সুখ আছে, সুখ না থাকিলে লোকে এত আগ্রহ সহকারে ইহার আশ্রয় লইত না। কিন্তু বাল্য সখ্যর কথা বার্দ্ধক্যে, স্মৃতিতে যত বিমল আনন্দ বিতরণ করে, রাজসম্মানেও কি তাহা আছে? কাজেই বলি, কৃষি এবং বাণিজ্যে ঘোর বৈষম্য আছে। কেহ কেহ ভক্তি এবং সম্মানকে এক চিত্রে চিত্রিত করিয়া থাকেন, একই আসনে স্থান দান

করেন, তাঁহারা সুচিত্রকর হইলেও আমরা তাহাতে যোগ দিতে পারি না। সম্মান, সঙ্কোচ, সতর্কতা এবং ভয় মিশ্রিত অপদেবতার মূর্ত্তি, সেখানে অভীষ্টের জন্য মস্তক অবনত হয়। ভক্তি অত্যাশ্চর্য্য দেবমূর্ত্তিবৎ,তাহাতে ভয় নাই, সঙ্কোচ নাই, সতর্কতা নাই, কোন অভীষ্ট নাই, চিত্তের গদ গদ ভাবে মনের অজ্ঞাতে আপনাআপনি মস্তক অবনত হয়। দুইয়ের মধ্যে এত পার্থক্য। তবে কেমন করিয়া এক আসনের যোগ্য হইবে। অভাব পূরণ করাই বাণিজ্যের প্রধান উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষে এরূপ অভাব কখনও ছিল না। অন্য দেশের সাহায্য ব্যতীত ভারতমাতা আপন সন্তানদিগকে প্রতিপালন করিতে কখনই অক্ষম হন নাই। এমন কি, যবনাধিকারের পূর্ব্বে দুর্ভিক্ষের ভীষণ মূর্ত্তির সহিত ভারতবাসীর পরিচয়ই ছিল না ; এখন সেই দুর্ভিক্ষ একেবারে "অগস্ত্য যাত্রা" করিয়া ভারতে পদার্পণ করিয়াছে, চিরপরিচিতের ন্যায় প্রতি ঘরে ঘরে বিচরণ করিতেছে। বর্ত্তমানে শিল্প জাত দ্রব্যাদির অনেক অভাব হইতেছে, তজ্জন্য বিদেশীয় বাণিজ্যের আদর বাড়িয়াছে। কাচের বিনিময়ে সোণা, সুরার বিনিময়ে তণ্ডুল, বিস্কুটের বিনিময়ে মিশ্রি, ইত্যাদি বিষয়ের বাণিজ্য দ্বারা দেশ দিন দিনই হীনপ্রভ হইয়া আসিতেছে। চতুর্দ্দিকে অন্ন বস্ত্রের কষ্ট, চতুর্দ্দিকে হাহাকার ধ্বনি। বিশেষতঃ এরূপ বাণিজ্যে কৃতকার্য্য হওয়া শান্তপ্রকৃতি, সরলমতি, ন্যায়-পর ভারতবাসীদিগের পক্ষে কত দূর সম্ভবনীয় বলিতে পারি না। তবে ইংরাজ আদর্শে ইংরেজী শিক্ষায় কি পর্য্যন্ত পারদর্শিতা জন্মিয়াছে তাহা সময় বিশেষে প্রস্তাবান্তরে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাইবে।

ভারতবর্ষীয়েরা, যেমন বিবাদ বিসম্বাদে অনগ্রসর, তেমনি অহিংসু, উদার স্বভাব, পরোপকারানুরত ; ইহাদিগের পক্ষে কৃষিই জীবনের প্রধান উপজীবিকা। আমরা স্বকল্পিত অথবা নৈতিক যুক্তির দ্বারা ইহা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইতেছি না। কৃষিকে প্রধান উপজীবিকা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য পূর্ব্বতন আর্য্য সন্তানগণের মস্তক যে বিশেষ রূপে সঞ্চালিত হইয়াছিল, তাহা মনুসংহিতা, অগ্নিপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ,কৃত্যরত্নাকর. কৃত্যচিন্তামণি 'পরাসর কৃত কৃষিসংগ্রহ' নামক সংস্কৃত গ্রন্থ সকলের দ্বারা বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন নৈসর্গিক নিয়মের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ

করিলেও লক্ষিত হইবে যে, জল বায়ু, তাপ, কৃষি উৎপাদনের প্রধান উপযোগী এবং ভূমির উর্ব্বরতার এক মাত্র অবলম্বন। ঈশ্বর অনুগ্রহেই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, এ সকল ভারতবর্ষে উপযুক্ত রূপেই বিদ্যমান। অন্য দেশে বহু যত্নে, বহু কষ্টে বহু ব্যয়ে, যে ফল উৎপন্ন না হয়, ভারতবর্ষীয়েরা অযত্নে অক্লেশে তদপেক্ষা অধিক ফল ভোগ করিতেছেন। এমন কি, ভারতের পশু পক্ষির ভোগ্য বস্তুও সকল দেশের রাজার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠেনা। যে প্রদেশের নৈসর্গিক অবস্থা যেরূপ, তদ্দেশীয় জীব জন্তুগণও তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। যে সকল দেশ নিরবচ্ছিন্ন বালুকাময় প্রান্তরে বেষ্টিত, অথবা যে প্রদেশে যে প্রকার শীত ও গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব অধিক, সেই প্রদেশের অধিবাসীরাও তদ্রূপ সহিষ্ণু এবং জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় নির্দ্ধারণে সক্ষম। ভারতবর্ষে এ সকলেরই অভাব, তজ্জন্যই ভারতীয় মনুষ্যমণ্ডলী জীবিকা নির্ব্বাহার্থে কঠিন পরিশ্রম করিতে অক্ষম। ভারতের উপজীবিকা কৃষির উপর নির্ভর করে। আবার ভারতের কৃষি স্বভাব সুলভ; তজ্জন্যই জীবনোপায় সংস্থানের জন্য কাহাকেও কষ্ট পাইতে হয় না; এই জন্যই পূর্ব্বতন আর্য্য সন্তানেরা সর্ব্বাপেক্ষা কৃষির যত্ন করিতেন। কৃষিশাস্ত্রানুরাগী পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, "অন্নং প্রাণা বলঞ্চান্নং অন্নং সর্ব্বার্থসাধকং। দেবাসুরমনুষ্যাশ্চ সর্ব্বে চান্নোপজীবিনঃ। অন্নন্তু ধান্যসম্ভূতং ধান্যং কৃষ্যা বিনা নচ। তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য কৃষিং যত্নেন কারয়েৎ। কৃষির্ধন্যা কৃষির্মেধ্যা জন্তূনাং জীবনং কৃষিঃ। হিংসাদি-দোষযুক্তোঽপি মুচ্যতেঽতিথিপূজনাৎ।" যে কৃষি এত আদরের ছিল, বর্ত্তমানে তাহাই ভারতবর্ষীয় সভ্যদিগের ঘৃণার সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। যদিচ ছল চাতুরী এবং দস্যু বৃত্তির দ্বারা ভারতের অনেক ধন, অনেক রত্ন, অপহৃত হইয়াছে, তথাপিও কৃষিচর্চ্চার সমধিক যত্ন থাকিলে দারিদ্র্য পীড়নে পীড়িত হইয়া দাসানুদাস হইতে হইত না। নিতান্ত অজ্ঞান, অশিক্ষিত ইতর প্রাণীবিশেষের ন্যায় ব্যক্তিদিগের হস্তে কৃষির ভার ন্যস্ত থাকা সত্ত্বেও উপায়হীন দুর্ব্বল সন্তানগণের প্রতি যত্ন ও মাতৃস্নেহের হ্রাস হয় নাই। আবার দেখ, বিদেশীয়েরা এই কৃষির আশ্রয় লইয়াই ভারত-

বর্ষ হইতে বিপুল অর্থের ভাণ্ডার মস্তকে বহন করিয়া স্বদেশে যাইয়া বড় লোক মধ্যে পরিগণিত হইতেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ভারতবাসীগণ আজ পর্য্যন্তও ধনের মূল কৃষির প্রতি অনাদর প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত নহেন। বিদেশীয়েরা কৃষির আশ্রয় লইয়া অর্থের উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। আমরা তাঁহাদিগের সাহায্য করিতেছি, তাঁহাদিগের অনুগত দাস হইয়া অর্থের বোঝা সাজাইয়া দিতেছি। ইহাতেই আমাদিগের সুখ! স্বদেশ অনুরাগের পক্ষপাতী হইয়া বলিতেছি না। ভারত যখন কৃষি উৎপাদনে ক্ষম, ইংলণ্ড তখন মাতৃগর্ভে জলবিন্দুবৎ। ভারতে যখন কৃষি চর্চ্চার পূর্ণাবস্থা, ইংলণ্ডে তখনও কৃষির বাল্যাবস্থা; একি সামান্য আক্ষেপের বিষয়, যে সেই ইংলণ্ড এখন ভারতের কৃষিশিক্ষার গুরু! কৃষি শিক্ষার জন্য আজ ভারতসন্তানগণকে সমুদ্র পার হইতে হয়; ইহা হইতে লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে? আমরা যদি দাসত্বপ্রিয় হইয়া কৃষি শাস্ত্রের আলোচনায় ঔদাস্য প্রকাশ না করিতাম, তবে বর্ত্তমানে অর্থ অর্থ করিয়া আমাদিগকে হাহাকার করিতে হইত না। ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য (দাসত্বে যদি সুখ থাকে) দাসত্ব সুরাপানে মত্ত হইয়া মনুষ্যত্ব হইতে আমরা দিনে দিনে বঞ্চিত হইতেছি। যে যত্নে যে পরিশ্রমে দাসত্ব শিক্ষা করি, তাহার শতাংশের একাংশ পরিশ্রম সহকারে কৃষি শিক্ষা করিলে এত দিনে ভারত আবার ধনে মানে পূর্ব্বের মত হইত। "নীলকর" 'চা-কর' প্রভৃতি বৈদেশিক কৃষকেরা আমাদিগের দেশ হইতে যে প্রচুর পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। অথচ আমরাই আবার তাহাদিগের অনুগ্রহপাত্র হইয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছি। আমাদিগের ক্ষেত্রে আমরা কৃষক—আমরাই সকল, তবু তাঁহারা আমাদের প্রভু, আমরা তাঁহাদের দাস—বেতনভোগী বাবু!! দাসত্ব রুচিকে এইক্ষণ আর অস্বাভাবিক বলিতে পারি না; বর্ত্তমানে ইহা এক প্রকার স্বাভাবিক রুচি হইয়া পড়িয়াছে। দাসত্ব বীজ আমাদিগের অস্থি, মজ্জা ভেদ করিয়াছে। পিতা মাতা সাধ করিয়া সন্তানের নাম রাখিবেন তাহাতেও 'রামদাস' শ্যামদাস কৃষ্ণদাস হরিদাস প্রভৃতি। আর কিছু দিন যবন অধিকার

থাকিলে আকবর দাস, প্রভৃতি নামও শুনিতে পাইতাম। এখনও হয়ত কিছু দিন পরে 'ডিউক দাস' আলবর্ট দাস প্রভৃতি নাম শুনিয়া শ্রবণ ইন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করিতে পারিব!! ভারতবাসীর স্মরণ রাখা উচিত যে কৃষি বলেই ভারত সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সকলের আদরণীয়। কৃষি কার্য্যের তাচ্ছীল্যে অকৃতজ্ঞতার ফল লাভ হইতেছে। দারিদ্র্য রব ভারতবর্ষময় হইয়াছে, অচিরেই আরো কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। বিশেষতঃ ধনলুব্ধ বণিকের রাজ্যে বাস করিয়া কৃষি ভিন্ন অন্য উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করা সুকঠিন হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অন্যবিধ ধন সকলি তাহারা গ্রাস করিয়াছে। আরো করিবে, কিন্তু ভারতের মাটী, ভারতের জল, বায়ু তাপ ভারত হইতে কখনও ইংলণ্ড লইতে পারিবে না; এই আমাদের আশা, এই আমাদের ভরসা, তবে আমরা এই কৃষির উন্নতির জন্য যত্নবান হইব না কেন?

ঔদ্ভিদিক প্রাকৃতিক ক্রিয়া।

প্রকৃতি যে এই জগৎ সৃষ্টির প্রসূতি, একথা বলিতে আর মনে কোনরূপ দ্বৈধ উপস্থিত হইতে পারে না। প্রকৃতি কেবল যে মাত্র প্রসব করিতেছেন তাহা নয়, প্রতিমুহূর্ত্তে কত যে গ্রাস করিতেছেন কত যে উদ্গীরণ করিতেছেন, কত যে রূপান্তর করিতেছেন, কত যে গুণান্তর করিতেছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিয়া উঠিতে পারে? এই প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের তত্ত্ব নির্ণয় করণাভিপ্রায়ে এ ক্ষুদ্র মস্তক বিলোড়িত করিয়া কি ফল হইবে? মহাত্মা ল্যামার্ক, এবং ডারউইন প্রভৃতি এই প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের তত্ত্ব এবং ফল নির্ণয় করিতে গিয়া যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, যে সকল সূত্র অবলম্বন করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাদের অসাধারণ চিন্তাশীলতা, এবং অনুসন্ধিৎসাকে ধন্যবাদ না দিয়া কেহই ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। "ক্রমাভিব্যক্তি এবং ক্রমোন্নতি" এই দুইটী তাঁহাদের চিন্তার প্রধান অবলম্বন সূত্র। তন্মধ্যে উদ্ভিদ জগৎই এস্থলে আমাদের আলোচ্য। আমরা উদ্ভিদ জগৎ সম্বন্ধে তাঁহাদের এই মতকে সংপূর্ণরূপ অনুমোদন করি এবং আমাদের সামান্য জ্ঞানের দ্বারাও ইহা সপ্রমাণ করিতে পারি।

যাঁহাদের এইরূপ সংস্কার আছে যে পৃথাবীস্থ যে সমুদয় পদার্থ আমরা দেখিতেছি, এই সমুদয় সৃষ্ট হইয়াছে এবং যাবদীয় উদ্ভিদের বীজ একটী একটী করিয়া বিশ্বস্রষ্টা একেবারেই সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা যে নিতান্ত ভ্রান্তিপূর্ণ রহিয়াছেন একথা বলিতে আমাদের মনে কোনরূপ ভীতির সঞ্চার হইতেছে না। এই ভ্রান্তিপূর্ণ মতকে পোষণ করিয়া মাত্র যে কেবল তাঁহারাই প্রতারিত হইতেছেন তাহা নয়,জগৎ সৃষ্টির উন্নতি সোপানের বিঘ্ন করিতেছেন। এই সংস্কার অনুসারে যদি মনে করা যায় যে বাস্তবিকই ইহা ঈশ্বর এইরূপ আকৃতি অবয়বিশিষ্ট করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন,তবে নিশ্চয়ই মনে ধারণা হইবে যে, ইহার আর কোন ক্রমেও ব্যতিক্রম ঘটিবেনা কি ঘটিতে পারে না। এইরূপ স্থির বিশ্বাসের স্থলে কে আর উন্নতির পথে অগ্রসর হয়? জগৎস্রষ্টা এটি এরূপ, ওটী ওরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন কি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে এক একটী বীজ সৃজন করিয়া দিয়াছেন? একথা কোন জ্ঞানবান মনুষ্যের হৃদয়ে অনেক ক্ষণ স্থান পাইতে পারেনা।

ক্রমাভিব্যক্তি এবং ক্রমোন্নতি না থাকিলে জগৎ সৃষ্টির সৌন্দর্য্য রক্ষা পায় না, নূতনত্বই সংসারের সৌন্দর্য্য। যদি ক্রমোন্নতি না থাকিত তবে এ সংসার কিছু হয় নাই বলিলেই হয়। কারণ কোন বস্তু সম্পূর্ণ হওয়া আর একেবারে না হওয়া উভয়ই সমান কথা।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টার ইহাই অত্যাশ্চর্য্য কৌশল যে, তিনি প্রকৃতির অভ্যন্তরে এমনই শক্তি নিহিত করিয়া দিয়াছেন যে, সেই শক্তিই (জগৎ সৃষ্টির) বীজস্বরূপে প্রকৃতির গর্ভে থাকিয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত অনন্ত পদার্থ অনবরত নূতন নূতন সৃষ্টি করিতেছে, এই নূতনত্বই জগতের সৌন্দর্য্য।

এই প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া ভৌতিক পদার্থের ক্রিয়া দ্বারা উদ্ভিদাদির উৎপত্তি হইতেছে, পরিবর্ত্তন হইতেছে, লয় হইতেছে। অভিব্যক্তি এবং ক্রমোন্নতি ও এই নিয়মের অন্তর্বর্ত্তী। এই মতের সহিত আমাদের উদ্দেশ্য বিষয়ের যতদূর সম্বন্ধ আছে তাহার কথঞ্চিৎ সংক্ষেপে আলোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক হইতেছে।

কোন বস্তু অবলম্বন করিতে হইলে, সেই বস্তু কোন্ ভিত্তির উপর

কিকি কারণ দ্বারা সংস্থাপিত আছে, তাহা না জানিয়া কোন জ্ঞানবান ব্যক্তি সেই বস্তুকে অবলম্বন করিতে পারে না। মনুষ্যের জ্ঞান আছে, ইচ্ছা আছে, শক্তি আছে, এই তিনের বর্ত্তমানতা সত্বে মাত্র শক্তিদ্বারা পরিচালিত হইয়া যন্ত্রবৎ সীমাবদ্ধ রেখার মধ্যে ঘুর্ণায়মান হইলে মনুষ্যের তৃপ্তি হইবে কেন? মনুষ্যের ইহা দ্বারা অনুসন্ধান হয়, জ্ঞান সেই অনুসন্ধানের ফল বিচার করে, শক্তি তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করে।

উদ্ভিদ জগতের প্রসূতি কে, রূপান্তর গুণান্তরের কারণ কি? মনুষ্য চেষ্টায় ইহার উন্নতি অবনতি হইতে পারে কি না? এই কএকটী প্রশ্নের সম্যক্ রূপ উত্তর করা আমাদের কেন, আমাদের বিশ্বাস যে পৃথিবীরও এখন পর্য্যন্ত এমন সময় উপস্থিত হয় নাই। আমরা হয়তো সাধারণ কথায় বলিতে পারি "প্রকৃতিই ইহার প্রসূতি, প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে রূপান্তর গুণান্তর ঘটে, মনুষ্য সেই প্রাকৃতিক শক্তির গুণাগুণ পর্য্যালোচনা দ্বারা তাহার অনুসরণ করিলে রূপান্তর গুণান্তর করিতে পারে।" ইহার দ্বারা সম্যক্ রূপ মীমাংসা হইল না, যে সকল পদার্থের সংযোগে প্রাকৃতিক শক্তি সমুৎপন্ন হয়, তাহার কোন্ অবস্থায় কোন্ জাতীয় উদ্ভিদের উৎপত্তি হইল। কোন্ পদার্থের কি পরিমাণ অসমতায় কিরূপ রূপান্তর গুণান্তর ঘটে, এ সিদ্ধান্ত করা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রতম জ্ঞান বিশিষ্ট লোকের পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে না। কিন্তু ঘটিতে পারে, ঘটিয়া থাকে, একথা আমরা বলিতে পারি এবং তাহার শত শত দৃষ্টান্ত প্রতিমুহূর্ত্তে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি।

একই জাতীয় উদ্ভিদ তাহার একটির ফল ফুল ছোট, একটির বড়, একটির আকৃতি একরূপ, অন্যটীর আকৃতি তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপ বিভিন্ন, একটির স্বাদ এবং ঘ্রাণ একরূপ, অন্যটি তাহা হইতে ভিন্নরূপ; এতো গেল রূপান্তর গুণান্তরের কথা। একেবারে নূতন উৎপত্তি হইতেও দেখা গিয়া থাকে। আবার একেবারে লয়ও ঘটিয়াছে এরূপও দেখা যায়। ক্রমে ইহার কতকগুলিন দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতেছে, তদ্দ্বারা অতি সহজেই সকলে ইহার বৈচিত্র উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

এমন কি এই প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস যে, দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কোন একজন উদ্ভিদ শাস্ত্রের সংপূর্ণ তত্ত্ববিদ পণ্ডিত যদি বর্ত্তমান সময়ের সমুদায় উদ্ভিদ জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসেন তাঁহার মনে গুরুতর ভ্রম উপস্থিত হইবে, যে, তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত উদ্ভিদ জগৎ এই কিনা? প্রথমতঃ তাঁহার মনে হইবে যে, এ সমুদয়ই প্রকৃতির নূতন প্রসব।

একথার দ্বারা কেহ মনে করিবেন না যে, দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সকল উদ্ভিদ ছিল তাহা একেবারেই লুপ্ত হইয়াছে। পুরাণে, ইতিহাসে, ভূগোলে, এবং আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অনেক উদ্ভিদের পরিচয় পাওয়া যায়। তৎসমুদয় যে অভিনব নয় একথা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু সেই পূর্ব্ব নামাঙ্কিত অনেক উদ্ভিদ এখন একেবারে দৃষ্ট হয় না। কতকগুলি এত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে, তাহার পরিচয় করিয়া উঠা যায় না। আকৃতি অবয়বের স্বাদের, ঘ্রাণের, গুণের, কিছু মাত্র সাদৃশ্য নাই। প্রাচীনকাল হইতে উদ্ভিদ জগতের রীতিমত ইতিহাস কোন দেশে থাকিলে, কোন্ সময়ে কি কারণে রূপান্তর ও গুণান্তর কি উৎপত্তি কি লয় ঘটিয়াছিল তাহা প্রমাণ করা যাইত। তাহা হইলে আজ এসকল কথা দার্শনিকদিগের অনুমান খণ্ডের তর্কবিতর্কের ন্যায় অথবা কবিকল্পনা বলিয়া বোধ হইত না। উদ্ভিদ জগতের ইতিহাসে, মানব জগতের যে, একটা গুরুতর অভাব রহিয়াছে, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হউক কি দূর সম্বন্ধেই হউক একমাত্র উদ্ভিদ যে, প্রাণিমাত্রের প্রাণ ধারণের উপায়, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। এমন পদার্থের সংপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞ হইতে জ্ঞানিজন মাত্রেরই আগ্রহাতিশয়তা না জন্মিয়া পারে না।

প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা উদ্ভিদের পরিবর্ত্তন, উৎপত্তি, লয়, হইতেছে। এই সূত্রটি স্মরণ রাখিয়া উদ্ভিদ জগৎ পর্য্যালোচনা করিলে সকলেই ইহার দৃষ্টান্ত পাইতে পারেন।

আমরা অনুসন্ধানের দ্বারা প্রমাণ পাইয়াছি যে, ধান হইতেই উড়ি জন্মে, (উড়িকে কোন দেশে ঝড়া বলে কোন দেশে উড়িধান বলে) ধান পাকিয়া অকর্ষিত ক্ষেত্রে ঝড়িয়া পড়ে) তাহা হইতে গাছ জন্মে পুনর্ব্বার

পড়িয়া জন্মে এইরূপ পুনঃপুনঃ ঝড়াতে ক্রমেই ধান অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইতে থাকে পরিশেষে তাহাই ভিন্ন এক জাতীয় উদ্ভিদ বলিয়া পরিগণিত হয়। উড়িরও চাউল প্রস্তুত করা যাইতে পারে। সে চাউল অত্যন্ত লঘুপক; অত্যুষ্ণ জলের মধ্যে দিলেই ভাত হয়। তাহা রুগ্ন ব্যক্তিদিগের আহারের জন্য অতি উত্তম ব্যবস্থা। ধান্য যে বহু প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও এইরূপ নানাবিধ কারণের দ্বারা বৈষম্য ঘটিয়াছে।

সুন্দরবন প্রদেশে নদী তীরে গোল গাছ জন্মিতে দেখিতে পাওয়া যায়, (কলিকাতায় গোল পাতার ঘর অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, প্রস্তাবিত গোল গাছের সেই পাতা) নারিকেল গাছ বাল্যাবস্থায় যেরূপ থাকে, গোল গাছ অবিকল সেইরূপ, বিভিন্নতার মধ্যে এই; গোলগাছ বয়সের বার্দ্ধক্যানুসারে নারিকেল গাছের ন্যায় বড় হয় না, নারিকেল গাছে যেরূপ ফুল হয় এবং কান্দি কান্দি ফল ধরে, গোল গাছেও সেই রূপ ফুল হয় এবং কান্দি কান্দি ফল ধরে। নারিকেলের উপরিভাগে ছোবড়া, পরে মালা, তন্মধ্যে শস্য এবং জল থাকে। গোলেরও ছোবড়া মালা শস্য এবং কিয়ৎ পরিমাণে জলীয় ভাগ থাকে। এস্থলে, বিভিন্নতা এই—নারিকেল অপেক্ষা গোলের ফল ছোট, অবয়বের সঙ্গেও সংপূর্ণ সাদৃশ্য নাই, স্বাদ এবং গুণেরও বৈষম্য আছে। আবার এই উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত সাদৃশ্যও কতক আছে। নারিকেলও লবণাক্ত দেশ ভিন্ন স্বভাবতঃ অন্য দেশে ভাল জন্মে না, গোলও লবণাক্ত দেশভিন্ন জন্মে না। উভয়েরই শাখা (ডগা) আদি ভস্ম করিলে লবণাংশ অধিক পাওয়া যায়, উড়ির ন্যায় গোলের পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় নাই, পরীক্ষা করাও নিতান্ত সহজ নহে। কত কালের ক্রমিক পরিবর্ত্তনে যে, ঐরূপ পার্থক্য ঘটিয়াছে, তাহাও নির্ণয় করা সুকঠিন, তত্রাপি নারিকেল আর গোল একজাতীয় এবং এক বংশোদ্ভব, এ সিদ্ধান্ত আমরা নিতান্ত অযৌক্তিক মনে করি না।

পার্ব্বত্য প্রদেশের কোন কোন অরণ্য মধ্যে সুপারি গাছের ন্যায় একরূপ গাছ দেখা গিয়াথাকে। সেগুলি পাঁচ হাত সাত হাতের অধিক লম্বা হইতে সচরাচর দেখা যায় না। অধিক মোটা হয় না, সুপারির ন্যায় ফুল

চয় এবং ছড়া ছড়া ফল ধরে। ফলগুলি সুপারি হইতে অত্যন্ত ক্ষুদ্র, পার্ব্বতীয়েরা ইহাকে রাম সুপারি বলে, এবং এই নামের সঙ্গে একটী প্রবাদের উল্লেখ করিয়া থাকে *। ইহাকে সুপারি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে আমাদের মনে কোনরূপ সংশয় উপস্থিত হয় না। মাত্র প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে এই বিকৃতি ঘটিয়াছে। ইহা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

এই সকল দূরগত দৃষ্টান্তের প্রতি অনেকের মনে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। অতএব ইহা পরিত্যাগ করিয়া কতকগুলি নিকট সম্বন্ধ বিশিষ্ট দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতেছে, যাহা, সচরাচর সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।

আম্র এক জাতীয় ফল; কোন দেশে জ্যৈষ্ঠমাসে পাকে, কোন দেশে শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন মাসে পাকে; কোন গাছ বৎসরে দুইবার ফলে, কোন গাছ বারমাস ফলে; কোনটি লতিকার ন্যায় গাছ ইত্যাদি। যাঁহারা এসকল ইতিহাস না জানেন তাঁহারা হয়তো শুনিয়া চমৎকৃত হইতে পারেন, অথবা সহসা বিশ্বাসও না করিতে পারেন। এসকল প্রত্যক্ষ রহিয়াছে বলিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে বলা যাইতেছে। মনে করুন পূর্ব্ববাঙ্গলায় যে সকল কদর্য্য আম্র ফলিয়া থাকে, (দূরের কথায় কাজ কি) বঙ্গবাসী এক জন লোককে তাহার এক খণ্ড আম্র খাইতে দিলে, তিনি কখনই তাহাকে আম্র বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত হইবেন না। আমরা বিখ্যাত আম্রেরও অন্যূন শতাধিক প্রকারের আকৃতি অবয়ব এবং গুণের পরিচয় জানি। এসকল প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। মনুষ্যের চেষ্টায়ও ইহার অনেক বৈষম্য ঘটিয়াছে, তাহা প্রমাণ করিতে আর অধিক অনুসন্ধান অথবা কষ্ট করিতে হয় না, নামেতেই ব্যক্ত করে। যথা ফজলি, সেন্দুরা, গোপালিয়া ধোবা, মিয়াসাহেব, নশিরুদ্দিন, হাইদর ইত্যাদি।

পার্ব্বত্য প্রদেশের অরণ্য মধ্যেও কোথাও আম্রগাছ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের † কৃষি ক্ষেত্রের মধ্যে (প্রথম অরণ্যাবস্থায়) অনেকগুলি

---

* রাম যখন বনে গিয়াছিলেন তখন তিনি ইহাকে শুপারির ন্যায় ব্যবহার করিতেন।

† সিলেট কলটিবেটিং কোম্পানি লিমিটেডের কার্য্যক্ষেত্র।

আম্রগাছ পাইয়াছিলাম, পূর্ব্বে সেই সকল গাছের আম্র মনুষ্যের অভক্ষ্য ছিল। অত্যন্ত টক এবং বসুয়া বসুয়া দুর্গন্ধ বিশিষ্ট ছিল। আকৃতিতেও ছোট ছিল, সেই সকল গাছের নিকটস্থ জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া শাখা প্রশাখা, বৃক্ষমূলের পুরাতন মৃত্তিকা, উত্তোলন করিয়া নূতন মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া দেওয়াতে, এইরূপে প্রতিবৎসরের ক্রমিক যত্নে সেই সকল বৃক্ষের আম্রই সুস্বাদু, এবং আকৃতিতে বড় হইতেছে। অধিকন্তু পোকাও ধরিতেছেনা। প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে যে পার্থক্য ঘটে, এবং মনুষ্যযত্নেও উন্নতি অবনতি হইতে পারে, একথা কোন মতেই অবিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

কলা এক জাতীয় ফল, এক জাতীয় গাছ ইহার ফলের বিভিন্ন প্রকারের, আকৃতি অবয়বের স্বাদের গুণের গুরুতর বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে যে এই সকল বৈষম্য ঘটিয়াছে, তাহা, বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। একটা প্রবাদ বাক্য শুনিয়াছি, সবরিকলা বিশ্বামিত্র মুনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই প্রবাদ বাক্যকে আমরা সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। সেই সৃষ্টিশব্দের আর কোন অর্থ নাই, বিশ্বামিত্রের যত্ন চেষ্টায় কলার এইরূপ উৎকর্ষতা সাধিত হইয়াছিল। বিশ্বামিত্র ঈশ্বরের সৃষ্টির বিকৃতি ঘটাইয়াছেন বলিয়া প্রাচীন ঋষিগণ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় সবরি কলা অব্যবহার্য্য করিয়াছিলেন। অদ্যাপিও হিন্দুসমাজে এই মত প্রচলিত রহিয়াছে। কবরিকলা (কোন দেশে রম্ভি বলে, কোন দেশে কাঁঠালি বলে) এই এক নাম বিশিষ্ট কলা তাহার কোন স্থানের কলাতে বীচি নাই, কোথাও অল্প আছে, কোথাওবা একেবারেই দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাও কি প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন নয়? আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, এই কবরিকলা হইতেই বীচাকলার উৎপত্তি হয়।

গোলাপ পুষ্পের অন্যূন ২৭০ প্রকারের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এই সকল প্রকারান্তর মানব চেষ্টায় ঘটিয়াছে, তাহাও প্রায় অধিকাংশ গোলাপের নামেতেই পরিচয় পাওয়া যায়। যথা এলেকজেণ্ডার, এলফ্রেড, ব্যারোন লেডি রথচাল্ড; এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া, ইত্যাদি। আমাদের চেষ্টায়ও আমরা গোলাপের রূপান্তর ঘটাইয়াছি।

শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়, কৃষিতত্ত্বের সম্পাদক নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন,যে,গোলাপ পুষ্প অন্য বর্ণের আছে কিনা ? কোন উপায়ের দ্বারায় হইতে পারে কিনা ? সম্পাদক মহাশয় ১২৮৭ সনের দ্বিতীয় সংখ্যা কৃষিতত্ত্বে উত্তর দিয়াছিলেন যে, অন্য বর্ণ নাই এবং হইতেও পারে না। আমি তাহার প্রতিবাদ করিয়া ১২৮৭ সনের চতুর্থ পঞ্চম সংখ্যা কৃষিতত্ত্বে আমার অবলম্বিত মত, প্রকাশ করিয়াছিলাম, এস্থলে সে বিবৃতি প্রকাশ করিয়া পাঠকদিগকে উপহার দিতে অক্ষম হইতেছি। কেহ ইচ্ছা করিলে চতুর্থ পঞ্চম সংখ্যা কৃষিতত্ত্ব পাঠ করিয়া দেখিবেন।

এইরূপ প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন মানব চেষ্টায়ও যে সংঘটিত হইয়া থাকে তাহার শত শত দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা যাইতে পারে। একটি সূত্র অনুযায়ী একটি দৃষ্টান্ত হইলেই প্রচুর প্রমাণ হয়। অম্ল হইয়াছে কি না তর্জ্জন্য পাত্রস্থ সমুদয় অম্ল পরীক্ষা করা আবশ্যক হয় না।

এখন এই প্রস্তাবনায় একটী গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে। ধানই উড়ি হইয়াছিল কি উড়িই ধান হইয়াছিল। গোলই নারিকেল হইয়াছে কি নারিকেলই গোল হইয়াছে ইত্যাদি।

প্রাচীন কাল হইতে উদ্ভিদ জগতের যখন কোন ইতিহাস আমরা দেখিতে পাইনা, ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রমাণের ন্যায় কি গণিতশাস্ত্রের অন্যান্য প্রকরণের ন্যায় ইহার প্রমাণ করিয়া দেওয়া অতি কঠিন ব্যাপার। "পৃথিবীর ক্রমিক উন্নতি যদি স্বীকার করা যায়, তবে এই সূত্র অনুসারে আমরা অবশ্য বলিতে বাধ্য হই যে, গোল হইতেই নারিকেল উৎপত্তি হইয়াছে, ল্যামার্ক এবং ডারউইন প্রভৃতি এই ক্রমোন্নতির সূত্র অবলম্বন করিয়া অনেক বিষয় অনেক প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু এই সূত্র অনুসারেও আমাদের প্রস্তাবিত প্রশ্নের সর্ব্বতোভাবে আমরা ওরূপ মীমাংসা করিতে পারিনা, প্রত্যেক বিষয়েরই উন্নতি অবনতি বিদ্যমান রহিয়াছে। তবে পৃথিবীরমোট সমষ্টির উন্নতি বই অবনতি নয় একথা অবশ্য স্বীকার্য্য, এখন এতদ্বারা আমরা এই মীমাংসা করিতে পারি যে, কোন দেশে বা কোন স্থানে উন্নতির দ্বারা ও বিকৃতি ঘটিয়াছে, কোন স্থানে বা অবনতির দ্বারাও বিকৃতি ঘটিয়াছে। কিন্তু মোট সমষ্টির ফল উন্নতি বই অবনতি নয়।

কি মানব জগৎ, কি পশ্বাদি জগৎ, কি উদ্ভিদ জগৎ সর্ব্বত্রই সঙ্কর জাতির উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মানবের আকৃতিগত প্রকৃতিগত বৈষম্যও অধিকাংশ এই সূত্রের অন্তর্বর্ত্তী। পশ্বাদির সঙ্কর জাতির পরিচয়ও বোধ হয় অনেকে অবগত আছেন। এখন কেবল উদ্ভিদ জাগতিক জাতি সঙ্করত্বের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। ইহার শত শত দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, বাহুল্য পরিত্যাগ করিয়া একটা প্রসিদ্ধ নাম দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। চা বৃক্ষ নানা জাতীয় আছে তন্মধ্যে এক প্রকারের নাম Assam Hybrid হাইব্রিড শব্দের অর্থই সঙ্কর জাতি।

এখন দেখা আবশ্যক যে, প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা উদ্ভিদের নবোৎপত্তি কি নবাবিষ্কৃতি হয় কিনা? জীব জগতেও আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গাদির নবোৎপত্তি দেখিতে পাই। মশক, মক্ষিকা, জলৌকা কেঁচুয়া ইত্যাদির মৃত্তিকাভ্যন্তরে পূতিগন্ধবিশিষ্ট পচলাতে উৎপত্তি হয়। এতদ্ভিন্ন বহু প্রকার কীটাদি এইরূপে জন্মিয়া থাকে। সুন্দরবন প্রদেশে দেখা যায় ক্ষেত্র চাষদিয়া রাখিয়া গেলে, বৃষ্টির জলে ক্ষেত্রের ঘাস জঙ্গল পচিয়া গেলে সেই ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিঙ্গড়ী মৎস্যের উৎপত্তি হয়, সেই ক্ষেত্রে অন্য কোন প্রকার জলের সংস্রব নাই। ইহা অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কখন কখন কদাচিৎ দুই একটা নারিকেলের জলের মধ্যেও ক্ষুদ্র চিঙ্গড়ীর আকৃতি এক রকম পোকা দেখা গিয়াছে, পূর্ব্ববাঙ্গলার আম্রের পোকা কাহারও অবিদিত নাই। আর একটী অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। কুমরিয়া নামে এক রকম পোকা ঘরের বেড়াতে মাটি দ্বারা বাসা প্রস্তুত করিয়া থাকে, সেই পোকা অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গাদি ধরিয়া মৃতবৎ অবস্থায় বাসার মধ্যে নিয়া যায়, কিছুদিন পর তাহাই আবার কুমরিয়া পোকার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট হইয়া বহির্গত হয়। অনুসন্ধান করিলে প্রকৃতির অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা পাওয়া যাইতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব যেমন সেই জাতীয় জীবের পরস্পর সংযোগ ব্যতীত অন্যান্য নানা পদার্থের সংযোগে উৎপত্তি হইয়া থাকে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও সেইরূপ উদ্ভিদের সংস্রব ব্যতীত প্রাকৃতিক শক্তিদ্বারা উৎপন্ন হয়।

বৃক্ষের শাখা ভেদ করিয়া এক রকম বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, (তাহাকে কোন স্থানে পরগাছা বলে) এ ভিন্ন আর এক রকম গুল্ম জন্মে তাহাকে চিলা বলে, দালানের সিঁড়ীতে কি রোয়াকের গায়ে যেখানে সর্ব্বদা জল পড়ে অথচ মনুষ্যাদির পদঘর্ষণ কি স্পর্শন না হয় সেই সকল স্থানে প্রথমতঃ সবুজবর্ণাকৃতি হয়, (যাহাকে শিবলা বলে) ক্রমে তাহা হইতে ক্ষুদ্রতর পত্রোদ্গম হয়। সেই অবস্থায় হস্তস্পর্শ করিলে স্পঞ্জের ন্যায় বোধ হয়, ক্রমে সেই পত্রগুলি বড় হইতে থাকে। তখন এক প্রকার শাক সবজির ন্যায় বোধ হয়। পাতকুয়ার গায়েও কখন কখন এইরূপ উৎপত্তি হয়। আমরা সাধারণতঃ ইহার কোন প্রচলিত নাম শুনি নাই। উদ্ভিদ বিচারের গ্রন্থকার ইহাকে দুর্গাঝাপ, কালীঝাপ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ইহা কোনরূপ ব্যবহারের উপযোগী কিনা? তাহার আমরা বিশেষ পরিচয় জানি না।

কোন কোন স্থানে মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে একরকম পদার্থের উৎপত্তি হয়। কোন প্রকার বীজ ভিন্ন ভুমি ভেদ করিয়া উত্থিত হয় বলিয়া কোন দেশে ভুঁইফোর বলে, তাহার উপরিভাগ পদ্মকোরকের ন্যায় বলিয়া কোন দেশে কোরক বলে, শেষ অবস্থায় উপরিভাগ ছত্রাকার ধারণ করে বলিয়া কোন স্থানে "ব্যাঙ্গের ছাতি" বলে, বস্তুতঃ ইহা একই পদার্থ। ইহাদিগের শাখা পল্লব ফল পুষ্প কিছুই হয়না অথবা মূল শিকড়ও থাকেনা। অনেকস্থানে ইহা শাক সবজির ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সচরাচর কুল গাছে এক রকম লতা দেখিতে পাওয়া যায়। কোন দেশে তাহাকে "স্বর্ণলতা" বলে, কোন দেশে "শূন্য লতা" বলে এই নাম অর্থবিহীন নয়। শূন্যে জন্মে বলিয়া শূন্য লতা নাম, স্বর্ণের ন্যায় বর্ণ বলিয়া স্বর্ণলতা নাম। ইহার ফল পুষ্প পল্লব বিহীন মাত্র এক একটি শাখার অগ্র ভাগ বর্দ্ধিত হয়, ইহা অত্যন্ত বৃদ্ধিশীল। যে বৃক্ষের উপর উৎপন্ন হয় তাহার শাখা পল্লব আদি কিছুই লক্ষিত হয় না অথচ মৃত্তিকার সহিত সংস্পর্শও নাই।

এ সকল যে অবৈজিক পদার্থ তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তবে ইহারা যে, প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা উপজাত একথা

অস্বীকার করিলে কোন্ যুক্তি অবলম্বন করিয়া যে, পক্ষ সমর্থন করা যাইতে পারে আমরা তাহা আলোচনায় পাইতেছি না। এতো গেল প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা যাহা বিনা চেষ্টায় উৎপাদিত হইতেছে তৎ সমুদায়ের আলোচনা। এখন আর একটী দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি যে, কোন প্রকার বীজ ভিন্ন কোন প্রকার উদ্ভিদের সংশ্রব ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর দ্বারা মানবচেষ্টায়ও উদ্ভিদের উৎপত্তি হইতে পারে।

পুদিনা" এক জাতীয় উদ্ভিদ। বোধ হয় অনেকেই ইহার পরিচয় এবং ব্যবহার অবগত আছেন। পুদিনার একটী গাছ লাগাইলে তাহা হইতে একখানি ক্ষেত্র পূর্ণ হইতে পারে। কিন্তু এই গাছ ভিন্নও পুদিনা জন্মে। একটী রজ্জুতে গুড় মাখিয়া রাখিলে তাহাতে মক্ষিকা সকল বসিয়া ডিম্ব প্রসব করে; পরে সেই রজ্জু মৃত্তিকায় স্থাপন করিলে তাহাতেই পুদিনা গুল্মের উৎপত্তি হয়। আমি এস্থলে ইহার বিশেষ বিবৃতি প্রকাশ করিতে অক্ষম হইতেছি।

আমরা এসকল বিষয় সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা সংপূর্ণ রূপ প্রমাণ করিতে অক্ষম একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে ও যাহউক পুদিনার সম্বন্ধে আমাদের ক্ষুদ্র মস্তকে কিছুই ধারণা করিতে পারি না। কেবল আমরা কেন, এপর্য্যন্ত যত বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাঁহারাও সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য রূপে সঙ্গত যুক্তি প্রয়োগ দ্বারা ইহার প্রমাণ করিতে সক্ষম হইবেন কিনা সন্দেহ। একটা সাধারণ কথা আমরাও বলিতে পারি যে, মক্ষিকার ডিম্বেই এইরূপ শক্তি রহিয়াছে,তাহাহইতেই এই জাতীয় উদ্ভিদ উৎপাদিত হইতে পারে। এতো কোন যুক্তি হইল না। যুক্তি বলি তাহাকে যে, যে যে উপকরণের দ্বারা পুদিনার উৎপত্তি হয় রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা তাহাতে কি কি বস্তু পাওয়া যায়, সেই সকল বস্তু সেই পরিমাণে, অন্য পদার্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারায় পুদিনা উৎপাদন করা যায় কিনা? এইরূপ যুক্তিকে, সকলেই শিরোধার্য্য করিয়া মানিয়া লইতে পারে।

এই প্রমাণ করা যে মানব চেষ্টার আয়ত্তের বিষয় নয় তাহা আমরা বলিতেছি না। চেষ্টা করিলে কেবল ইহা কেন, আমাদের বিশ্বাস আছে

যে ভিন্ন ভিন্ন উপাদান দ্বারা পুদিনার ন্যায় অন্যান্য উদ্ভিদও মানব-চেষ্টায় উৎপাদিত হইতে পারে। যে সংসারে কোন কোন বৈজ্ঞানিক এ কথাও প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন যে, স্ত্রীপুরুষ সংযোগ ব্যতীতও মনুষ্যের উৎপত্তি হইতে পারে, সেই সংসারে বাস করিয়া (এই সকল শত শত দৃষ্টান্ত বিদ্যমান সত্ত্বে) উদ্ভিদের সংস্রব ব্যতীত উদ্ভিদ জন্মিতে পারে একথা বলিলে কেহ দুঃসাহসিকতার পরিচয় বলিয়া মনে করিতে পারেন না। বাস্তবিক আমাদের স্থির বিশ্বাস যে, মনুষ্য চেষ্টা করিলে এমন শত শত প্রকার উদ্ভিদ উৎপাদন করিতে সক্ষম হইতে পারে। রূপান্তর গুণান্তর করা অতীব সহজ সাধ্য।

এখন এই প্রস্তাবের উপসংহার স্থলে একটা কথা বলিতে হইতেছে; এই সকল যুক্তিমূলক। কেহ যেন আমাদিগকে ইহা হইতে নাস্তিক মনে না করেন। আমরা নাস্তিক নহি, ঐশ্বরিক শক্তির খর্ব্বতা প্রমাণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, বরং আমাদের এই প্রস্তাবনাদ্বারা ঐশী শক্তির আধিক্যেরই প্রমাণ হইতেছে। একটী বীজ হইতে তজ্জাতীয় একটী বৃক্ষ উৎপাদন করা স্রষ্টার পক্ষে যত সহজ, কোন একটা শক্তি হইতে নানাবিধ পদার্থের নিত্য নূতন উৎপাদন তত সহজ নয়। স্রষ্টা যদি একটী একটী বীজ স্বজন করিয়া দিতেন, তাহা হইতে অনবরত তদনুরূপ বস্তুই উৎপাদিত হইত। তাহা হইলে ত ঐশ্বরিক শক্তি সসীম হইয়াই পড়ে তবে তাঁহার অনন্তশক্তিমান্ নামের মাহাত্ম্য কোথায় থাকে? বস্তুতঃ তিনি অনন্ত শক্তিমান্, তাঁহার শক্তির অন্ত নাই, সীমা নাই, জগতের আদি সৃষ্টির সময় হইতে কত যে সৃষ্ট হইয়াছে. কত যে লয় পাইয়াছে হইতেছে, ও হইবে, প্রকৃতির অভ্যন্তরে তিনি কত যে অনন্ত শক্তি নিহিত করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করা মানব সাধ্যের অতীত।

কৃষকজীবন।

আমরা মনুষ্যাদির যেমন আকৃতিগত বৈলক্ষণ্য সর্ব্বদাই পরিলক্ষিত করিয়া থাকি, সে ইরূপ প্রকৃতিগত ও ব্যবহারগত বৈলক্ষণ্যও পরিদৃশ্যমান

হইয়া থাকে। আকৃতি বাহ্য অবয়ব ; ইহা মনুষ্য জগতের কোন মূল্যবান বস্তু বলিয়া আমরা মনে করি না। (তবে যদি কেহ মাকাল ফলকেও অধিক মূল্য দিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, করুন ; তাহা এস্থলে আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়) আমরা মনুষ্যের ব্যবহারগত এবং প্রকৃতিগত বিষয়কেই অধিক মূল্যবান মনে করিয়া থাকি। শারীরিক শক্তির ক্রিয়াই ব্যবহার, এবং মানসিক শক্তির কার্য্যই প্রকৃতি, এতদুভয়ের যে বৈষম্য তাহাই আমাদের প্রসঙ্গের আনুষঙ্গিক আলোচ্য বিষয়।

ব্যবহারগত বৈষম্য—কেহ অলস, কেহ পরিশ্রমী, কেহ কষ্টসহিষ্ণু অর্থাৎ শীত বাতাতপ বর্ষা অধিক পরিমাণে সহ্য করিতে পারে। কেহ তাহাতে সম্পূর্ণ অক্ষম ইত্যাদি। প্রকৃতিগত—কেহ বা উদার, কেহ বা বিলাসী, কেহ বা চিন্তাশীল, কেহ বা তাহাতে অপারগ, কেহ বা অনুসন্ধিৎসু, কেহ বা তাহাতে অক্ষম ইত্যাদি।

ব্যবহারগত—কষ্ট সহিষ্ণুতা, শ্রমশীলতা, এবং প্রকৃতিগত অবিলাসিতা, চিন্তাশীলতা অনুসন্ধিৎসুকতা এই উভয়বিধ শক্তির যুগপৎ সামঞ্জস্য কৃষকজীবনে থাকা আমরা নিতান্ত আবশ্যক মনে করি। কেবল আবশ্যক কেন, কৃষক জীবনের ইহা প্রধান লক্ষণ। যে জীবনে এই সকল গুণের অথবা শক্তির অভাব, তিনি কখনই একজন প্রকৃত কৃষক হইতে পারিবেন না। তাঁহার পক্ষে ইহা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া সুসঙ্গত মনে করি না। প্রবৃত্ত হইলেও তিনি অধিকাংশ স্থলে পণ্ডশ্রম এবং অকৃতকার্য্য হইবেন।

এ ভিন্ন কৃষক জীবনে আরও একটী গুণ আবশ্যক ; মনুষ্য মাত্রেরই একটা স্বাভাবিক ভালবাসার গতি থাকে, কেহ বা নগর উপনগরের অপ্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্য্য ভালবাসে, এবং তাহাতেই তাহার মনের সন্তুষ্টি জন্মে। কেহ বা প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্য্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হয়, এবং উদ্ভিদ জগতকে ভালবাসে। যিনি প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্য্যে সন্তুষ্ট হইতে না পারেন যাঁহার স্বভাব উদ্ভিদ জগৎকে ভালবাসিতে পারে না, তিনি কখনও কৃষিকার্য্যের উন্নতি করিতে পারিবেন না। তাঁহার পক্ষে এরূপ কার্য্যে ব্রতী হওয়া আমরা অপরামর্শ মনে করি।

এটী আমাদের দেশের সাধারণতঃ শিক্ষা-প্রণালীর অভাব এবং অসম্পূর্ণতা রহিয়া যাইতেছে, যে, ছাত্রের চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য মনের স্বাভাবিক গতি, তাহাকে হয় ত, আইন শিক্ষা দিয়া উকীল বানাইতেছেন; যাহার বাণিজ্য শিক্ষা ইচ্ছা, তাহাকে হয়ত চিকিৎসক বানান হইতেছে। যাহার শিল্পকার্য্য শিক্ষা করিবার ইচ্ছা, তাহাকে হয় ত কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত করা হইতেছে। ইত্যাদি প্রকার মনুষ্যের স্বাভাবিক গতির বিরুদ্ধে শিক্ষা দেওয়ায় কেহই সম্পূর্ণ রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না, স্বাভাবিক গতির অবরোধ বা বাধা দ্বারা যে সেই বস্তুর শক্তি হ্রাস হইয়া যায় ইহা স্বতঃসিদ্ধ। আমাদের দেশের এই অস্বাভাবিক শিক্ষা দ্বারাই শিক্ষার ফল সম্পূর্ণরূপ আশানুরূপ হইতেছে না। সামাজিক স্রোত এবং অভিভাবকের ত্রুটিই এই কুফলের প্রসূতি। যদি বাল্যকাল হইতে সন্তানদিগের স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষায় নিযুক্ত করেন, তবে এরূপ ঘটনা ঘটেনা। আমরা অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা বলিয়া সংক্ষেপেই এসম্বন্ধে ক্ষান্ত দিলাম।

আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে চিন্তাশীলতা ও অনুসন্ধিৎসাও প্রধান আবশ্যক। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, এ দুটী গুণ কৃষক জীবনের অধিক আবশ্যক নয়; মাত্র শ্রমশীলতা, কষ্ট, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি কতিপয় গুণ থাকিলেই হইতে পারে। এরূপ ভ্রান্তিমূলক মতকে পরিপোষণ করা আমরা নিতান্ত অসঙ্গত মনে করি। উক্ত বিধ গুণ দ্বয়ের অভাবে অন্য সমুদয় গুণ থাকিলেও কৃষক কেবল কৃষিক্ষেত্রের ব্যবহারোপযোগী পশুবৎ পরিশ্রম করিয়া তাহারই উপযোগী কিঞ্চিন্মাত্র ফল লাভ করিতে পারেন। তদ্ভিন্ন উদ্ভিদের গুণাগুণ সাময়িক অবস্থা বুঝিয়া কোন কার্য্য করিতে পারেন না, এবং উদ্ভিদ জাগতিক উন্নতির আশাও তাঁহার দ্বারা করা যাইতে পারে না।

একজন কৃষিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া রীতিমত শিক্ষা লাভ করিলেন, যে কএকটী নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি শিক্ষা করিয়াছেন প্রকৃত ঘটনায় তাহা কোন একটী ব্যতিক্রম ঘটিলে তাহার কোন অনুসন্ধান অথবা উপায় নির্দ্ধারণ আর তাঁহার দ্বারা হইতে পারিল না। প্রকৃতি যে, সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল,

এবং তাহার পরিবর্ত্তনে যে সর্ব্বদাই কত বিপর্য্যয় ফল ঘটিতেছে তৎসম্বন্ধে এই গ্রন্থের স্থানে স্থানেই আমরা আলোচনা দ্বারা দেখাইব।

এই পরিবর্ত্তনশীল সংসারে নিজের চিন্তা ও অনুসন্ধান ব্যতীত কেবল কএকটী নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া চলিলে কখনই উন্নতির আশা থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ অন্যান্য শাস্ত্রের তুলনায় কৃষি শাস্ত্রের আলোচনা যে, অতি অল্পই হইতেছে, একথা আমরা অসংকুচিত চিত্তে বলিতে পারি। যদিও অন্যান্য বিজ্ঞানও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে,তথাচ তাহার তুলনায়ও উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, কৃষি-বিজ্ঞান সহস্র গুণ অসম্পন্ন রহিয়াছে। বিজ্ঞান জল-বায়ু সহযোগে মনুষ্যের উদরস্থ হয় না অথবা ব্যক্তি বিশেষ বা জাতিবিশেষই যে বিজ্ঞানের প্রসব-শক্তি সম্পন্ন তাহাও নয়,'বিজ্ঞান কেবল মানবচিন্তার ফল। প্রকৃত কোন বস্তুর সংযোগে কি অসংযোগে কি ঘটিল কি কি ঘটিতে পারে যাহারা সর্ব্বদা এই চিন্তা করেন তাঁহারাই বিজ্ঞানের স্রষ্টা। কিন্তু সকলেই যদি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ চিন্তা ও অনুসন্ধান করিতেন, তাহা হইলে এতদিন আমরা (সম্পূর্ণ না হউক) বিজ্ঞানের আরও অনেক উন্নতি দেখিতে পাইতাম। প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের চক্ষের উপর শত শত ঘটনা ঘটিতেছে, চিন্তা অনুসন্ধান সহকারে যত্ন করিলে হয়ত আমরাও একটা বৈজ্ঞানিক যুক্তির আবিষ্কার করিতে পারি। এক স্থানে একই জাতীয় দুইটী ফলের বৃক্ষ, তাহার একটীর ফল ছোট হই-তেছে। ইহার কোন কারণ অনুসন্ধান না করিয়া যদি মনে করি যে ইহা ঈশ্বরের এইরূপ সৃষ্টি, তবে আর বিজ্ঞান কোথায় থাকে? হয়ত আমার এক জীবনে কারণ স্থির করিতে না পারি,কি পাঁচ জনের চিন্তায়ও স্থির না হইতে পারে, সকলে চিন্তা করিলে অবশ্য হইতে পারে। (সকল শব্দের আর কোন অর্থ নাই তুমি, আমি, তিনি এই একটি একটি করিয়া সকল) বরং যদি আমরাও সকলে কৃতকার্য্য না হই "এটী একটী চিন্তার বিষয়" এই কথাটা মাত্র বলিয়া রাখিলেও উপকার হয়। তাহাতেও বরং পরবর্ত্তী লোকেরা এ সূত্রটা অবলম্বন করিয়া হয়ত একটী কারণ নির্দ্ধারণ করিতে পারে। চিন্তা এবং অনুসন্ধিৎসা যে, কৃষকজীবনের একটী প্রধান উপকরণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই?

কেবল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কেহ কৃষক হইতে পারে না অথবা কৃষিশাস্ত্রে সম্পূর্ণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারে না। যেমন চিকিৎসক হইতে ইচ্ছা করিলে শরীরতত্ত্ব অধ্যয়ন করিতে হয় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে শরীর অভ্যন্তরে কোথায় সেই অধ্যাপনানুযায়ী ক্রিয়া হইতেছিল (কি হইতে পারে) তাহা প্রত্যক্ষ করা আবশ্যক, সেইরূপ কৃষি শিক্ষা করিতে হইলেও যেমন অধ্যয়ন করিতে হইবে তেমন তদনুযায়ী কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। এইরূপে শিক্ষা হইলেও কিছুকাল কার্য্যক্ষেত্রের বহুদর্শিতা লাভ করা আবশ্যক। তাহা হইলে তিনি একজন প্রকৃত কৃষক শ্রেণীতে পরিগণিত হইতে পারেন।

কৃষক কখনও অন্যের উপর নির্ভর করিয়া কৃষিক্ষেত্রের পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যে ত্রুটি করিবেন না। যে পর্য্যন্ত ক্ষেত্রস্থ শস্য গৃহে না আসিবে সে পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শস্যের অনেক রিপু এই জন্যই প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিয়া গিয়াছেন—জীর্ণ মন্নং প্রশংসীয়াৎ,ভার্য্যাঞ্চ গতযৌবনাং রণপ্রত্যাগতং শূরং শস্যাঞ্চ গৃহমাগতং।

আর্য্যঋষি মহাত্মা পরাশর তাঁহার কৃষি সংহিতায় বলিয়াছেন (আমরা তাহার অবিকল অনুবাদ উত্তোলন করিলাম) অন্তঃপুর রক্ষণের ভার পিতার প্রতি অর্পণ করিবে, রন্ধনশালার তত্ত্বাবধারণের ভার মাতার প্রতি অর্পণ করিবে, আত্মবৎ ব্যক্তিকে পশুপালনের ভার অর্পণ করিবে, এবং কৃষিকার্য্যের পর্য্যাবেক্ষণের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিবে।

সাধারণ কৃষকদিগের ভাষায় বলিয়া থাকে "আপনে চাষা উত্তম ক্ষেতি, তার অর্দ্ধেক কান্ধে ছাতি, যে বাড়ীতে বসিয়া জিজ্ঞাসে হাল, তার অভাব চিরকাল"।

এই সকল প্রাচীন এবং প্রচলিত মতের দ্বারা উপলব্ধি হইবে যে, কৃষিকার্য্যের এমনই গুরুত্ব যে ইহার ভার অন্যের প্রতি ন্যস্ত রাখিয়া কোন মতেই নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়।

কৃষক, প্রতি দিন তাহার কৃষিক্ষেত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রকৃতির নূতন নূতন কার্য্যকলাপ সন্দর্শনে যে সুখ অনুভব করে, বিলাসী তাহার বিলাস শয্যায় বসিয়া তাহার শতাংশের একাংশও অনুভব করিতে পারেন

না। তিনি সংসারের আবিলতাকে দূর করিবার জন্য অস্বাভাবিক সুখকে আকর্ষণ করিতে ব্যগ্র হইয়া নানা বিধ শয্যা করিতে থাকেন, তবুও সুখ তাঁহার নিকটস্থ হইতে চায় না। কৃষকের হৃদয়ে অযাচিত ভাবে (সাংসারিক আবিলতাকে বিদূরিত করিয়া) অতি নির্ম্মল সুখ বিরাজিত হয়। ক্ষেত্রস্থ কৃষির পত্র উদ্‌গম, পুষ্প সমাগম, প্রস্ফুটন, এবং ফল প্রসব ইত্যাদি প্রতি দিনই এই পরিবর্ত্তনও এই নূতনত্ব দেখিয়া তাহার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইতে থাকে। মাতা যেমন তাঁহার ক্রোড়স্থ নবজাত শিশুর দৈনিক পরিবর্ত্তনাবলোকনে সুখানুভব করেন, কৃষকও তাহার কৃষি ক্ষেত্রস্থ পরিবর্ত্তন দেখিয়া তদ্রূপ সুখ লাভ করে। কৃষি শাস্ত্রের রসগ্রাহী ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের নিকট ইহা অত্যুক্তি বলিয়া বোধ হইবে।

কৃষকের সর্ব্বাগ্রে ক্ষেত্র এবং বীজ নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। কৃষির উৎকর্ষ সম্বন্ধে যদিও বীজ একটী প্রধান উপকরণ বটে, কিন্তু বীজ অপেক্ষাও ক্ষেত্রের গুণাগুণ কৃষির উৎকর্ষ সম্বন্ধে অধিক আবশ্যক। অনেক সময় ইহা প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে যে, ক্ষেত্রের গুণাগুণের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া অতি উত্তম বীজ রোপণ করিলেও উত্তম কৃষির উত্তম ফল উৎপন্ন হয় না। এমন কি অনেক সময় এক বারেই অঙ্কুর উদ্‌গম হয় না। মনে করুন, একটী অতি উত্তম চারা বীজ সুন্দরবনের মেদবৎ সিক্ত মৃত্তিকায় রোপণ করিলে, তাহা হইতে উত্তম বৃক্ষ জন্মিবে, এ আশা কখনই করা যাইতে পারে না। বরং একবারে না হওয়াই অধিক সম্ভব। সুতরাং বীজ অপেক্ষা ক্ষেত্রের গুণ অধিক আবশ্যক।

বীজ নিকৃষ্ট হইলেও ক্ষেত্রের গুণে এবং কৃষকের যত্নে তাহা হইতে উত্তম ফল ফলিতে পারে। অবশ্য এ কথা বলিতেছি না যে একটী ক্ষুদ্র জাতীয় ফলের বীজ হইতে ক্ষেত্রের গুণে এবং কৃষকের যত্নে ক্রমে দুই তিন বার পরিবর্ত্তনের পর ফলের আকার অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হয়। এ জন্য উদ্ভিদাদির উৎকর্ষতা সম্বন্ধে বীজকে গৌণ কারণ এবং ক্ষেত্রকে মুখ্য কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে অযৌক্তিক বা অসঙ্গত হয় না।

উদ্ভিদ-জগতের সঙ্গে জীব-জগতের কোন্ বিষয়ে কত দূর সাদৃশ্য আছে প্রত্যেক বিষয়ের সঙ্গে তাহাও কতক পরিমাণে আলোচনা করিয়া

দেখিলে সকলেই অনুমান করিতে পারিবেন। মনে করুন, যে কেবল উত্তম পিতার ঔরসে জন্মিলেই সন্তান উত্তম হইবে তাহা নয়, পিতা মাতা উভয়ই উত্তম হইলে তদভিজাত সন্তান যে অধিক উত্তম হইবে, তাহাতে বোধ হয় আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। মাতা উত্তম হইয়া পিতা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট হইলেও সন্তানের উত্তমতা সম্পাদিত হইতে পারে। পিতা অপেক্ষা মাতার সহিত সন্তানের নিকট সম্বন্ধ। পিতার পিতৃত্বে (বীর্য্যে) শরীর এবং মনের কার্য্য এক দিন মাত্র করে। তাৎকালিক সম্বন্ধে পিতা মাতা উভয়ই সমান। তৎপর আর পিতার শারীরিক কি মানসিক শক্তিতে শরীর এবং মনের প্রতি বিশেষ কোন কার্য্য করে না। কিন্তু শরীর পরিপোষিত, পরিপালিত, পরিবর্দ্ধিত কেবল মাতৃ শরীরের রস পান করিয়া হইয়া থাকে। মাতৃ যত্নে লালিত পালিত হইয়া শরীর এবং মন গঠিত এবং বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এই জন্যই আধুনিক পণ্ডিতগণ উত্তম মাতার আবশ্যকতা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই জন্য স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা সকলের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।

মাতাই যে ক্ষেত্র, পিতাই যে বীজ স্বরূপ, এ কথা কাহাকেও বুঝাইবার জন্য প্রয়াস পাওয়া নিষ্প্রয়োজন। পিতা কর্ত্তৃক কতক গুলি দোষ গুণ আসিয়া আমাদের শরীর এবং মনের উপর অধিক কার্য্যকারী হইয়া পড়ে, তাহার কারণ পিতা কর্ত্তৃক দুইটি কার্য্য হয়। প্রথমতঃ পিতা বীজ স্বরূপ, পরে আবার পিতা কৃষক স্বরূপ যত্ন চেষ্টা করেন।

আমাদের দেশের মাতৃগণ সেই সকল যত্ন চেষ্টায় অক্ষম বলিয়া এস্থলে আমাদের মাতা কেবল ক্ষেত্র উপযোগী কার্য্য করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন। পিতা বীজ স্বরূপ এবং পরে কৃষক স্বরূপ হইয়া কার্য্য করেন। এই দুইটী কার্য্য করাতে পিতৃ স্বভাবের একটুকু অধিক সাদৃশ্য ঘটে, কিন্তু এস্থলে এ কথাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে আমাদের শৈশব জীবন যদি মাতা অকর্ম্মণ্য করিয়া দেন, তবে তাহা আর কোন মতে সংশোধিত হয় না। যে শিশুকালে রুগ্ন হয় আহার্য্য বস্তু অবিচারে পান ভোজন করে, সে পরে কখনই বলবান এবং দীর্ঘজীবী হয় না।

এই রূপ উদ্ভিদাদিরও ক্ষেত্রের দোষে যাহা শৈশব কালে দুর্ব্বল হইয়া

পড়ে, শেষে কৃষকের শত যত্নে শত পরিশ্রমেও আর তাহা সংশোধিত হইয়া বলবান এবং দীর্ঘজিবী হয় না। এখন দেখিতে হয় যে, সেই ক্ষেত্র কিরূপ হওয়া আবশ্যক। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ পৃথিবীর যে সকল স্তর নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা হইতে মৃত্তিকার স্বাভাবিক আকৃতি অবয়ব এবং বর্ণ নির্ণয় করিয়া লওয়া অত্যন্ত কঠিন। ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা পৃথিবীর স্তর নির্ণয় করিতে গিয়া নিম্নস্তরে জল জন্তুর অস্থিত্বাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তদ্দ্বারা এবং অন্যান্য কারণে সর্ব্বাগ্রে জল জন্তুর সৃষ্টি হওয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তের দ্বারায় এ কথা অনুমান করা অসঙ্গত হইতে পারে না যে, তৎকালীন মৃত্তিকায় উদ্ভিদাদির উৎপাদিকা শক্তি ছিল না। পরে ক্রমে অন্যান্য পদার্থের সংযোগে প্রজনন শক্তির উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু এ মীমাংসা করিলেও তাৎকালিক মৃত্তিকার আকার অবয়ব নিশ্চিত রূপে নির্দ্দেশ করা হইতেছে না। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের অনুসন্ধান এবং অনুমানে এই বোধ যে বালিই মৃত্তিকার স্বাভাবিক অবয়ব। যে কএকটী কারণের দ্বারা এই সিদ্ধান্ত করিতেছি, তাহা এই,— প্রথমতঃ যত দূর দেখিয়াছি মৃত্তিকা খনন করিলে নিম্নস্তরে বালুকা বই আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ একখণ্ড মৃত্তিকা এক গ্লাস জলের মধ্যে ধৌত করিতে থাকিলে সেই মৃত্তিকার সহিত অন্যান্য বস্তু যে পরিমাণ সংযোগে একটী ভিন্ন অবয়ব বিশিষ্ট হইয়াছিল, ক্রমে ধৌত করিতে করিতে সেই অন্য বস্তুগুলি বিদূরীভূত হইয়া অবশেষে কেবল বালুকা মাত্রই অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং তাহাই মৃত্তিকার স্বাভাবিক অবয়ব বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। তৃতীয়তঃ মৃত্তিকা একটী অদাহ্য পদার্থ। সাধারণতঃ এক খণ্ড মৃত্তিকা শুষ্ক করিলে যত ওজন হইবে সেই মৃৎখণ্ড দগ্ধ করিয়া পুনরায় ওজন করিলে তত হইবে না। কারণ তন্মধ্যে অন্যান্য দাহ্য পদার্থ যাহা সংযোগ হইয়াছিল, তাহা দগ্ধ হইয়া ওজন কমিয়া যাইবে। কিন্তু কতক পরিমাণে শুষ্ক বালুকা দগ্ধ করিলে তাহার কিছুই কমিবেনা। চতুর্থতঃ জল বেগে নদী তীর ভগ্ন হইয়া পুনরায় চর পড়ে সেই সকল তীরস্থ মৃত্তিকায় অন্যান্য যে সমস্ত পদার্থ থাকে, তাহা জলে মিশ্রিত হইয়া যায়, বালুকাই প্রথমতঃ চররূপে

সংস্থাপিত হয়। এই সকল কারণ দ্বারা আমরা অনুমান করি যে, বালুকাই মৃত্তিকার স্বাভাবিক অবয়ব। কারণ তাহা কোন অবস্থাতেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না। শুধু বালিতে কোন প্রকার উদ্ভিদ জন্মিতে পারে না, বালির সঙ্গে ধাতুসার, প্রাণিসার, উদ্ভিদসার, প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা পরিচালিত এবং মিলিত হইয়া ভূমিকে প্রজনন শক্তিবিশিষ্ট এবং উর্ব্বরা করে। উদ্ভিদের উৎপাদন পক্ষে বালিও যেমন বিরোধী, শুধু আঠালিয়া মৃত্তিকাও সেইরূপ বিরোধী। এস্থলে এ কথা অবশ্য জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, বালিই যখন মৃত্তিকার স্বাভাবিকাবস্থা স্থির হইতেছে এবং অন্যান্য সার পদার্থ মিলিত হইয়াই যখন ভূমিকে অন্য অবয়ব বিশিষ্ট এবং উর্ব্বরতাশালিনী করে। (আঠালিয়া মৃত্তিকা ও অন্যান্য পদার্থ মিলিত না হইলে ভিন্নরূপ অবয়ব বিশিষ্ট হইতে পারে না,) তবে তাহার উর্ব্বরতা শক্তি থাকে না কেন? পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে একখণ্ড শুষ্ক মৃত্তিকা ওজন করিলে যত হয়, দগ্ধ করিলে উহার ভার তত থাকে না। কারণ তাহার সারাংশ দগ্ধ হইয়া যাওয়ায় সেই অংশ কমিয়া যায়। আবার সেই মৃত্তিকা খণ্ড একটী গ্লাসে রাখিয়া পুনঃ পুনঃ ধৌত করিতে করিতে মাত্র অবশেষে অদাহ্য ভাগটা জলের সঙ্গে মিশিয়া যাইবে। নিম্নভাগে মাত্র বালুকাই অবশিষ্ট থাকিবে, সেই বালুকা শুষ্ক করিলে জানা যাইবে যে এই মৃত্তিকা খণ্ডে কত ভাগ সার ছিল, কত ভাগ বালি ছিল এবং কত ভাগ অদাহ্য পদার্থ ছিল। যে ভাগটা অদাহ্য পদার্থ ছিল তাহা মৃত্তিকার মল স্বরূপ। যেমন কর্ম্মকারেরা একখণ্ড লৌহ দ্বারা কোন পদার্থ নির্ম্মাণ করণ কালে লৌহকে দগ্ধ করিলে, তাহা হইতে (অকর্ম্মণ্য অসার) মল স্বরূপ একাংশ নির্গত হইয়া যায় (কোন দেশে তাহাকে মলও বলে কোন দেশে খাঁওয়া ও বলে।)

পৃথিবীর অভ্যন্তরেও এক প্রকার স্বাভাবিক তাপ শক্তি নিহিত আছে, স্থল বিশেষে তদ্দ্বারা মৃত্তিকার সার অংশ দগ্ধ হইয়া অদাহ্য ভাগ (যে মল স্বরূপ) অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ক্রমে একত্রিত হইয়া অত্যন্ত জটিল আঠালিয়া মাটী রূপে পরিণত হয়। সেই মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ এবং মধ্যে মধ্যে পীতাভ হয়। উদ্ভিদাদির পক্ষে তাহা যেমন অকর্ম্মণ্য এমন আর

কিছুই না। সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবার জন্য ইহার আর একটী দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি, জীবজগতের জন্যও যেমন জল বায়ু অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, উদ্ভিদাদির পক্ষেও উহা সেইরূপ প্রয়োজনীয়। প্রস্তাবিত মৃত্তিকা এত জটিল যে, তাহাতে জল বায়ু আকর্ষণ করিয়া উদ্ভিদাদির জীবন রক্ষা করিবার উপযোগী শক্তি কিঞ্চিন্মাত্রই নাই। দ্বিতীয়তঃ সচ্ছিদ্রতা না থাকায় উদ্ভিদাদির শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া হইতে পারে না। শুষ্ক হইলে অস্থিবৎ দৃঢ় হইয়া যায়। প্রস্তরাদি এ মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হয়, এবং তাহাও যে মৃত্তিকার এক অংশ বলা হয় এ কথা অনেকেই অবগত আছেন সেও কেবল পৃথিবীর আভ্যন্তরিক তাপাংশের ক্রিয়া মাত্র। এইক্ষণ দেখা আবশ্যক যে, কিরূপ আকৃতি প্রকৃতি এবং কিরূপ গুণবিশিষ্ট মৃত্তিকা কৃষি ক্ষেত্রের উপযোগী। মৃত্তিকাতে সাধারণতঃ পটাস, সোডা, ফস্‌ফরাস্, এমোনিয়া যবক্ষার অম্ল, লবণ, সোরা, ইত্যাদি পদার্থ থাকিলে তাহা কৃষি ক্ষেত্রের উপযোগী হয়। সর্ব্ব প্রকার উদ্ভিদ যখন এক প্রকৃতি বিশিষ্ট নয়, তখন উদ্ভিদের প্রকৃতি অনুসারে ঐ সকল পদার্থের ন্যূনাতিরেক বিবেচনা করা কৃষকের কর্ত্তব্য। অর্থাৎ যে কৃষির প্রকৃতি অনুসারে সোডার ভাগ অধিক থাকা আবশ্যক, ক্ষেত্রে যদি তাহা না থাকে তবে সোডার ভাগ তাহাতে মিশ্রিত করিতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এই রূপ রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা ক্ষেত্র নির্ব্বাচন করার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। যাহাদের প্রতি এ দেশের কৃষিকার্য্যের ভার সাধারণতঃ ন্যস্ত রহিয়াছে, তাহারা রাসায়নিক পরীক্ষা করিবে দূরে থাকুক, ক অক্ষর পর্য্যন্তও জানে না। বিজ্ঞানবিদ্, রসায়নবিদ্ সুশিক্ষিতগণ কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, এ দরিদ্র দেশের এমন সৌভাগ্যের দিন কবে উপস্থিত হইবে তাহাও জানি না। বিশেষতঃ মনে করুন আমাদের দেশে সাধারণতঃ শস্যাদি যে মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে, তাহাতে রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া ভূমিতে সার দিতে হইলে কৃষকের ব্যয় কুলন হইয়া লাভ হইতে পারে না। কাজেই আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় রাসায়নিক পরীক্ষার পক্ষপাতী হইতে পারি না। এবং কাহাকেও এরূপ পরামর্শ দিতে প্রস্তুত নহি। তবে একথা অবশ্য স্বীকার করি যে, কৃষকের পক্ষে রসায়ন শাস্ত্র কতক পরিমাণে জানা থাকিলে বিশেষ উপকার হইতে

পারে, তাহার সন্দেহ নাই। আমাদের এদেশের পক্ষে কৃষি ক্ষেত্র নির্ব্বাচন কালে সাধারণতঃ অপ্রকৃত মৃত্তিকা আর দোয়াস মৃত্তিকা বিশিষ্ট ক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিলে তাহাতে প্রায় সর্ব্বপ্রকার উদ্ভিদই জন্মিতে পারে। তবে উদ্ভিদের প্রকৃতি বিশেষে কোন ক্ষেত্রে বালির ভাগ অধিক, কোন ক্ষেত্র অপ্রাকৃতিক মৃত্তিকার ভাগ অধিক আবশ্যক হয়। যে সকল উদ্ভিদের শাখা প্রশাখায় কি ফলে জলীয় ভাগ অধিক (যথা খিরা, তরমুজ, বাঙ্গি (ফুটী) শশা ইত্যাদি) তাহাকে সম পরিমাণে দোয়াস মৃত্তিকা না হইয়া বালির অংশ কিছু অধিক থাকিলে ভাল হয়। তাহার কারণ ইহাদের প্রকৃতিই জল অধিক আকর্ষণ করে, বালির ভাগ অধিক না থাকিলে জল আকর্ষণ করিবার শক্তির অবরোধ করে। এজন্য নদীর চর ভূমিতেই এই সকল কৃষি উত্তম জন্মিতে দেখা যায়। ইহার বিশেষ বিবরণ কৃষি প্রণালী অধ্যায়ে বিবৃত হইবে, অর্থাৎ যে কৃষির জন্য যেরূপ মৃত্তিকা অধিক উপযোগী এবং মৃত্তিকার কোন্ ভাগ অধিক কোন্ ভাগ ন্যূন থাকা আবশ্যক তাহাও ঐ স্থলে লিখিত হইবে।

মৃত্তিকার জাতি বিভাগ সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত। কেহ কেহ উহাকে বালি, পঙ্ক, বোদ, দোয়াস চিক্কণ, পলল, এই ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। আমরা এই মতের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য রাখিতে পারিলাম না। জল প্লাবিত সিক্ত মৃত্তিকার নাম পঙ্ক, তাহা মৃত্তিকার কোন জাতি নহে; উহাকে একটী ভিন্নজাতি বলিলে শুষ্ক মৃত্তিকাকেও আর একজাতি বলিতে হয়। বোদ কি পললকেও মৃত্তিকার মূল জাতি বলিতে পারিনা, উহারাও সঙ্কর জাতির মধ্যে পরিগণিত। কেবল ভাগের ন্যূনাতিরেক প্রযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন রূপ গুণ ধারণ করিয়াছে। অন্যান্য পদার্থেও যেমন সঙ্করজাতি বিদ্যমান রহিয়াছে সেই প্রকার মৃত্তিকাতেও নানাপ্রকার সঙ্করজাতির উদ্ভব হইয়াছে। হিন্দু সমাজের জাতিমালা পাঠ করিলে যেমন দেখা যায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিটী আদিম জাতি, তাহা হইতেই ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরস্পর সংযোগে নানা প্রকার জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তুলনা করিলে মৃত্তিকাকেও সেইরূপ নানা ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; সে সমুদয়ের বাহুল্য বিবৃতি অনাবশ্যক। কয়েকটী মূল

সূত্র অবলম্বন করিয়া তাহা হইতে কয়েকটী স্থূল স্থূল বিষয়ের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। (আমরা মৃত্তিকাকে প্রথমতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করা অসঙ্গত বোধ করিতেছিনা। ১—প্রাকৃতিক মৃত্তিকা বালি, (বালিকে প্রাকৃতিক মৃত্তিকা নাম দেওয়া কেন হইল তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে)। ২—অপ্রকৃত মৃত্তিকা। ধাতু প্রাণি এবং উদ্ভিদাদির গলিতাংশ মিশ্রিত হইয়া মৃত্তিকারূপে পরিণত হয়। ৩—মল মৃত্তিকা পূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে যাহার সংক্ষেপ উল্লেখ করা হইয়াছে। ৪—সঙ্কর জাতি পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ প্রকারের মৃত্তিকার সংযোগে যে আকার ধারণ করে তাহাকেই সঙ্কর জাতি বলি; সর্ব্ব প্রকার মৃত্তিকাই এই চারি ভাগের অন্তর্গত। ১—বালিকে সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। বালির মধ্যে যে এক অংশ সূর্য্য কিরণে চিক্ চিক্ করে তাহাকে শিলিকা বলে, সেগুলি নানাবিধ ধাতব পদার্থের কণা বিশেষ। একাংশ অত্যন্ত কঠিন, সেগুলি প্রস্তরাদি দৃঢ় পদার্থের কণা, তাহাকে কঙ্কর বলে অপরাংশই বিশুদ্ধ বালি; স্থান বিশেষে পীত, লোহিত, এবং কৃষ্ণ বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, নানাবিধ পদার্থ একত্রিত হইয়া মৃত্তিকার বর্ণ নানারূপ হয়। পীত, লোহিত, কৃষ্ণ ইত্যাদি, যেমন তাম্রপাত্রে অন্য পদার্থ দীর্ঘকাল থাকিলে তাম্রবর্ণ ধারণ করে সেইরূপ নানাবিধ মৃত্তিকার সংশ্রবে বালুকাও বিভিন্ন বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করিয়া থাকে।

২। অপ্রকৃত মৃত্তিকা, ইহা নানাদেশে নানা প্রকার। আমরা সাধারণত ইহাকে চারিভাগে বিভক্ত করিলাম। যথা—পলল, বোদ, দলদলিয়া ও ফাপা মৃত্তিকা। জোয়ারের কি বর্ষার জলে যে ক্ষেত্র ডুবিয়া যায়, সেই সকল ক্ষেত্রের উপরিভাগে একরূপ সরের ন্যায় পড়ে, নানাবিধ পদার্থ জলের সঙ্গে মিশ্রিত হয় এবং তীরস্থ মৃত্তিকার যে অংশ অপেক্ষাকৃত গুরু (বালুকা) তাহা এক স্থানে পতিত হইয়া ক্রমে পরস্পরকে আকর্ষণ করাতে চর রূপে পরিণত হয়। যে অংশ অপেক্ষাকৃত লঘু তাহা জলীয় অন্য অন্য পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া বিস্তীর্ণ ভাবে নানা স্থানে পতিত হইতে থাকে, তাহাকেই পলল অথবা পলি বলে। পুরাতন পুষ্করিণী কি আড়া, গাড়া, নালা, ইত্যাদির পার্শ্বস্থ মৃত্তিকাদি ধৌত হইয়া পড়ে এবং

খাপ দল ঘাস জঙ্গলাদি পচিয়া নীচে পড়ে তাহারই নাম বোদ মৃত্তিকা। পার্ব্বত্য প্রদেশে একরূপ স্থান আছে উহার চতুর্দ্দিক উচ্চ পর্ব্বতে বেষ্টিত, মধ্যস্থল সমতল, অথচ গুহা নয়, অথবা ঠিক উপত্যকাও নহে, তাহাকে ঝিল বলে। ঐ সকল স্থান হয়ত এক সময়ে জলে পূর্ণ থাকিত। ক্রমে পার্ব্বতীয় গলিত উদ্ভিদাদি ধৌত হইয়া পড়াতে উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে; উপরি ভাগে ঘাস জঙ্গল তৃণাদি হইতেছে, উপরিভাগ দেখিতে কঠিন বোধ হয়, কিন্তু ইহার এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত স্বভাবতঃ চলিয়া যাওয়া যায় না। এক স্থানে পাড়া দিলে অনেকদূর পর্য্যন্ত নড়িয়া উঠে তাহাকেই দল দলিয়া বলে। কোন স্থান বহুকাল পতিত থাকে তাহাতে উদ্ভিদাদি পচিয়া একরূপ মৃত্তিকারূপে পরিণত হয়, তাহা প্রকৃতির এক আশ্চর্য্য শিল্পনৈপুণ্য, ঠিক বাতাসার মধ্যভাগ যেমন পরস্পর সংলগ্ন অথচ মধ্যে শূন্য এবং সচ্ছিদ্র; উল্লিখিত মৃত্তিকাও সেইরূপ, তাহারই নাম ফাপা মৃত্তিকা।

৩। "মল মৃত্তিকা" ইহা দুই ভাগে বিভক্ত ১—মল, ২—চিক্কণ নানাবিধ পদার্থের সংযোগে মৃত্তিকাবৎ হয়।

ভূমধ্যস্থ তাপ দ্বারা সারাংশ নষ্ট হইয়া অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়ে, দুগ্ধ আবর্ত্তন কালে যেমন অত্যন্ত তাপ দ্বারা দগ্ধ হইয়া পাত্রের পার্শ্বে এবং নীচে লাগিয়া গেলে, তাহা মন্থন করিলে নবনি পাওয়া যায় না। অর্থাৎ জলীয় ভাগ বাষ্পাকারে উড়িয়া যায় সারাংশ (নবনি) তাহা দগ্ধ হয়। শেষে অকর্ম্মণ্য অব্যবহার্য্য ভাগ পড়িয়া থাকে; সেইরূপ ভূমধ্যস্থ তাপ দ্বারা সারাংশ দগ্ধ হইয়া গিয়া কেবল অকর্ম্মণ্য পদার্থ থাকে বলিয়াই, তাহাকে মল মৃত্তিকা নাম দেওয়া গেল। এই মৃত্তিকা কালবর্ণ, মধ্যে মধ্যে পীত রেখার ন্যায় দেখা যায়, শুষ্ক হইলে অস্থিবৎ দৃঢ় হয়, এই মৃত্তিকার সচ্ছিদ্রতা না থাকায় জলবায়ু আকর্ষণ করিতে পারে না।

এই কথাটী সহজে বোধগম্য হইবার জন্য একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। সচরাচর প্রায় সকল মৃত্তিকার উপরেই আঘাত করিলে কিছু না কিছু পরিমাণ দাবিয়া যায় তাহাতেই মৃত্তিকার সচ্ছিদ্রতা অনুমান করা যায়। কিন্তু এই জাতীয় মৃত্তিকায় আঘাত করিলে একটুকও দাবে না এবং

গুরুতর আঘাত করিলে ফাটিয়া যায়, এই জাতীয় মৃত্তিকা কেবল কুম্ভকারের উপযোগী। ইহা অত্যন্ত আঠাল এই জন্য ইহাকে আঠালিয়াই বলে। ইহারই অপেক্ষাকৃত অদগ্ধ ভাগের নাম চিক্কণ মৃত্তিকা ইহাও সচরাচর আঠালিয়া মাটি নামেই খ্যাত।

৪। সঙ্কর জাতি,—ইহাকে শত শত ভাগে বিভক্ত করা যায়, ইহা পূর্ব্বোক্ত প্রকারের সকল মিশ্রিত মৃত্তিকা, ভাগের ন্যূনাতিরেকে নানা প্রকার গুণবিশিষ্ট হয়; ঐ সর্ব্ব প্রকার মৃত্তিকায় কোন প্রসিদ্ধ নাম নাই। সাধারণতঃ ইহাকে দোয়াস মৃত্তিকাই বলে। আমরাও বাহুল্য হেতু এস্থলে এই আখ্যাই প্রদান করিলাম। এই সকল নানা জাতীয় মৃত্তিকার মধ্যে কোন কোন জাতীয় মৃত্তিকা কৃষি ক্ষেত্রের উপযোগী তাহাই একবার আলোচনা করা আবশ্যক। অপক্ক মৃত্তিকা সাররূপে ব্যবহার করার উপযোগী, বোদ মৃত্তিকা কেবল সার রূপেই ব্যবহার করা যাইতে পারে।

দলদলিয়া মৃত্তিকায় কৃষিক্ষেত্র করিতে হইলে ক্ষেত্রের মধ্যে মধ্যে এবং চতুর্দ্দিকে নালা কাটিতে হয়। কারণ ঐ মৃত্তিকা অত্যন্ত সিক্ত, নালা কাটিয়া দিলে জলীয় ভাগ নিঃসৃত হইয়া ক্ষেত্রের সিক্ততা কতকাংশে দূরীকৃত হইয়া কৃষির উপযোগী হয়। যে সকল উদ্ভিদ জলবায়ু অধিক আকর্ষণ করে তাহাই এইরূপ ক্ষেত্রে উত্তম হয়। পলল এবং ফাপা মৃত্তিকায় প্রায় সর্ব্ব প্রকার কৃষিই উত্তম জন্মিতে পারে। মিশর দেশের নীলনদের তীরবর্ত্তী স্থান পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত উর্ব্বরা, নীলনদের পললই তাহার একমাত্র কারণ। দোয়াস মৃত্তিকায়ও সর্ব্ব প্রকার কৃষি উত্তম জন্মিতে পারে বটে; কিন্তু উদ্ভিদের প্রকৃতি অনুসারে ভাগের ন্যূনাতিরেক হওয়া আবশ্যক, ক্ষেত্র, জলে প্লাবিত হইলেও যে সকল কৃষির ক্ষতি না করিয়া উপকার করে চিক্কণ মৃত্তিকা বিশিষ্ট ক্ষেত্রে তাহাই হইতে পারে। এতভিন্ন অন্যান্য জাতীয় মৃত্তিকায় প্রায় কোন কৃষি উত্তম জন্মিতে পারে না। কৃষি কার্য্য সম্বন্ধে যিনিই কিছু পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তিনিই অবগত আছেন যে, বহু কালের পতিত ভূমি কর্ষণ করিলে উত্তম কৃষি হয়। সুন্দরবন বিভাগে এবং পার্ব্বত্য

প্রদেশের বহুকালীন পতিত ভূমি আবাদ হইয়া তাহাতে অপর্য্যাপ্ত শস্য প্রসূত হইতেছে এবং সেই সকল ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা। ভূমি বহুকাল পতিত অবস্থায় থাকায় নানাবিধ উদ্ভিদাদি গলিত হইয়া এবং পশু পক্ষী জীব জন্তুদিগের মল মূত্র অস্থি মাংস মিশ্রিত হইয়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সার বিশিষ্ট থাকায় ভূমি উর্ব্বরতাশালিনী হয়। বিশেষতঃ ভূমির অভ্যন্তরে উদ্ভিদের উপকারী যে সকল ভৌতিক পদার্থ আছে, পুনঃ পুনঃ কর্ষিত হইলে তাহা হইতে উদ্ভিদের প্রকৃতি অনুসারে সেই সকল পদার্থের হ্রাস হইয়া ভূমির উর্ব্বরতা শক্তির খর্ব্বতা করিয়া ফেলে; ভূমি পতিতাবস্থায় থাকায় ঐ সকল পদার্থের খর্ব্বতা হয় না। কোন্ প্রকার কৃষির দ্বারা ক্ষেত্রাভ্যন্তরীণ কোন্ কোন্ ভৌতিক পদার্থের কত পরিমাণ হ্রাস হইয়া যায় তাহা জানিবার একটি উপায় আছে উদ্ভিদ জাতপদার্থ দগ্ধ করিয়া রসায়ন শাস্ত্রানুসারে পরীক্ষা করিলে জানা যাইতে পারে, যে উহাতে কোন্ পদার্থ কত ছিল; আবার ঐ উদ্ভিদের শস্যে (তুঁষে এবং খড়ে) পদার্থ সকলের ন্যূনাতিরেক থাকে তাহাও ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে নিশ্চয় করা যাইতে পারে, তাহার মধ্যে কতকগুলি পদার্থ বায়ু হইতে, কতক জল হইতে, কতক মৃত্তিকা হইতে। অতএব মৃত্তিকা হইতে যে পদার্থ বিদূরিত হয় তাহাই সাররূপে ক্ষেত্রে সংযোজিত করা কৃষকের আবশ্যক। আমাদের প্রচলিত ব্যবহার্য্য সার অর্থাৎ খৈল গবর ইত্যাদিতেই ঐ সকল পদার্থের অনেক আছে এবং তাহাতেই ঐরূপ ফল হইতে পারে। অকৃষ্ট পতিত ভূমিতে যেমন কৃষির উপযোগী কতকগুলি গুণ আছে, তেমন কতকটা দোষও আছে। যাঁহারা তাহা অবগত নহেন তাঁহারা ঐরূপ ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া উপযুক্তরূপ ফল লাভ করিতে পারেন না। আমরা অনেক স্থলে এমন দেখিয়াছি যে, পতিতাবস্থায় ক্ষেত্র কর্ষণ করিলে প্রাথমিক কৃষি নিতান্ত খারাপ হইয়া পড়ে, প্রথমতঃ তাহার কারণ ভূমি বহুকাল কর্ষিত না হইয়া পতিতাবস্থায় থাকায়, পৃথিবীর আভ্যন্তরিক তাপাংশ অনুমাত্রও বিদূরিত হইতে পারে না। সমুদায় তাপাংশই ক্ষেত্র মধ্যে সন্নিবেশিত থাকে। (সেই তাপাংশকে সাধারণ কৃষকেরা মৃত্তিকার ঝাল বলে)। দ্বিতীয়তঃ মৃত্তিকা কর্ষিত না হওয়ায় তাহার মধ্যে বায়ু

প্রবেশ করিবার পথ রুদ্ধ থাকে, বায়ুর অভ্যন্তরে উদ্ভিদের পোষণোপযোগী অম্লজান, উদজান, এ্যামেনিয়া, জল, যবক্ষার দ্রাবক ইত্যাদি যে সকল পদার্থ আছে, ক্ষেত্র অকর্ষিত থাকায় আভ্যন্তরিক তাপও বহির্গত হইতে পারে না এবং বাহ্য তাপও তাহাতে উত্তম রূপে প্রবেশ করিতে পারে না, ইহা দ্বারা অবশ্য এ কথা বলা যাইতেছে না যে, কর্ষণে ক্ষেত্রের তাপাংশ কমিয়া যায়, সকল বস্তুতেই ন্যূনাতিরেক রূপে তাপ আছে, দুইটী বস্তুর ঘাত প্রতিঘাতে কি ঘর্ষণে যে ঘাতিত কি ঘর্ষিত স্থান অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত হয়, তাহাতে সে বস্তুর অপরাংশের তাপভাগ কমিয়া যায় না, দুইটী পদার্থের তাপভাগ একত্রিত হইয়া একটী শক্তির উৎপত্তি হয়। তাহাতেই বাহ্যতাপকে আকর্ষণ করিয়া ঘর্ষিত কি আহত স্থানকে অধিক উত্তপ্ত করে। বাহ্যতাপে আর অভ্যন্তরীণ তাপে গুণের তারতম্য আছে, যেমন সকল জল ও সকল বায়ুতে সমান পদার্থ থাকে না, কোন স্থানের জল ভার, কোন স্থানে জল লঘু, কোন স্থানে বায়ু অপেক্ষাকৃত গুরু, কোন স্থানে বায়ু অপেক্ষাকৃত লঘু, সেই রূপ অভ্যন্তরীণ তাপে আর বাহ্যতাপে পদার্থের ন্যূনাতিরেক আছে। যথা শ্বাস এবং প্রশ্বাস, প্রশ্বাসের দ্বারা শরীর অভ্যন্তরের যে পরিমাণ তাপাংশ নির্গত হয়, আবার শ্বাসের দ্বারা তৎপরিমাণ তাপকে আকর্ষণ করে, প্রশ্বাসের দ্বারা যে তাপাংশ পরিত্যক্ত হয় এবং শ্বাসের দ্বারা যে তাপাংশ আকর্ষিত হয় তাহাতে সমান পদার্থ থাকে না ভূমি কর্ষিত হইলে তাহার অভ্যন্তরিক দূষিত তাপ নির্গত হয়, বাহ্য বিশুদ্ধ তাপ দ্বারা তাহা পূর্ণ হয়। পতিত অবস্থায় ক্ষেত্র অভ্যন্তরে তাপ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রবেশ করিতে পারে না, সুতরাং পতিত ভূমি কর্ষণ করিয়া উপযুক্ত রূপ ফল না পাওয়ার এই দুইটী প্রধান প্রতিবন্ধক।

বহুকালের পতিত ভূমিকে কৃষিক্ষেত্রের উপযোগী করিতে হইলে, বীজ বপন করিবার নিরূপিত সময়ের অন্যূন ৫৬ মাস পূর্ব্ব হইতে উহাতে মধ্যে মধ্যে চাষ দিয়া রাখা আবশ্যক। তাহা হইলে মৃত্তিকার সহিত যে তাপাংশ বদ্ধ হইয়াছিল তাহা নির্গত হইয়া যায়। এবং বায়ু প্রবেশ করিয়া উদ্ভিদাদির পোষোণোপযোগী পদার্থ সম্মিলিত হয়, পতিত ভূমি

কর্ষণ করিলে প্রথম বৎসর অপেক্ষা দ্বিতীয় বৎসর অধিক ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

জীব জগতে দেখা যায় যে প্রত্যেক জীবই জলের প্রিয় এবং জল ভিন্ন কেহই জীবন ধারণ করিতে পারে না, সেইরূপ উদ্ভিদ জগতেও জল ভিন্ন কোন প্রকার উদ্ভিদ জীবন ধারণ করিতে পারে না,* এই জন্যই শাস্ত্রকারেরা জলের নাম জীবন রাখিয়াছিলেন, জীব জগতেও যেমন জলচর স্থলচর উভ-চর এবং খেচর দেখিতে পাওয়া যায়, উদ্ভিদ জগতকেও সেইরূপ এই চারি ভাগে বিভক্ত করিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। অথচ এই উভয় জাগতিক সকলেই জলের প্রিয়, উদ্ভিদ জগতেও কতক কেবল জলেই জন্মিয়া থাকে যথা শাফলা, পদ্ম, মাখনা, শৈবাল, পানিফল, (ইহাকে কোন দেশে শিঙ্গড়া বলে, কোন দেশে নিখুর বলে)। স্থলে যে বহুবিধ উদ্ভিদ জন্মে তাহার বিবৃতি অনাবশ্যক। যাহা জলেও থাকে স্থলেও থাকে তাহা উভচর। যথা ধান, পাট, কলমি, হেলেঞ্চা, কেচরা ইত্যাদি। এখন কথা হইতেছে খেচর কাকে বলিব, এস্থলে আমরা ব্যাবিলেনের হ্যাঙ্গিন গার্ডনের উল্লেখ করিতে চাই না, কারণ সে অস্বাভাবিক কেবল কৌশলের দ্বারাই নির্ম্মিত।

পূর্ব্বে এক স্থলে স্বর্ণলতা অথবা শূন্য লতার উল্লেখ করিয়াছি তাহাকে খেচর বলিলে অসঙ্গত হয় না, কারণ মৃত্তিকার সঙ্গে তাহার কোন প্রকার সংস্রব নাই। পরগাছা যাহা এক বৃক্ষের উপর অন্য এক জাতীয় বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, তাহাকেও আমরা খেচর আখ্যা দেওয়া অসঙ্গত বোধ করি না।

জীব জগতের মধ্যেও খেচর জাতীয় চাতক যেমন উপরিস্থ জল বিনা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অন্যবিধ জল পান করে না, শূন্য-লতাও সেইরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অন্যবিধ জল পান করে না।

জীব জগতে যেমন কোন জীব জলের অত্যন্ত প্রিয় যথা মহিষ এবং হরিণ ইত্যাদি, সেইরূপ উদ্ভিদ জগতেও অনেক উদ্ভিদ জলের অত্যন্ত প্রিয় যথা কফি আলু ইত্যাদি।

---

* জীব জগতে ছাগ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জলের অপ্রিয়, উদ্ভিদ জগতেও কাঁঠাল গাছ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জলের অপ্রিয়।

মধ্যে জল প্রয়োগ ক্রিয়া শেষ করা উচিত না। একেবারে ক্ষেত্রের সর্ব্বত্র (অন্ততঃ যত অধিক দূর করা যায়) ব্যাপ্ত করিয়া ক্রমে অল্প অল্প পরিমাণে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জল সিঞ্চন করিতে হয়, তাহা হইলে, তাপ দ্বারা উপকারের বিঘ্ন আশঙ্কা অপেক্ষাকৃত কম হয়। এই কারণেই রৌদ্রের আধিক্য সময়ে (অর্থাৎ যখন সূর্য্যের তাপ বৃদ্ধি হয়) কৃষিক্ষেত্রে জলসেক নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রাতে এবং সায়ংকালে জলসেক করা বিধেয়।

ভূমি হইতে উদ্ভিদগণ কিরূপে জল আকর্ষণ করে, এবং ঐ জল কিরূপে উদ্ভিদগণের শাখায় শাখায় পল্লবে পল্লবে প্রবেশ করে এই বিষয়টীও কৃষক মাত্রের জানা আবশ্যক। তিনটী প্রাকৃতিক ঘটনার দ্বারা এই ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। যথা ১ অন্তর্ব্বাহ। ২ বহির্ব্বাহ ও ৩ কৈশিক আকর্ষণ। দুইটী তরল পদার্থের মধ্যে এক খণ্ড চর্ম্ম কি উদ্ভিদের উপত্বক ব্যবধানে থাকে এবং ঐ দুইটী তরল বস্তুর একটা অপেক্ষাকৃত ঘন হয়, তাহা হইলে অনটীর সহিত মিলিত হইবার জন্য পাতলাটি ব্যবধানের মধ্যে দিয়া চলিয়া যায়, তাহারই নাম অন্তর্ব্বাহ। উদ্ভিদগণের আভ্যন্তরিক রস বহির্গত হইলে তাহাকে বহির্ব্বাহ বলা যায়। উদ্ভিদদিগের মূল হইতে শাখা পল্লবের পাতা পর্য্যন্ত অতি সূক্ষ্মাকার ছিদ্র বিশিষ্ট। ঐ সকল ছিদ্র দ্বারা নিম্নস্থ রস সঞ্চালিত হয় তাহারই নাম কৈশিক আকর্ষণ। কেশ তুল্য সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট নল দ্বারা আকর্ষিত হয় বলিয়া উহার নাম কৈশিক আকর্ষণ হইয়াছে।

যে বৃষ্টিরজল কৃষি ক্ষেত্রের অত্যন্ত উপকারী, তাহার আধিক্যও আবার কৃষির অত্যন্ত অনিষ্ট করিয়া থাকে। আমাদের দেশের লোক এসম্বন্ধে কেবল দৈবশক্তির উপর নির্ভর করিয়া থাকে।* যে সকল দেশে বিজ্ঞানের সমধিক চর্চ্চা হইতেছে তদ্দেশবাসিগণ বৈজ্ঞানিক শক্তির দ্বারা আবশ্যকমতেবৃষ্টি নামাইতে এবং নিবারণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। পূর্ব্বে যে এই ভারতবর্ষেও এরূপ সক্ষম লোক ছিলেন না, একথা কেহ বলিতে পারেন না। পৌরাণিক অনেক ইতিহাসে জানা যায় কোন রাজ্যে অনাবৃষ্টি হইলে রাজারা মুনিদিগকে আহ্বান করিয়া যাগ যজ্ঞ হোমাদি দ্বারা বৃষ্টি নামাইত-

* অদ্যাপিও অতি বৃষ্টি অনাবৃষ্টির সময় ইন্দ্রকে দৈ খৈ মানিবার প্রথা কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে।

তেম, ধর্ম্মান্ধ ভারতবাসীরা ভক্তির আধিক্য নিবন্ধন সর্ব্বত্রই ঐশীশক্তি ও সকলই দৈবশক্তি-সম্পন্ন দেখিতেন। মানব শক্তির কোন কার্য্য হয় বলিয়া তাঁহারা একেবারে বিশ্বাস করিতেন না। হয়ত আমেরিকাবাসিগণ যে যে উপকরণ দ্বারা বৈজ্ঞানিক শক্তি বলে বৃষ্টি নামাইতে সক্ষম হইয়াছেন, আর্য্য ঋষিগণও হয় ত সেই উপকরণাদির দ্বারাই সক্ষম হইয়াছিলেন, অথচ তাঁহারা যজ্ঞ হোম সম্ভূত দৈববলেরই নাম করিতেন কিন্তু এই দৈববল ও বিজ্ঞান বল উভয়ই বস্তুত একই পদার্থ।

আমাদের দেশে এখনও এ আশা করিবার সময় হয় নাই। কিন্তু তথাচ বৃষ্টির আধিক্য এবং অল্পতার ভবিষ্যৎ গণনা সম্বন্ধে কৃষি ব্যবসায়ীদের জানিবার উপায় চেষ্টা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। ক্রমাগত কিছু দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বৃষ্টির অবস্থা সংগ্রহ করিয়া লইলে তাহা হইতে কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। আমরা মাত্র তিন বৎসর যাবৎ প্রতিদিন আকাশে কিরূপ অবস্থা হয়, বায়ু কিরূপ হয়, মেঘগর্জ্জন বিদ্যুৎ ইত্যাদির বিবরণ এবং তিথি নক্ষত্রাদির বিষয় সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছি এই অল্প কালের সংগৃহীত তালিকার দ্বারা কোন মতামত প্রকাশ করা যাইতে পারে না।

এ সম্বন্ধে আর্য্যঋষিপ্রবর পরাশর স্বকীয় কৃষি সংহিতায় যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা এস্থলে প্রকাশ করা যাইতেছে। পৌষ মাসকে বার দিয়া ভাগ করিলে যত হয় * তাহার যে অংশে যেরূপ বৃষ্টি হইবে, বৎসরের সেই মাসে সেই রূপ বৃষ্টি হইবে অর্থাৎ প্রথম ভাগে বৃষ্টি হইলে মাঘ মাসে বৃষ্টি হইবে অষ্টম ভাগে যদি বৃষ্টি না হয় তবে শ্রাবণ মাসে বৃষ্টি হইবে না ইত্যাদি। কিন্তু এই সম্বন্ধে গণনায় ভিন্ন ভিন্ন মতও দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বৈশাখ হইতেও প্রথম ভাগ ধরিয়া গণনা করিয়া থাকেন। যাহা হউক এই সূত্রানুসারে কেবল মাসই ঠিক করা যাইতে পারে। সে মাসের কোন্ দিনে কেমন সময় হইবে তাহা ঠিক করিবার কোন উপদেশ তিনি দেন নাই। তথাচ আমরা তাঁহার ঐ সূত্র অবলম্বন করিয়া সেই এক ভাগে যে

---

* পৌষ মাস ৩০ দিনেও হয় কখন কখন ২৯ দিনেও হয়। ৩০কে ১২ দিয়া ভাগ করিলে ২½ হয়, ২৯কে ভাগ করিলে তদপেক্ষা কম হয়।

২॥ পড়ে, তাহাকে সেই মাসের সংখ্যা দ্বারা অর্থাৎ অষ্টম ভাগে শ্রাবণ মাস। এই মাস যদি ৩২ দিনে হয় তবে ২॥কে ৩২ দিয়া ভাগ করিয়া লইলে যত হয় ঐ ২॥ দিনের মধ্যে ঐ ভাজ্য সময়ে কোন্ ভাগে বৃষ্টি হইলে মাসেরও সেই দিনে বৃষ্টি হইবে এইরূপ গণণা করিয়াছি। কিন্তু যদিও একবারে ঠিক ঐক্য হয় নাই, তথাচ অনেক গুলি ঐক্যও হইয়াছে। এই অনৈক্য কি আমাদের গণনার ভুলেই হইয়াছে, কি পৌষ মাসের দিনের অবস্থা নির্ব্বাচনেই হইয়াছে তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। এইরূপ গণনা যে কেন ঠিক হইবে ইহার কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেওয়া আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের সাধ্যাতীত; বিশেষতঃ সকল বিষয়েই বৈজ্ঞানিক যুক্তি থাকে না, অনেক গুলি বিষয় বহুদর্শিতার ফল, যথা সামুদ্রিক, কর রেখা দেখিয়া ভূত ভবিষ্যৎ গণনা করা ও কেবল বহুদর্শিতার ফল, ইহাতে বৈজ্ঞানিক যুক্তি থাকিলেও তাহা বহুকাল যাবৎ লোপ হইয়াছে, এখনও অনেক বিজ্ঞ বিজ্ঞ ডাক্তার মনুষ্যের মস্তক দেখিয়া তাহার বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান এবং মনোবৃত্তি স্থির করিতে পারেন। এও প্রথমতঃ বহুদর্শিতানুসারে ঘটিয়াছিল, শেষে চিন্তা করিয়া কারণ উদ্ভাবন করিয়াছেন।

তিনি আরও বলিয়াছেন পৌষ মাসে অধিক ধূমাকার হইলে এবং পশ্চিম দিকে বিদ্যুৎ কুজ্ঝটিকা বা বৃষ্টি হইলে আষাঢ় মাসে অধিক জল হইবে। এখানে তর্ক হইতে পারে যে, সকল স্থানে পশ্চিম দিক হয় কেমন করিয়া? যে স্থানের পশ্চিম দিকে এইরূপ ঘটে সেই স্থানের সম্বন্ধেই ঐরূপ বলা হইয়াছে। এক স্থানে এক সময় বর্ষা অধিক হইলেই পৃথিবী ব্যাপিয়া হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। মাঘ মাসের কৃষ্ণ পক্ষীয় সপ্তমীতে বৃষ্টি কি মেঘ হইলে ফাল্গুনের শুক্ল সপ্তমীতে চৈত্রের তৃতীয়ায় এবং বৈশাখের প্রথম দিনে অত্যন্ত বায়ু প্রবাহিত হইলে কি বিদ্যুৎ প্রকাশ হইলে কি বৃষ্টি হইলে সে বৎসর বৃষ্টি ও বর্ষার অবস্থা অতি উত্তম হয়।

যদি মাঘ মাসে অনবরত বৃষ্টি পড়ে, ফাল্গুনে বায়ু প্রবাহিত হয়, চৈত্র মাসে আকাশ মেঘাকীর্ণ বৈশাখে শিল পতন ও জ্যৈষ্ঠ মাসে অত্যন্ত রৌদ্র হয়, তবে সেই বৎসর বর্ষার প্রারম্ভ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত অপর্য্যাপ্ত বৃষ্টি হইয়া থাকে।

চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় প্রতিপদ দিনে যদি রবিবার হয়, তবে পরবর্ত্তী বৎসরে সামান্য রূপ বৃষ্টি হইয়া থাকে। ঐদিন সোমবার হইলে অধিক বৃষ্টি হয়, মঙ্গলবার হইলে বৃষ্টি ভাল রূপ হয় না, বুধ বৃহস্পতি, কি শুক্রবার হইলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য হয়, ঐ দিন শনিবার হইলে এক বারেই অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের চিত্রা, স্বাতি, ও বিশাখা নক্ষত্রে আকাশ মেঘশূন্য অর্থাৎ পরিষ্কার থাকিলে শ্রাবণমাসে অধিক বৃষ্টি হয়। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক গুলি লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। বাহুল্য নিবন্ধন কতক পরিত্যাগ করিলাম। আমাদের পরীক্ষা শেষ হইলে সময়ান্তরে ফল প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

তেজ।

তেজ আলোক এবং তাপ, এই বিবিধ পদার্থ উদ্ভিদের প্রয়োজনীয়। ইহারই তাপাংশের বিষয় স্থানান্তরে প্রসঙ্গ ক্রমে কতক উল্লেখ করা হইয়াছে। উদ্ভিদগণের প্রকৃতি অনুসারে ন্যূনাতিরেক রূপে তাপাংশ ব্যতীত বীজের উপরি ভাগ জীর্ণ ও বিদীর্ণ হইয়া অঙ্কুর উদ্‌গত হইতে পারে না। একবারে জলে ডুবাইয়া রাখিলে কোন প্রকার বীজেরই অঙ্কুরোদ্‌গম হয় না। কিছু কাল জলে রাখিয়া পরে তাপ ও আলোক পাইতে পারে এরূপ অবস্থায় রাখিলে অতি সত্বরই অঙ্কুর উদ্‌গত হইয়া থাকে। জীবগণও যেমন আহার করে, উদ্ভিদগণও সেইরূপ আহার করে। জীবাদির পরিপাক শক্তি আছে, উদ্ভিদদিগেরও পরিপাক শক্তি আছে। জীবাদিতেও মল মূত্র পরিত্যাগ করে উদ্ভিদেরাও তাহা করে। কিন্তু সকলেরই এই পরিপাক শক্তির মূল তাপ। এই তাপের দ্বারাই উদ্ভিদগণের প্রকৃতি অনুসারে আহার্য্য (রস আকর্ষণ) আহরণ করে, পরিপাক করে, এবং পরিত্যাগ করে। ত্বক এবং পত্রাদি হইতে বাষ্পাকারে যে সকল পদার্থ নির্গত হয়, তাহাই উদ্ভিদগণের মল স্বরূপ, তাপাংশ ব্যতীত তাহা হইতে পারে না। আলোকে উদ্ভিদগণের (প্রকৃতি অনুসারে) কোমলত্ব দূর

করিয়া উহাদিগকে দৃঢ় (কাষ্ঠ সংস্থান) করে। আলোকে অম্ল অঙ্গারক বাষ্পীয় অঙ্গার ও অম্লজল ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে, এই অঙ্গারই উদ্ভিদের কাষ্ঠ সংস্থানের প্রধান উপকরণ। অন্ধকারে অম্ল অঙ্গারক বাষ্পের ভাগ সমান থাকিতে পারে না। অপেক্ষাকৃত অন্ধকারেও অঙ্কুর উদ্গত হইতে দেখা যায়। সে সকল অঙ্কুর এক বারে শ্বেত বর্ণ এবং অত্যন্ত কোমল হইয়া থাকে, কিন্তু সেই সকল স্থানেও যে, ন্যূনাতিরেক রূপে তাপ প্রবেশ না করে এ কথা বলা যাইতে পারে না। আলোক দ্বারা উদ্ভিদগণের বর্দ্ধন শক্তি বর্দ্ধিত হয় এবং বর্ণ হরিত হইয়া থাকে। আলোক ও উত্তাপের আকর সূর্য্যাভিমুখে বলিয়াই উদ্ভিদগণের উদ্গমনের শক্তি উৎপন্ন হয়।

এস্থলে একটা প্রবাদ বাক্যের উল্লেখ করা যাইতেছে। এই রূপ প্রবাদ আছে যে, "উদ্ভিদগণ যে ফল পুষ্পাদি প্রসব করে, চন্দ্র রশ্মি সেই প্রজনন শক্তির বীজ স্বরূপ।" এই প্রবাদকে আমরা এক বারে অমূলক বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারি না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে কোন স্থানে এক বারে চন্দ্র রশ্মি প্রবেশ করিবার শক্তি অবরোধ করিয়া কোন উদ্ভিদ উৎপাদন করিলে অন্যান্য প্রকার পদার্থের দ্বারা তাহা সজীব থাকিতে পারে। কিন্তু উহার ফল বা পুষ্পাদি জন্মিতে পারে না।

এই তাপ এবং আলোক সর্ব্ব প্রকার উদ্ভিদেরই সমান উপযোগী, আমরা এ কথা বলিতেছি না। সাধারণতঃ ন্যূনাতিরেক রূপে সর্ব্ব প্রকার উদ্ভিদেরই আবশ্যক। তবে প্রকৃতি অনুসারে অল্প এবং অধিকের প্রয়োজন হয়, তাহা স্থানান্তরে প্রকাশ করা যাইতেছে।

বায়ু।

এই পরম পদার্থ, পার্থিব সমুদয় বস্তুর জীবনীশক্তির মূল। এক মুহূর্ত্ত কাল ইহার অভাব হইলে সংসারের কোন পদার্থেরই জীবনী শক্তি থাকে না, সমুদায়ই এক বারে ধ্বংস হইয়া যায়। ফলতঃ জগতে জীবন ধারণের উপযোগী যত প্রকার পদার্থ বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায় অপেক্ষা ইহাই একমাত্র শ্রেষ্ঠতম।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা স্থির করিয়াছেন, অম্লজান ও যবক্ষারজান এই দুই পদার্থের যোগে বায়ুর উৎপত্তি হয়। কিন্তু সর্ব্বত্রই বায়ুতে যে মাত্র এই দুই পদার্থই থাকে তাহা নয়। স্থান বিশেষে বায়ুর লঘুত্ব, গুরুত্ব আছে, উষ্ণতা, শীতলতার ন্যূনাতিরেক আছে, শুষ্কতা, আর্দ্রতা আছে। সর্ব্ব প্রকার উদ্ভিদ যে সকল দেশে জন্মে না, কি জন্মিলেও দীর্ঘজীবী কি ফলশালী হয় না, তাহার প্রধান কারণই বায়ুর পার্থক্য বলিয়া বোধ হয়। কতকগুলি প্রত্যক্ষ কারণের দ্বারা আমরা এই অনুমান করিতে পারি। লবণাক্ত বায়ু যে স্থানে সঞ্চালিত না হয়, সে স্থানে নারিকেল বৃক্ষ জন্মে না, অথবা জন্মিলেও দীর্ঘজীবী কি ফলশালী হয় না। এই জন্য বঙ্গ উপসাগরের নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে নারিকেল যে রূপ জন্মে আর কোথাও তদ্রূপ জন্মে না।* বায়ুর উষ্ণতা ও আর্দ্রতা এই উভয় বিধ শক্তি না থাকিলে সে স্থানে চা বৃক্ষ জন্মিতে পারে না। আসাম প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশের বায়ুতে যুগপৎ এই উভয় শক্তি সম্মিলিত থাকাতেই এই সকল দেশে চা জন্মে। অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তি বৈজ্ঞানিক চেষ্টায় অপ্রাকৃত বলের দ্বারা কতক পরিবর্ত্তন কি ন্যূনাতিরেক করা যাইতে পারে। যথা দেখা গেল কোন স্থানে উদ্ভিদের প্রকৃতি অনুসারে ম্যাগনিসিয়া এমোনিয়া পটাস আবশ্যক, ক্ষেত্রে তাহা সেই পরিমাণে নাই। মৃত্তিকার অভ্যন্তরে তাহা সংযোগ করা যাইতে পারে। কোথাও বা কেবল উদ্ভিদের প্রকৃতি অনুসারে জল হইতে যে পদার্থ আহরণ আবশ্যক, স্থানীয় জলে তাহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নাই, তাহা যোগ করা যাইতে পারে ইত্যাদি। কিন্তু যে স্থানের প্রাকৃতিক শক্তিতে বায়ুতে যে পদার্থ নাই, সেই স্থানের বায়ুতে তাহা নিয়োগ করা বড় সহজ কথা নয়; এমন কি তাহা অসাধ্য ব্যাপার বলিলেও অসঙ্গত কি অত্যুক্তি হয় বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না।

বায়ু দুইটী মূল পদার্থের সংযোগে উৎপত্তি হইলেও তাহাতে উদ্ভিদ পোষণোপযোগী অন্যান্য পদার্থ সম্মিলিত থাকে। অম্লজান, উদকজান,

* ইহার বিশেষ বিবরণ ১২৮৭ সালের বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষিতত্ত্বে প্রকাশ করা হইয়াছে এস্থলে তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম।

অ্যামোনিয়া, জল, যবক্ষার দ্রাবক ইত্যাদি পদার্থগুলিন থাকায় উদ্ভিদগণের বিশেষ উপকার হয়।

যে সকল স্থানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বায়ু সঞ্চালিত হইতে না পারে, সে সকল স্থানের উদ্ভিদ সতেজ এবং ফলশালী হয় না, এই কারণেই উদ্ভিদগণের প্রকৃতি অনুরূপ পরিমাণ অনুসারে দূরবর্ত্তী স্থানে রোপণ করা আবশ্যক, যে তাহাদের উপযোগী রস তাপ বায়ু পাইতে পারে। উদ্ভিদদিগের মূলদেশের মৃত্তিকা খনন কি আল্‌গা করিয়া দিলে যে তাহারা সবল এবং বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তাহার প্রধান কারণই এই যে, মূলদেশে বায়ু প্রবাহিত হইয়া পুষ্টিবর্দ্ধন করে।

জল, তাপ সার ইত্যাদি অন্যান্য সকল বস্তুরই আধিক্যতাতে উদ্ভিদগণের অনিষ্ট করে; কিন্তু (বায়ু যদি অত্যন্ত প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হইয়া উদ্ভিদের শাখা পল্লবাদি ভগ্ন কি শীর্ণবিশীর্ণ করিয়া না দেয় তবে) বায়ুর আধিক্যতায় উদ্ভিদগণের অন্য কোন প্রকারে অনিষ্ট করে না।

সার।

ক্ষেত্রে সার দেওয়ার উপকারিতা আমাদের দেশের অতি অল্প কৃষকেরাই অবগত আছেন। এমন কি অনেক স্থলের কৃষকেরা সারের আবশ্যকতা কি উপকারিতা একেবারে স্বীকারই করে না। যে সকল স্থানের ক্ষেত্র সকল বর্ষার জলে কি জোয়ারের জলে প্লাবিত হইয়া যায়, সেই সকল স্থানের কৃষকদিগেরই এইরূপ মনের সংস্কার, তাহারা জানে না যে, প্রকৃতিদেবীর প্রসন্নতাতেই তাহাদের ক্ষেত্র সকল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য প্রদান করিতেছে।

"সারে" উদ্ভিদগণের আহার্য্য এবং ঔষধি উভয়বিধ কার্য্যই সম্পাদন করে। মনুষ্যাদিতে শাক পাতা, ডাইল, তরকারি খাইয়াও জীবনধারণ করিতে পারে; আবার দুগ্ধ, ঘৃত, মাংস রুটি ইত্যাদি খাইয়াও জীবনধারণ করিতে পারে। শাক-পাতা-ভোজী ব্যক্তি অপেক্ষা, দুগ্ধ ঘৃত ইত্যাদি উপাদেয় বস্তু ভোজী ব্যক্তি যে অপেক্ষাকৃত সবল, দীর্ঘজীবী এবং অরোগী হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে? আহার্য্য বস্তুর উৎকর্ষতার সঙ্গে

কেবল যে, শারীরিক সম্বন্ধ তাহা নয়, মানসিক বৃত্তি সকলেরও উৎকর্ষ্য সাধিত হইয়া থাকে। বিচার করিয়া পানভোজন করিলে যেমন মনুষ্যাদিকেও ঔষধির কার্য্য হইয়া অরোগী করে, অবিচারে পানভোজন করিলে শরীর রুগ্ন হইয়া সত্বরই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; সেইরূপ কৃষকেরও সার প্রয়োগের ব্যবস্থা জানা না থাকিলে অবিচারে সার ব্যবহার করিলে উদ্ভিদগণের উপকার না হইয়া বরং অপকার হয়।

যে সকল স্থান বর্ষার জলে কি জোয়ারের জলে প্লাবিত না হয়; সেই সেই স্থানের কৃষকদিগের সামান্যতঃ কিছু কিছু সার ব্যবহার করিতে দেখা যায়। কৃষকেরা কোন কোন স্থানে ইক্ষুক্ষেত্রে খৈলও ব্যবহার করে। গঙ্গার পশ্চিম পার হইতে হিন্দুস্থান, উত্তর বাঙ্গলা এবং আসাম বিভাগে এই ব্যবহার কতক পরিমাণে দেখা যায়। ইহারাও সার ব্যবহারের রীতি অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি জানে না, এবং সার কিরূপে রক্ষা করিতে হয় তাহার প্রণালীও জানে না। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের কৃষকগণ যেরূপ যত্ন ও ব্যবহার সহকারে সার রক্ষা করেন এবং ব্যবহার করেন তাহার শতাংশের একাংশ করিলেও আমাদের দেশে ক্ষেত্রে গোলা (অর্থাৎ অপর্য্যাপ্ত শস্য) ফলিতে পারে।

নিম্নে যতবিধ প্রকার সারের উল্লেখ করা যাইতেছে, তন্মধ্যে ধাতব সার ভিন্ন অপর সমুদয়বিধ সারই জলবায়ু এবং তাপ হইতে রক্ষা করিতে হয়। কোন সারপদার্থ যে স্থানে রক্ষা করিতে হইবে, বৃষ্টির জল কি বর্ষার জল তাহার উপরিভাগ দিয়া চলিয়া গেলে তাহার গুণের হানি করে। কারণ সার পদার্থের জলীয়ভাগে সারবান বস্তু যাহা যোগ থাকে তাহা জলের সঙ্গে চলিয়া যায়। সর্ব্বদা বায়ু প্রবাহিত হইলে ঐরূপ গুণের হানি করে। তাপেতে জল বায়ু অপেক্ষা অধিকতর অনিষ্ট করে; কারণ জলে কেবল জলীয় ভাগের সারাংশের অনিষ্ট করে; বায়ুতে কেবল বায়বীয় ভাগের সারাংশের অনিষ্ট করে; তাপে সর্ব্বপ্রকার অনিষ্ট করে। তাপ দ্বারা বায়বীয় ভাগ বায়ুতে মিলিয়া যায়, জলীয়ভাগ বাষ্পাকার উড়িয়া যায়। এই সকল সম্বন্ধে রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা যাহা স্থির হইয়াছে, নিম্নে তাহার তালিকা প্রকাশ করা যাইতেছে।

কোন বস্তুই গলিত হইয়া মৃত্তিকার মিশ্রিত কি মৃত্তিকারূপে পরিণত কি তদোপযোগী না হইলে তাহাতে সারের কার্য্য করে না। প্রাণী সার এবং উদ্ভিদ সার এই দ্বিবিধ সারই সচরাচর ব্যবহার্য্য এবং ইহাকেই যত্নের সহিত রক্ষা না করিলে গুণের হানি হয়। এই সার প্রস্তুত করিবার সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম উপায় মৃত্তিকা খনন করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে এবং নিম্নে ইষ্টক দ্বারা পোস্তা বান্ধিয়া তাহার মধ্যে কিম্বা বড় বড় মাইটের মধ্যে প্রথমতঃ নিম্নভাগ কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা ছড়াইয়া দিয়া তদুপরি যেবস্তু সাররূপে ব্যবহার করিতে হইবে তাহা দিতে হয়। পুনরায় তদুপরি কিছু মৃত্তিকা ছড়াইয়া দিতে হয়, এইভাবে স্তরে স্তরে সার বস্তু এবং মৃত্তিকা দিয়া রাখিতে হয়। মধ্যে মধ্যে তাহাতে পশু ও পক্ষী কি মনুষ্যের মুত্রাদি নিক্ষেপ করিতে হয়। মুত্রেতে দ্রাবক শক্তি অধিক থাকায় ঐসকল বস্তুকে সত্বর সত্বর গলিত করে। এই ভাবে পাত্র পূর্ণ হইলে কোন প্রকার আচ্ছাদন দিয়া রাখিতে হয় এবং তদুপরেও মধ্যে মধ্যে ঐপ্রকার মুত্রাদি নিক্ষেপ করিতে হয়। এইরূপে সার প্রস্তুত এবং রক্ষা করিলে গুণের অনুমাত্রও ক্ষয় হয়না। এতদূর যত্ন কি পরিশ্রম সহকারে সার প্রস্তুত কি রক্ষা করিতে নাপারিলে, ঐ ভাবে মাত্র মৃত্তিকা খনন করিয়াই তন্মধ্যে ঐরূপ স্তরে স্তরে সার, এবং মৃত্তিকা দিতে হয় এবং সময় সময় উক্ত রিষরূপ মুত্রাদিতে হয়। খাত পূর্ণ হইলে অবশেষে অপেক্ষাকৃত অধিক মৃত্তিকা দিয়া রাখিতে হয়। খনিত স্থানের চতুষ্পার্শে মাটি দিয়া আলির মতন প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়, যেন বৃষ্টির জল তাহাতে গড়াইয়া পড়িয়া সারের অনিষ্ট করিতে নাপারে। ইষ্টক নির্ম্মিত কূপে এবং মাইটের সহিত ইহার এইমাত্র প্রভেদ যে তাহার সারাংশ অপর মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইয়া যায় না সমুদয়ই পাত্র মধ্যে থাকে, তাহা না করিলে কতক-কাংশ পার্শস্থ অপর মৃত্তিকার সহিত যোগ হইয়া কমিয়া যায়। শেষোক্ত প্রকারে রক্ষা করিলে বিশেষ অনিষ্ট হয় না, প্রাণী সার অনধিক তিন মাসেই উত্তম সার প্রস্তুত হয়। কালের নির্ণয় করা যায় না। উদ্ভিদের প্রকৃতি অনুসারে কালের ন্যুনাধিক হয়।

নানা জাতীয় পশ্বাদির মল মুত্রে কত অংশ অঙ্গারজান পাওয়া যায়

রাসায়নিকবিদ পণ্ডিতগণ তাহার পরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া যাইতেছে, শত ভাগ মল মূত্রে উক্ত দ্বিবিধ পদার্থের যত আছে।

	জল	ধবক্ষারজান
গরু	৯০,৬০	০২২
ঘোঁড়া	৭৫,৬১	০৫৪
শুকর	৮১,০০	০৬৩
মেষ	৩৫,০	১.১১

কোন বস্তুই মৃত্তিকা রূপে পরিণত না হইলে তাহা সার রূপে ব্যবহার করা উচিত নয়। তাহাতে উদ্ভিদগণের সম্পূর্ণ উপকার করে না কোন উদ্ভিদের যদিও কথঞ্চিত উপকার করিতে পারে কিন্তু অপকারও করিয়া থাকে। ইহাকে অপরিপক্ক সার বলা যায়। মনুষ্যাদির পক্ষে যে বস্তু পাক করিয়া খাওয়ার বিধি আছে তাহা উত্তম রূপ পাক (সুসিদ্ধ) না হইলে যেমন আহারে অপকার হয়, এই অপরিপক্ক সার দ্বারাও উদ্ভিদের অপকার হইয়া থাকে। বিশেষতঃ আমাদের দেশে সচরাচর কৃষিক্ষেত্রে ফলে ফুলে গাছে পোকা ধরিতে দেখা যায় তাহার এইটীই এক প্রধান কারণ। অধিকাংশ স্থলে অপরিপক্ক সার ব্যবহার করাতে অধিকাংশ স্থলেই অনিষ্ট ঘটিতে দেখা গিয়াছে।

সার পূর্ব্ববিধ প্রকার রক্ষা করিয়া উত্তম রূপ পরিপক্ক হইলে ক্ষেত্রে তিন চারি চাষ দেওয়ার পর ক্ষেত্রের মধ্যে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপাকার করিয়া রাখিয়া দিতে হয়। পরে ক্রমে এমন ভাবে চাষ এবং মই দিতে হয় যে সমুদায় ক্ষেত্র সারে বিস্তৃত হইয়া যায়। ক্ষেত্রে সার দিয়া কএক দিন অতীত করিয়া বীজ বপন করিতে হয় তাহা হইলে সারের আভ্যন্তরিক পদার্থ সকল ক্ষেত্রের মৃত্তিকার সহিত উত্তম রূপ যোগ হইতে পারে। আবার ক্ষেত্রে সার দিয়া অনেক দিন ফেলিয়া রাখিলেও সারের গুণের হানি করে। অন্য কোন প্রকার ঘাস জঙ্গলাদি জন্মিলে তো সারের গুণ এক বারেই নষ্ট করিয়া দেয়। কোন প্রকার কৃষির জন্য কত পূর্ব্বে ক্ষেত্রে সার দেওয়া উচিত তাহা যথা স্থানে প্রকাশ করা যাইতেছে।

মনুষ্যাদিরও যেমন সর্ব্বদা পুষ্টিকর পদার্থ অপরিমাণ পান ভোজন

করিলে অজীর্ণাদি নানা প্রকার রোগের উৎপত্তি হয়, অথবা অত্যন্ত পুষ্টি দ্বারায় শরীর গণ্ড পিণ্ড হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। কেহ তাহাকে মেদচোনাও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে স্ত্রীজাতির অত্যন্ত পুষ্টিবর্দ্ধন দ্বারা বন্ধ্যা দোষও ঘটে। ক্ষেত্রে অপরিমাণ মত সার ব্যবহার করিলে তদুৎপন্ন কোন প্রকার উদ্ভিদ অত্যন্ত সবল হইয়া উঠে।* কোন জাতির অত্যন্ত সারের তেজে হয়ত নিতান্ত ক্ষীণাবস্থা ধারণ করে। কিন্তু এরূপ স্থলে প্রায় সর্ব্বপ্রকার উদ্ভিদেরই বন্ধ্যাত্ব ঘটে অর্থাৎ উপযুক্তরূপ ফল পুষ্পাদির প্রসব শক্তির হ্রাস হইয়া যায়।

মনুষ্যাদির যেমন বাল্যাবস্থায় লঘু দ্রব্যাদি পান ভোজনের বিধি রহিয়াছে, ক্রমে সবলতার সহিত এবং অভ্যাসের সহিত গুরু আহার সহ্য হয় উদ্ভিদদিগেরও সেইরূপ। এই কারণে যেরূপ কৃষির জন্য যে পরিমাণ সার ব্যবহারের বিধি। এক বারে তাহা না দিয়া তাহাদের অবস্থা ভেদে এবং সবলতানুসারে দুই বারে তিন বারে সার দেওয়া উচিত। যে কৃষির জন্য যেরূপ ব্যবহার করা উচিত কৃষিপ্রণালী স্থলে যথাক্রমে তাহার বিবরণ প্রকাশ করা যাইতেছে।

এই সার কত প্রকার উপকার উপযোগী শক্তি সম্পন্ন এবং কোন প্রকার সারেতে কোন প্রকার উদ্ভিদের উপকার করে তাহাই এস্থলের আলোচ্য বিষয়। সার বহুবিধ প্রকার। আমরা তাহাকে ৪টী মূল বস্তু অবধারণ করিয়া লইলাম। প্রথমতঃ ৪ ভাগে বিভক্ত করত তাহাদের আখ্যা প্রদান করিয়া তাহাদের এক একটী মূল বস্তু হইতে যত বিধ প্রকার বস্তু আছে, যথাক্রমে তাহাদের বিবৃতি প্রকাশ করা যাইতেছে। এই বিভাগ এবং আখ্যা অন্যান্য কৃষিশাস্ত্রবিদগণের মতের সহিত ঠিক ঐক্য রহিল না।

কোন একটী নূতন কথা বা নূতন পদ্ধতি শুনিলেই তাহার যুক্তি বা কারণের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া এক বারে চমকিত হইয়া উঠেন এবং বক্তার প্রতি বিদ্রূপ বর্ষণ হইতে থাকে, যা হউক আমরা ভীতির আশঙ্কা

---

* সাধারণ কৃষকেরা ইহাকে কোন কোন স্থানে দামাইয়া যাওয়া বলে, কোন স্থানে ডাকিয়া যাওয়া বলে।

পরিত্যাগ করিয়াও ইহা ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইতেছি। চারি প্রকার সার যথা প্রথম প্রাকৃতিক, দ্বিতীয় জৈবিক, তৃতীয় ঔদ্ভিদিক, চতুর্থ মৈশ্র।

প্রাকৃতিক সার ৩ ভাগে বিভক্ত—জল, বায়ু তাপ। এস্থলে এইরূপ এক প্রশ্ন উত্থাপন হইতে পারে যে, যে সকল পদার্থের সংযোগে জল বায়ু প্রভৃতির সৃষ্টি, সেই সমস্ত ভৌতিক পদার্থকে উল্লেখ না করিয়া জল বায়ু বলা হইল কেন,তাহা হইলে আর বিভাগ হয় না। যদিযাবতীয় বস্তু মাত্রেই ভৌতিক পদার্থের দ্বারা সৃষ্টি হয় তবে সকল স্থলেই মাত্র ভৌতিক পদার্থের উল্লেখ করা আবশ্যক। চিনিকে আর ছানাতে সন্দেশ প্রস্তুত হয়, তাহাতে যে গুণ উৎপন্ন হয় সে সন্দেশেরই গুণ বলিতে হয়; তখন চিনি আর ছানা অথবা ইক্ষুরস আর দুগ্ধের গুণ উল্লেখ করা অবৈধ। যাহা হউক বাহুল্য বিচার এস্থলে অনাবশ্যক। জল বায়ু তাপাদির গুণাগুণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে বর্ণন করা হইয়াছে, এস্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

৩। চুণ লবণ সোরা ইত্যাদিকে আমরা প্রাকৃতিক সার মধ্যে পরিগণিত করিয়া লইলাম। চুণ লবণ সোরা রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা অনেক পদার্থ হইতেই উৎপন্ন করা যাইতে পারে। আমরা তদবধি রাসায়নিক ক্রিয়ার উৎপন্ন চুণ লবণ ইত্যাদির বিষয় এস্থলে আলোচনা করিতেছি না। সাধারণতঃ যে চুণ, লবণ, এবং সোরা সচরাচর যাহা পাওয়া যায় কি ব্যবহার করা যায় তাহারই কথা বলা হইতেছে।

লবণের সাধারণতঃ উদ্ভিদ পোষক কোন গুণ আমরা দেখিতে পাই না এবং ইহা সার রূপে ব্যবহারও হয় না কিন্তু কোন উদ্ভিদের উপকার করে। লবণ নারিকেল গাছ ভিন্ন অন্যবিধ উদ্ভিদের বিশেষ উপকার করে কি না আমরা অদ্যাপি তাহা জানিতে পারি নাই। আমরা কেবল নারিকেল গাছের পক্ষেই ইহা সুসঙ্গত ব্যবস্থা মনে করি। বিশেষতঃ যে সকল দেশের জল বায়ু মৃত্তিকাতে লবণাক্ততা নাই সে সকল দেশে নিয়ম মতে লবণ সার রূপে ব্যবহার করিয়া নারিকেল গাছ উৎপন্ন এবং পালন করা নিতান্তই আবশ্যক। যে দেশের জল বায়ু মৃত্তিকা স্বভাবতই লবণাক্ত সে দেশে ব্যবহারে তত আবশ্যক নাই। সুন্দরবন প্রদেশ ভিন্ন যে নারিকেল সর্ব্বত্র জন্মে না, কি কদাচিৎ জন্মিলেও দীর্ঘজীবী কি উত্তম ফল-

বান হয় না তাহার একমাত্র কারণ এই যে, সে সকল স্থানের জল বায়ু মৃত্তিকা স্বভাবতই লবণাক্ত। দুই ভাগ লবণের সহিত এক ভাগ সোরা মিশ্রিত করিয়া সার প্রস্তুত করিতে হয়, তদ্দ্বারায় নারিকেল গাছের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে, কেহ তামাক ক্ষেত্রেও ব্যবহার ব্যবস্থা দেন, আমরা তাহার গুণকারিতা সম্বন্ধে বিশেষ পরিচয় পাই নাই।

চূণ—ইহার গুণ অতি দূরবর্ত্তী। ইহার প্রাথমিক ফলের দৃশ্য উত্তম না। চূণের প্রধান গুণ মৃত্তিকার জটিলতা নষ্ট করিয়া অধিকতর সচ্ছিদ্র করে এবং মৃত্তিকাকে অধিকতর রস আকর্ষণী শক্তিশালিনী করে। দ্বিতীয়তঃ ক্ষেত্রস্থিত অকর্ম্মণ্য উদ্ভিদ জাত মূলাদি সত্বর সত্বর পঁচাইয়া তদাভিজাত সার দ্বারা ক্ষেত্রের উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে। এতদ্ভিন্ন চূণের দ্বারা উদ্ভিদাদির আর বিশেষ উপকার কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না; কারণ চূণে কোন দাহ্য পদার্থ নাই, সকল পদার্থেরই অদাহ্য অংশ; সকল পদার্থের ভস্মেই অত্যধিক পরিমাণ চূণের ভাগ থাকে। প্রভাবিত চূণ ও এক প্রকার ভস্মবিশেষ। যে পদার্থ হইতে চূন প্রস্তুত হয় তাহাতেও দাহ্য পদার্থ নাই এক মণ চুণা পাথর দগ্ধ করিলেও তাহাতে চুণা এক মণই হয়। চুণাতে উদ্ভিদের উপকারক সাধারণতঃ কতক পরিমাণ পটাস, এমনিয়া ইত্যাদি আছে।

চুণা সার রূপে ব্যবহার করিতে হইলে ক্ষেত্র বীজ বপনের অন্যূন তিন চারি মাস পূর্ব্বে দিতে হয়। এইরূপ বহু পূর্ব্বাহ্নে না দিলে উপকারিতা লাভ করা যায় না; প্রত্যুত অনিষ্ট করে। চুণার তেজে ক্ষেত্রস্থ কৃষি এক প্রকার দগ্ধ হইয়া যায়।

যে ক্ষেত্রের মৃত্তিকায় চিকনের ভাগ অধিক কিম্বা যে ক্ষেত্র বহু দিন পতিতাবস্থায় ছিল এই দ্বিবিধ ক্ষেত্রে চুণার সার ব্যবহার করা নিতান্তই আবশ্যক।

সোরা—এই সার আমাদের দেশে সচরাচর ব্যবহার করিতে দেখা যায় না। শোরা উদ্ভিদ পুষ্টিকর পদার্থ সোরাতে দাহ্য পদার্থের (অম্লজানের ভাগ অধিক এবং পটাসও আছে; ও উভয় পদার্থই উদ্ভিদের উপকারক মৃত্তিকাকে শিথিল করা এবং সচ্ছিদ্র করার শক্তি সোরাতেও আছে।

উহাও অপেক্ষাকৃত পূর্ব্বে ক্ষেত্রে দেওয়া উচিত। ইহা অন্যান্য সারের তুলনায় কিছু মূল্যবান্, বিশেষতঃ রাজকীয় নিষেধের দ্বারা কেহ ইহা এককালে অধিক পরিমাণে ক্রয় বা প্রস্তুত করিতে পারে না।

আমরাও কখন বিশুদ্ধ সোরা কৃষি ক্ষেত্রের সার রূপে ব্যবহার করি নাই। কিন্তু বিশুদ্ধ সোরা ব্যবহার না করিয়াও সোরার কতক ফল লাভ করা যাইতে পারে। গরু কি ঘোড়ার মূত্র সর্ব্বদা এমন কোন স্থানে ফেলিয়া রাখিতে হয় যে, যাহাতে বৃষ্টির জল কি অন্য কোন রূপ জল না লাগে। শেষ কতক দিন পরে সেই স্থানের মৃত্তিকাতেই সোরার উপকার পাওয়া যায়, কিংবা ইচ্ছা করিলে তাহা হইতে সোরা প্রস্তুত করিয়া লওয়াও অতি সহজ।

যে সকল কৃষির মূলই ব্যবহার্য্য; যথা আলু মূলা, কচু ইত্যাদি, সেই সকল কৃষিক্ষেত্রের পক্ষে চুণ সোরা উভয়ই উপকারী। কারণ এই উভয়বিধ বস্তুরই মৃত্তিকাকে সচ্ছিদ্র করিবার শক্তি আছে। মৃত্তিকা সচ্ছিদ্র না হইলে মূলজ কৃষি বড় হইতে পারে না।

ধাতবসার—ভূমধ্যস্থ খনিজ পদার্থ; যথা—সোণা, রূপা, তামা, লোহা ইত্যাদি। (ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এ সকলকে ভৌতিক পদার্থ স্থির করিয়াছেন। আমরা আমাদের দেশীয় প্রচলিত প্রথানুসারে ইহা দিগকে ধাতু বলিলাম)। এই সকল ধাতব পদার্থ প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত এবং গলিত হইয়া মৃত্তিকা এবং জলে মিশ্রিত হইয়া সার রূপে উদ্ভিদগণের উপকার সাধন করে। এই সার সচরাচর ব্যবহার করিতে দেখা যায় না। কিন্তু পূর্ব্বকালে এক সময়ে যে এই সার এদেশে ব্যবহৃত ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা দেখিয়াছি কোন কোন স্থানে অদ্যাপি নারিকেল বৃক্ষ রোপণ সময়ে স্বর্ণ রৌপ্য (কণিকা মাত্র) গর্ত্তের মধ্যে দিয়া তদুপরি বৃক্ষ রোপণ করে। যাহারা এই রূপ ব্যবহার করেন তাঁহারা জানেন না, যে ইহা সাররূপে ব্যবহৃত হয়। তাঁহারা বলেন এইরূপ প্রাচীন প্রথা আছে। কিন্তু উহা যে সামান্য পরিমাণে দেওয়া হয়, তাহাকে কেবল রীতি রক্ষা মাত্রই হইয়া থাকে। সময় সময় কোন কোন উদ্ভিদের যে অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখা যায় যথা একটা কুমড়ার গাছ ১॥ হস্ত পরিসর

একটা বেগুণ গাছ ১২ হাত লম্বা। একটা কলা গাছ ১০ হাত পরিসর,কোন একটা খেজুর গাছের ৮টা মাথা,কোন একটা কলাগাছে ৫টা মোচা (কোন দেশে থোড় বলে) হইয়াছে ইত্যাদি। এই সকল ঘটনা স্থলেও এইরূপ প্রবাদ যে কোন প্রকার ধাতব পদার্থাদি ঐ সকল বৃক্ষমূলে থাকায় এইরূপ ঘটে। এই প্রবাদের সত্যতা সম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহ আছে, অদ্যাপি আমরা ইহার কোন প্রমাণ পাই নাই। রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা কারণ নির্ণিত হইয়াছে কিনা তাহাও আমরা জানি না। তবে এ সম্বন্ধে আমাদের যে অনুমান আছে, উদ্ভিদ প্রকৃতি স্থলে তাহা আলোচনা করিব। যাহা হউক এই ধাতব পদার্থ যে উদ্ভিদগণের অত্যন্ত উপকারক এ কথা আমরা স্বীকার করি। তবে সর্ব্ব প্রকার উদ্ভিদের পক্ষেই উপকারক কি না সেটা সন্দেহের বিষয়। আমরা এই সকল পদার্থ কখনই ব্যবহার করিয়া দেখি নাই। উপন্যাসের ন্যায় শুনিয়াছি; এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিও আছে। বোধ হয় কৃষক মাত্রের পক্ষেই ধাতু সার ব্যবহার করিয়া কৃষিক্ষেত্র করা সম্ভাবনা নহে; তবে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে মাত্র।

তৃতীয়তঃ প্রাণিসার, ইহা প্রথমতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা—অস্থি, মাংস (রক্ত, চর্ম্ম, নাড়ী ইহার অন্তর্গত) ও মল, মূত্র ইত্যাদি। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখা যায়।

অস্থিতে এমন কোন পদার্থ নাই যে তাহাতে উদ্ভিদের উপকার হইতে পারে, বস্তুতও তাহা ভ্রম মাত্র। অস্থি চূর্ণ করিয়া সাররূপে ক্ষেত্রে ব্যবহার করিতে হয়। অস্থি চূর্ণে দুইটী প্রধান শক্তি দৃষ্ট হয়। মৃত্তিকাতে উদ্ভিদদিগের অনিষ্টকর যে সকল পদার্থ থাকে, তাহা ধ্বংস এবং শিথিল করিয়া দেয় এবং দ্বিতীয় রস আকর্ষণ শক্তি অধিক থাকায় ভূ-মধ্যস্থ রস আকর্ষণ করিয়া তাহা উদ্ভিদের মূলে যোগায়।* অস্থিচূর্ণের শক্তি সম্বন্ধে একটা বিশেষ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। দোবারা-চিনি অনেকেই দেখিয়াছেন; সাধারণতঃ প্রস্তুত চিনির উপরে অস্থিচূর্ণ এবং তাহার পোট

* প্রকৃত মূল বিশিষ্ট কাহাকে বলে, তাহা উদ্ভিদ প্রকৃতি স্থলে লিখা হইল।

দেওয়াতেই রসাদি আকর্ষণ করিয়া বিশুদ্ধ এবং পরিষ্কার করে, অস্থিচূর্ণ সার প্রকৃত মূল বিশিষ্ট উদ্ভিদেরই সমধিক উপকার করিতে দেখা যায়। উহা চা-ক্ষেত্রের পক্ষে অত্যন্ত উপকারক। কৃষি ক্ষেত্রের মৃত্তিকা যদি চিকণ (আঠাল) হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে ব্যবহার করিলে অন্যবিধ কৃষিরও উপকার হইতে পরে। কিন্তু চা-ক্ষেত্রের জন্য অস্থি চূর্ণ সারের ন্যায় কোন সারেই উপকার করে না।

রক্ত এবং মাংসাদি। কি জলচর, স্থলচর, কি উভচর, খেচর, অর্থাৎ পশু, পক্ষী, মনুষ্য, জলচর ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার প্রাণীর রক্ত মাংস গলিত হইয়া মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইলে সারের উপযোগী হইয়া উদ্ভিদগণের উপকারক হয়। অধিকন্তু উহা আঙ্গুর গাছের জন্য অত্যন্তই আবশ্যক। আঙ্গুর গাছ পোকা ধরা হইতে রক্ষা করাই অতিশয় কষ্টকর; উহার মূলে অধিক পরিমাণে সার দিলে পোকার আধিক্য হইয়া থাকে। বোধ হয় অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন কোন এক স্থানে গবর জড় করিয়া রাখিলে তন্মধ্যে একরূপ পোকা জন্মে। সাধারণতই গবরের সারে পোকা জন্মায়। তবে কৃষি বিশেষে অনিষ্ট কম হয়; পোকাও কম জন্মে। পুঁঠি মৎস্য পচাইয়া দিলে উপকার করে এবং পোকা ধরা নিবারিত হইয়া যায়।

আমরা একটা প্রবাদ বাক্যানুসারে পরীক্ষা দ্বারা ফল লাভ করিয়াছি। শুনিলাম কাঁঠাল গাছে ফল ধরিলে বৃক্ষ মূলের মৃত্তিকা খনন পূর্ব্বক সেই স্থানে একটী মৃত শৃগাল পুতিয়া পুনবায মাটি দিয়া পূর্ণ করিয়া দিলে গাছে কাঁঠাল হইবে, আমরা তদনুসারে সফলকাম হইয়াছি। আমরা ইহার কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রয়োগ করিতে অক্ষম। ইহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি নাই যে শৃগাল ভিন্ন অন্যবিধ প্রাণীর মৃতদেহ দিলেঐরূপ ফল পাওয়া যায় কি না। কিংবা অন্য কোন অফলিত বৃক্ষ মূলে শৃগালের মৃতদেহ দিলে তাহাতেও ফল ফলে কি না।

মল মূত্র।—মনুষ্য এবং প্রায় সকল পশু. পক্ষীর মলই সাররূপে ব্যবহারের উপযোগী। মনুষ্যের মল মূত্রই সর্ব্বাপেক্ষা সারবান্। ইউরোপীয় কৃষিব্যবসায়িগণ "গুয়েন" নামক পক্ষীর মলমূত্রকে সর্ব্বাপেক্ষা ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রশংসা করিয়াছেন এবং রাসায়নিকগণ পরীক্ষা দ্বারা উক্ত সারের বহুবিধ

গুণও নির্ব্বাচন করিয়াছেন। আমরা এস্থলে তাহার বিশেষ বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিলাম, কারণ তাহা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্মূল্য। সুতরাং আমাদের দেশীয় কৃষকের পক্ষে উহা ব্যবহার করা সম্ভবপর নহে। মনুষ্যের মলমূত্র তদপেক্ষা কোন অংশেও ন্যূন নহে; সর্ব্ববিধ প্রাণি অপেক্ষা মনুষ্য নানাবিধ উপাদেয় এবং সারবান্‌বস্তু ভোজন করাতেই তাহার মলমূত্র অধিকতর সারপ্রদ হইয়া থাকে। যে পদার্থে যবক্ষারজানের ভাগ অধিক আছে সেই পদার্থ উদ্ভিদগণের অধিক উপকারী। কিন্তু বায়ুর সহিত যে যবক্ষারজান থাকে, তদপেক্ষা জলীয় পদার্থের সহিত যে যবক্ষার জান থাকে, তাহাতে অধিক উপকার করে। মল মূত্রে বাষ্পভাগ অপেক্ষা জলীয় ভাগ অধিক থাকে। রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, মনুষ্যের মল মূত্রে যবক্ষার জানের ভাগ অধিক। এই সার প্রায় সর্ব্বপ্রকার উদ্ভিদেরই উপকারক।

পশু পক্ষ্যাদির মলমূত্রেও ন্যূনাধিক রূপে সার পদার্থ আছে। পক্ষ্যাদির মধ্যে মাংস ভোজী পক্ষীর মল মূত্রে অধিক সার পাওয়া যায়। পশুর মধ্যে সর্ব্ব প্রকার বন্য পশুর মল মূত্রের গুণের বিশেষ পরিচয় বলিতে পারি না। পালিত পশুর মধ্যে গোরু, ঘোড়া, শূকর, মেষ ইহাদের মল মূত্রেই অধিকতর সারবান্‌ পদার্থ আছে এবং উহা প্রায় সর্ব্ব প্রকার উদ্ভিদেরই উপকারক। রাসায়নিক পণ্ডিতগণ পরীক্ষা দ্বারা এই চতুর্ব্বিধ পশুর মলে যে যে পদার্থ থাকা স্থির করিয়াছেন নিম্নে তাহার তালিকা প্রকাশ করা গেল। (A) চিহ্নিত তালিকা—সাধারণতঃ গরু এবং ঘোড়ার মলমূত্রই আমরা সাররূপে অধিক ব্যবহার করিয়াছি; অশ্বের মলমূত্রে প্রকৃত মূল বিশিষ্ট উদ্ভিদ অপেক্ষা অপ্রকৃত মূলবিশিষ্ট উদ্ভিদের অধিক উপকার করিয়া থাকে। গরুর মলমূত্রের মধ্যেও তারতম্য দেখা গিয়াছে। যে গরুতে সর্ব্বদা খৈল খাইয়া থাকে, তাহাদের মলমূত্রে অপেক্ষাকৃত অধিক উপকার করে। যে সকল গরু সর্ব্বদা মাঠে চরিয়া ঘাস খায় এবং যে সকল পশুকে জলের উপরিভাগের ঘাস কাটিয়া খাওয়ান যায়, এই উভয়ের মধ্যেও মাঠে চরিয়া খাওয়া গরুর মলমূত্রে অপেক্ষাকৃত অধিক উপকার করিয়া থাকে। আমরা ইহার রাসায়নিক গুণাগুণের বিশেষ লক্ষণ বলিতে পারিনা।

বোধ হয় এপর্য্যন্ত কোন রাসায়নিক পণ্ডিত বিশেষ সতর্কতার সহিত এই ত্রিবিধ মলমূত্রের ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষা না করিয়া থাকিবেন। আমাদের বোধ হয় ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরীক্ষা করিলে অবশ্য তারতম্য হইবে। আমরা এসম্বন্ধে একটা সাধারণ যুক্তি দেখাইতে পারি। উপরি-উক্ত ত্রিবিধ গরুর দুগ্ধেও স্বাদের ন্যুনাতিরেক আছে। যে সকল গরু অনবরত জলজ ঘাস খায়, তাহাদিগের দুগ্ধে যত নবনীত উঠিবে কি ক্ষীর হইবে, যে গরুতে অনবরত খৈল খায় তাহার দুগ্ধে তদপেক্ষা অধিক নবনীতও অধিক ক্ষীর হইয়া থাকে। যদিচ এই যুক্তির অনুসরণ করিলে সর্ব্বত্র সমান ফল দেখা যায় না, তথাচ ইহার দ্বারা একটা একটা অনুমান করিয়া লওয়া অসঙ্গত হয় না।

গরুর মলমূত্রে প্রায় সর্ব্ববিধ উদ্ভিদেরই উপকার হইয়া থাকে। কিন্তু উহাতে কাঁঠাল গাছের বিশেষ উপকার করেনা; কাঁচা গবর প্রায় সর্ব্বপ্রকার উদ্ভিদেরই অনিষ্টকারক, কিন্তু সুপারি গাছের পক্ষে নয়। বরং সুপারি গাছে পুরাতন গবর অপেক্ষা কাঁচা গবরেই অধিক উপকার করিতে দেখা গিয়াছে। ছাগলের মল সার রূপে ব্যবহার হয় বলিয়া অদ্যাপি কোন কৃষিব্যবসায়ীর নিকট শুনা যায় নাই, কি কোন কৃষিগ্রন্থেও দেখা যায় না কিন্তু আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি ছাগলের মলে লাউগাছের বিশেষ উপকার করে। সাধারণতঃ দেখা গিয়াছে হস্তীর এবং মহিষের মলমূত্রে উদ্ভিদের কোন উপকার করেনা, কিন্তু যখন দেখাগেল যে ছাগলের মলে লাউগাছের উপকার হয় তখন উক্ত দ্বিবিধ পশুর মলেও যে একবারে কোন প্রকার উদ্ভিদের উপকার হইতে পারে না, একথা আমরা অদ্যাপি সিদ্ধান্ত করিতে পারি নাই।

উদ্ভিদ সার,,—সর্ব্ব প্রকার উদ্ভিদ হইতেই সার প্রস্তুত হয় না* এবং প্রস্তুত করাও কঠিন, কারণ অনেক বৃহৎ জাতীয় বৃক্ষাদি অতি দীর্ঘকালেও ফলবান হয় না। তবে প্রকৃতির নিকট সকলই পরাস্ত, সকলই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া মৃত্তিকায় মিশ্রিত হয়, কাজেই সেসমস্ত প্রাকৃতিকঘটনায় যাহা ঘটে

* বরিক বাঁশ এবং বাঁশের পাতাতে সার হয় না, প্রত্যুত অনিষ্ট করিয়া থাকে। এসম্বন্ধে একটা প্রবাদ আছে। যথা—বাঁশ বামন বাসক, তিন গৃহস্থের নাশক।

ভিন্ন কৃষকের পক্ষে তৎসমুদয় প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করা সম্ভবপর নয়। আমরা এই উদ্ভিদ সারকে আরও তিন ভাগে বিভক্ত করিলাম।

লতা, গুল্ম, ওষধি এবং বৃক্ষের পল্লবাদির গলিতাংশ।

উদ্ভিদাদি দগ্ধ করিলে তাহার যে অদাহ্য পদার্থ থাকে তাহা অর্থাৎ দগ্ধাবশিষ্ট ছাই।

উদ্ভিদজাত ফল পুষ্প এবং তদুৎপন্ন পদার্থাদি।

উদ্ভিদ পদার্থ হইতে যে তিন জাতীয় সার উৎপন্ন হওয়ার বিষয় আমরা উল্লেখ করিলাম, এই ত্রিবিধ সারই সমানরূপে সর্ব্বজাতীয় উদ্ভিদের উপকারী হয়না।

লতা গুল্মাদির গলিতাংশ অধিকাংশ স্থলে প্রকৃত. মূলবিশিষ্ট উদ্ভিদাদির পক্ষেই অধিক উপকার করে। সর্ব্ব প্রকার লতা গুল্মাদির গলিত সারই কাঁঠাল গাছের পক্ষে অত্যন্ত উপকারক। নীলের পাতা গলিত হইয়া যে সার হয় তাহা তামাক ক্ষেত্রের পক্ষে অত্যন্ত উপকারক। পচা পাতার সার মরসমী ফুল ইত্যাদির পক্ষে বিশেষ উপকারক। সূর্য্যমুখী ফুলের গাছের শাখা পল্লবাদিতে সিংকোনা এবং চা ক্ষেত্রের উত্তম সার হয়।

উদ্ভিদ দিগের দগ্ধাবশিষ্ট ভস্ম সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহা ন্যূনাতিরেক রূপে প্রায় অধিকাংশ উদ্ভিদগণেরই উপকার করিয়া থাকে। তন্মধ্যে ইহা মানকচু,তামাকও ধান্য এইসকল ক্ষেত্রেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার করিয়া থাকে। ভস্মের আর একটী গুণ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সকল ক্ষেত্রে ভস্মের সার অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা যায়, তাহাতে পোকা ধরেনা। কৃষিক্ষেত্রে পোকা ধরিলে তন্নিবারণার্থও ভস্ম ব্যবহার করিলে দেখা যায়, লতা, গুল্ম ইত্যাদি ক্ষুদ্র জাতীয় কৃষি ক্ষেত্রে পোকা ধরিলে তাহার শাখা পল্লবে এবং মূলে ভস্ম ছড়াইয়া দিলে অধিকাংশ স্থলে পোকা ছাড়িয়া যাইতে দেখা গিয়াছে।

সর্ব্ব প্রকার উদ্ভিদের ভস্মই সকল কৃষির পক্ষে সম্যক উপকারী। উদ্ভিদের জাতিবিশেষে তাহার ভস্মে পদার্থাদির ন্যূনাতিরেক আছে। রাসায়নিক পণ্ডিত গণ পরীক্ষায় দ্বারা যাহা নির্ণয় করিয়াছেন নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়াগেল। (B) চিহ্নিত তালিকা।

"উদ্ভিদজাত ফল পুষ্প এবং তদুৎপন্ন পদার্থাদি।" নানা জাতীয় ফল পুষ্পাদি পচাইয়া সার প্রস্তুত করিলে সেই সার প্রায় সর্ব্ব প্রকার উদ্ভিদাদিরই উপকার করিয়া থাকে। যে সকল শস্যে তৈলাক্ত পদার্থ অধিক, তাহা পচাইলেই অধিক উপকার হয়, তণ্ডুল পচাইয়াও সার রূপে ব্যবহার করিয়া দেখা গিয়াছে তাহাতেও বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। পদার্থ বিশেষকে নিষ্পেষন দ্বারা তৈল নির্গত করিয়া লইলে অবশিষ্ট যে ভাগ থাকে তাহারই নাম খৈল। ইহাকেও আমরা উদ্ভিদজাত পদার্থের তৃতীয় প্রকরণের অন্তর্গত ধরিয়া লইলাম। খৈল, ইহা সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব প্রকার কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহার্য্য এবং সকলেই ইহার নির্দ্দোষিতা এবং বহুবিধ গুণকারিতা স্বীকার করিয়াছেন। আমরা তুলনায় দেখিতে পাই মনুষ্য শরীরে যে যে পদার্থ আছে, দুগ্ধেও সে সমুদয় পদার্থ আছে। মনুষ্যাদির জন্য যেমন দুগ্ধ অত্যন্ত উপাদেয়, এবং এক মাত্র দুগ্ধ পান দ্বারাই শারীরিক পুষ্টি রক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারা যায়, উদ্ভিদাদির পক্ষেও খৈল তদ্রূপ সর্ব্বতোভাবে উপযোগী। খৈলে অম্লজান, যবক্ষরজান, উদকজান ও অঙ্গারাম্ল বিদ্যমান আছে। অধিক খৈল দগ্ধ করিলে এইসকল পদার্থ বাষ্পাকারে উড়িয়া যায় এবং দগ্ধাবশিষ্ট যে ভস্ম থাকে তাহাতে পটাস, ম্যাগনেসিয়া ফসফরিক অম্ল থাকে। তৎসমুদায়ই উদ্ভিদের অত্যন্ত পরিপোষক। যে পদার্থ দগ্ধ করিলে তাহার অধিকাংশ ভাগ কমিয়া যায় তাহা উদ্ভিদপোষক তত পরিমাণ সারবান মনে করিতে হইবে। সার পরীক্ষার ইহা প্রায় সাধারণ নিয়ম। রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে ১/ মণ খৈল দগ্ধ করিলে /২॥৵/১৭॥ কাঁচ্চা পরিমাণ ভস্ম পাওয়া যায়। ঐ পরিমিত ভস্মে ৶/১৩৴ কাঁচ্চা ম্যাগনেসিয়া /১ সের ফসফরিক অম্লও ॥৵৫ পটাস থাকে।

যে কয়েকপ্রকার খৈলের উল্লেখ করা যাইতেছে সেই সর্ব্বপ্রকার খৈলেই যে এই সকল পদার্থ সমান রূপে আছে এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না এবং সর্ব্ববিধ খৈলেরই যে রাসায়নিক ফল এই রূপ তাহাও নয়, সর্ব্ব প্রকার খৈলের রাসায়নিক পরীক্ষা করা হইয়াছে বলিয়াও আমাদের বোধ হয় না। রেড়ি, পোস্ত ও কার্পাস বীজের খৈল সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

তিসি অপেক্ষা সর্ষপ কিছু উত্তম হইলেও উভয়কেই আমরা দ্বিতীয় স্থানীয় বলিয়া স্থির করিলাম। তিল এবং কুসুম ফুলের বীজে উদ্ভিদের বিশেষ উপকার করে না; আমরা ইহাকে তৃতীয় স্থানীয় মনে করি। রয়নার খৈল উদ্ভিদের বিশেষ উপকারক নয়, তবে স্থলবিশেষে ঔষধ স্বরূপ প্রয়োগের বিধি আছে। তদ্ভিন্ন অপর বিষ খৈলে কৃষিক্ষেত্রের উপকার করে না এবং ইহার ব্যবহারও দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই কয়েক প্রকার পদার্থ হইতে তৈল নির্গত করিতে আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই তিল, সর্ষপ, তিসি, পোস্ত বেড়ি, কার্পাস বীজ, মূলার বীজ কুসুম ফুলের বীজ লোহা গড়ার বীজ রয়না (কোন দেশে পিতুরাজ বলে) নারিকেল।

আমাদের দেশের অবস্থা এবং কৃষকের অবস্থানুসারে আমরা খৈলকেই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম এবং অধিক ব্যবহার উপযোগী সার মনে করি। ইহা অত্যন্ত দুর্ঘট অথবা দুর্ম্মূল্য পদার্থ নহে।

সার রক্ষা স্থলে যে প্রকরণ উল্লেখ করা হইয়াছে খৈলের সার সম্বন্ধে সেরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয় না। তবে একটু সাবধান করিয়া রাখিতে হয় যে সাধারণতঃ তাপ, বায়ু কি জলের ছিটা আদি না লাগে। তাপ বায়ু ইত্যাদি লাগিলে গুণের অনেক হানি করে। ভেড়ির খৈল অপেক্ষাও সরিষার খৈলের অধিক অনিষ্ট করে। ভিন্ন ভিন্ন কৃষির জন্য ইহার প্রয়োগ প্রণালী ভিন্ন রূপ, স্থান বিশেষে ইহার ব্যবহার পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন স্থলে এবং কাহার কাহার মতে অনধিক ৪ মাস অন্যূন ২ মাস পূর্ব্বে ক্ষেত্রে খৈল দিয়া পরে উহাতে মধ্যে মধ্যে চাস দেওয়া কর্ত্তব্য, এই প্রকারে খৈল দেওয়াতে খৈল অধিকতর পচিয়া মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইয়া শস্য ক্ষেত্রের অধিক উপকার করে।

কোন কোন স্থলের কৃষকেরা ক্ষেত্রে জল দিবার জন্য ক্ষেত্রের পার্শ্বে যে সকল নালা থাকে সেই নালার জলে খৈল ফেলিয়া রাখিয়া খৈল উত্তম রূপ পচিলে খৈলের সহিত সেই জল সেচিয়া ক্ষেত্রে দেয়, তাহারা ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া বীজ বুনিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে দিয়া থাকে।

কোন কোন স্থানের কৃষকেরা ক্ষেত্রে চারা লাগান শেষ হইলে ১০।১৫

দিন পরে (ক্ষেত্রে চারা লাগিলে পর) অতি অল্প পরিমাণ শুষ্ক খৈলের চূর্ণ গাছের মূলে দিয়া উপরে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা চূর্ণ দিয়া ঢাকিয়া দেয়। এইরূপে তিন কি চারি বার দিয়া থাকে, প্রথম ও দ্বিতীয় বারে কিছু অধিক দেয় এই রূপ ক্রমেই কিছু কিছু অধিক পরিমাণে দিয়া থাকে।

শেষোক্ত মতে কেবল শ্রীহট্ট প্রভৃতি কতিপয় স্থানের লোকদিগকে প্রধানতঃ ইক্ষু ক্ষেত্রে খৈল ব্যবহার করিতে দেখা যায়। ইহাতে যে কৃষি ক্ষেত্রের উপকার না হয় তাহাও নয়।

আমরা পূর্ব্বে সার ব্যবহারের প্রণালী প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি, আমরা খৈলকে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ প্রণালী ভিন্ন অন্যবিধ প্রকারে ব্যবহার দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছি। খৈল চূর্ণ করিয়া কোন একটা হাঁড়িতে (কি পরিমাণানুসারে পাত্রে) রাখিয়া তাহার মধ্যে গোমূত্র (চোনা) দিয়া পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখিতে হয় দুই তিন দিন পরে পুনরায় চোনা দিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ঢাকিয়া রাখিতে হয়; যখন দেখা যায় যে, সেই পাত্রস্থিত খৈল হইতে বুদ্‌বুদ উত্থিত হইতেছে, তখন তাহা সম্পূর্ণরূপ ব্যবহারের উপযোগী হইয়াছে। ক্ষেত্র উত্তমরূপ কর্ষিত হইলে বীজ বপনের ন্যূনাধিক এক সপ্তাহ পূর্ব্বে উক্তবিধ প্রস্তুত খৈলের অর্দ্ধেক পরিমাণ অর্থাৎ যত খৈল ক্ষেত্রে দিবার মনস্থ করা হইয়াছে, তাহার অর্দ্ধেক একটু তরল করিয়া ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিয়া দুই তিন বার মৈ দিতে হয়, তাহাতে খৈল অধিক নিম্নে যায় না, অথচ মৃত্তিকার সহিত মিশিয়া যায়, তৎপরে ক্ষেত্রে চারা রোপণ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধ অংশ খৈলের ষষ্ঠভাগের এক ভাগ প্রথমবার ক্ষেত্রস্থ বৃক্ষমূলে দিয়া দ্বিতীয়বার দুইভাগ মৃত্তিকার দ্বারা ঢাকিয়া দিতে হয়; তৃতীয়বারে উক্ত প্রকারে চারি ভাগ দিতে হয়।

এখন এই চতুর্ব্বিধ খৈল প্রয়োগের উপকারিতা এবং সুবিধা অসুবিধার বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক হইতেছে। চতুর্থ প্রকরণানুযায়ী খৈল ব্যবহারের পদ্ধতি আমরা অন্য কোন দেশের কৃষককে করিতে শুনি নাই। অধুনাতন ইউরোপীয় প্রসিদ্ধ কৃষকগণও এরূপ প্রণালীতে খৈল প্রয়োগের ব্যবস্থা করেন নাই। ইংরাজি মতের অনুকরণ কি অনুসরণের ব্যতিক্রমে কোন কথা বলিলেই তাহা প্রায় উপহাসের হইয়া পড়ে। যাহা হউক

আমাদের সাধারণ যুক্তিতে এবং কার্য্যতঃ যখন কতকটা গুণের আধিক্য দেখিয়াছি, তখন উপহাসের ভয় পরিত্যাগ করিয়াও বলিতে বাধ্য হইলাম পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ প্রকরণে খৈল ব্যবহারে যে, খৈলের সম্পূর্ণ গুণের ফল পাওয়া যায় না, এ কথা বলিতে আমাদের সন্দেহ হইতেছে না। দুই তিন মাস পূর্ব্বে ক্ষেত্রে খৈল দিয়া রাখিলে বায়ু ও তাপ দ্বারা উহার গুণের কতক হানি করে, বৃষ্টির জলের সহিত সারের কতকাংশ বাহিত হইয়া যায়, এতদ্ভিন্ন অন্যবিধ উদ্ভিদ অর্থাৎ ঘাস জঙ্গল ইত্যাদি জন্মিয়া, কতকপরিমাণ নষ্ট করে। দ্বিতীয় প্রকরণানুসারে আরও অধিক হানি করে। অনাবৃত অবস্থায় জলপ্রণালীর মধ্যে খৈল ফেলিয়া রাখিলে তাহাতে খৈলের গুণ অতি অল্পই থাকিতে পারে। খৈলে যবক্ষারজান, অম্লজান, প্রভৃতি উদ্ভিদপোষণোপযোগী যে পদার্থ আছে, তাহা এরূপ অবস্থায় থাকে না। তাপ ও বায়ুতে মিলিত হইয়া যায়। উদজান এবং পটাস ইত্যাদি কতিপয় পদার্থ মাত্র থাকে,তাহার কতকাংশ রক্ষিত স্থানের (নালার) চতুঃ-পার্শ্বস্থ এবং নিম্নস্থ মৃত্তিকায় আকর্ষণ করে, কতক বা জলের গতির সহিত চতুর্দ্দিকে চলিয়া যায়। ক্ষেত্রের সার অধিক মৃত্তিকার নিম্নে গেলে যে উদ্ভিদদিগের সমধিক উপকার করে না, একথা সর্ব্ববাদিসম্মত, কারণ উদ্ভিদ মূল হইতে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিকড় নির্গত হয়,তাহারাই কৈশিক আকর্ষণে রসাদি আকর্ষণ করে, কোমল অগ্রভাগ ভিন্ন রসাকর্ষণ করিতে পারে না, ইহার বিশেষ বিবরণ স্থানান্তরে প্রকাশ করা গেল। উক্তবিধ প্রণালীতে খৈল যে অধিকতর নিম্নে যাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কারণ ক্ষেত্র যতই অধিক গভীর খনন করা যাইবে ততই যে, অধিক নিম্নে যাইবে একথা যুক্তিবিরুদ্ধ বলা যায় না। আমাদের মতে সর্ব্ববিধ কৃষি ক্ষেত্রের পক্ষে ইহা একেবারে দোষ শূন্য নয় বটে, কিন্তু ইউরোপীয় কৃষক-দিগের মতে যে পরিমাণ সার দেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে, আমাদের মতে তাহা অপরিমিত বলিয়া বোধ হয়। বোধ হয়, পূর্ব্বোক্ত সকল কারণে অপব্যয়িত না হইলে তদ্রূপ অধিক সার ব্যবহারের আবশ্যক হয় না। তৃতীয় প্রণালীর খৈল ব্যবহার সর্ব্ববিধ কৃষির পক্ষে সুসঙ্গত ও সুবিধাজনক নয়, শুষ্ক খৈলের চূর্ণ ওরূপভাবে ব্যবহার করিলে তাহার সারাংশ অপ-

ব্যয়িত হয় না, কিন্তু ঐরূপ চূর্ণীকৃত খৈল দ্বারা অবৈজিক এবং অপ্রকৃত মূলবিশিষ্ট কোন কোন উদ্ভিদেরই উপকার করে, বৈজিক উদ্ভিদের উপকার হইবে না। কারণ,ঐরূপভাবে খৈল মৃত্তিকাভ্যন্তরে রাখিয়া তদুপরি বীজ বপন করিলে, খৈলের তেজের আধিক্য হেতুক তাহার অঙ্কুর উদ্‌গমই হইবে না, অথবা তদুপরি উক্তবিধ চারা রোপণ করিলেও তাহা ক্ষেত্রে নষ্ট হইয়া যাইবে; বিশেষতঃ যেসকল ক্ষেত্রে বীজ ছড়াইয়া ফেলিতে হয়, সেই সকল ক্ষেত্রে এবংবিধ প্রণালীতে সার দেওয়া নিতান্তই অসুবিধা এবং অসম্ভব। আমাদের প্রস্তাবিত চতুর্থ প্রণালীতেও উক্ত বধ কৃষিক্ষেত্রে খৈল দেওয়ার অসম্ভবতা এবং অসুবিধা ঘটে, আমরা তাহাকেও তদ্রূপ ক্ষেত্রে উক্তরূপে খৈল দিতে পরামর্শ দেই না, তদ্রূপ কৃষিক্ষেত্রের জন্য উক্তবিধরূপ প্রস্তুত খৈল ক্ষেত্রকর্ষণ হইলে পরে, কিছু তরল করিয়া ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিয়া ক্ষেত্রে দুই তিনবার মৈ দিলেই মৃত্তিকার সহিত উত্তমরূপ মিশিয়া যায়। এবং অনধিক এক সপ্তাহের মধ্যে ক্ষেত্রে বীজ বুনিলেই খৈলে উত্তমরূপ সারের কার্য্য করে। যেক্ষেত্রের মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত আঠাল, সেই ক্ষেত্রে প্রথম প্রকরণানুসারেই খৈল দেওয়াতে কতটা অধিক উপকার করে, খৈল মাটির সহিত উত্তমরূপ মিশিয়া তাহার জটিলতা নাশ করিয়া দেয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকরণানুযায়ী যে ক্ষেত্রে যত পরিমাণ খৈল দিলে উপকার হয়, আমাদের চতুর্থ প্রকরণানুযায়ী তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ খৈল ব্যবহার করিয়া তদ্রূপ উপকারলাভ করিয়াছি।

চতুর্থ মিশ্রসার।—ইহাকেও আমরা দুইভাগে বিভক্ত করিলাম, যথা—স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক। "স্বাভাবিক মিশ্রসার।" ইহার প্রকৃতিও প্রযোজিতা যত প্রকার সারের উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রাকৃতিক ঘটনার দ্বারা ন্যূনাতিরেকরূপে জলের সহিত মিশ্রিত হয়, কতক তাপ দ্বারা বাষ্পাকারে আকর্ষিত হইয়া বৃষ্টিরূপে মিশ্রিত হয়, আবার কতক বৃষ্টির জলে ধৌত করিয়া নিয়া জলের সহিত মিশ্রিত করে, নদনদ্যাদির বেগ দ্বারা তীরবর্ত্তী ভূমি সকল ভগ্ন হইয়া মিশ্রিত হয়, নানা প্রকার প্রাণী, ও উদ্ভিদাদি গলিত হইয়া মিশ্রিত হয় ইত্যাদি, অথচ প্রকৃতি ভিন্ন

ইহার আর কোন প্রয়োজিতা নাই, এইজন্য ইহাকে আমরা স্বাভাবিক মিশ্রসার আখ্যা প্রদান করিলাম। মনুষ্যাদির প্রযত্নে এই সমুদয় প্রকার পদার্থের একত্রে সংযোগ এবং একরূপ সূক্ষ্মাণুর দ্বারা মিশ্রিত করিয়া এই-রূপে পরিণত করা নিতান্ত দুরূহব্যাপার অথবা অসাধ্য বলিলেই হয়। এমন পদার্থ যাহারা বিনা যত্নে লাভ করিতেছে, তাহারা যে, অধিক ভাগ্যবান তাহাতে আর সন্দেহ কি। আমরা যাহাকে অস্বাভাবিক মিশ্র সার আখ্যা প্রদান করিলাম, আমাদের দেশে সাধারণতঃ প্রচলিত ভাষায় ইহাকে পলন অথবা পলি মাটি বলে। কোন কোন স্থলে আমরা ক্ষেত্র নির্ব্বাচন অধ্যায়ে ইহাকে সঙ্কর জাতীয় মৃত্তিকা বলিয়াছি। এই পলি বর্ষার জলে প্লাবিত হইয়া ক্ষেত্রে পড়ে। কোন কোন স্থান প্রায় সর্ব্বদাই জোয়ারের জলের দ্বারাও অধিকাংশ ক্ষেত্র প্লাবিত হইয়া পলি পড়িয়া থাকে। কোন কোন স্থান বর্ষার জলে প্লাবিত হয় না। মাত্র বৃষ্টির জলের সহিত ধৌত হইয়া কতক পরিমাণ পলি পড়ে। যদিচ বৃষ্টির দ্বারা পর্ব্বত অরণ্যাদি হইতে নানা প্রকার উদ্ভিদাদির গলিতাংশ ধৌত হইয়া আইসে, তথাচ পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার পলির তুলনায় ইহা সমান উপকারক নয়। যে সকল স্থানে ক্ষেত্রে পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকারের পলি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পড়ে, সেই স্থানের লোকেরা ক্ষেত্রে সার ব্যবহারের কথা শুনিলে উপহাস করে। নীল নদের তীরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ উর্ব্বরা ক্ষেত্রের গুণের বিষয় বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন।

পলি একটী উত্তম সার। এই সারে সর্ব্ব প্রকার উদ্ভিদের উপকার হইয়া থাকে। বিশেষতঃ অপ্রকৃত মূলবিশিষ্ট উদ্ভিদের পক্ষেই অধিক উপকারী হইবে। আমরা ক্ষেত্র নির্ব্বাচন স্থলে ইহার গুণাগুণ কতক আলোচনা করিয়াছি, এস্থলে আর চর্ব্বিত চর্ব্বণ অনাবশ্যক।

আমাদের মতে বোদ,ফাপা ও দলদলিয়া মাটীও এই জাতির অন্তর্গত। ইহাদের দোষ গুণের তারতম্য আছে,ইহারা ওষধি ক্ষেত্রের এবং গুল্মাদির পক্ষেই অধিক উপকারক, প্রকৃত মূল বিশিষ্ট বৃক্ষাদির পক্ষে তত উপকারক নয়। বস্তুতঃ স্বাভাবিক মিশ্র সার একটী উত্তম সারের মধ্যে পরিগণিত।

অস্বাভাবিক মিশ্র সারের যে উল্লেখ করা হইয়াছে সে আর কোন

ভিন্নরূপ পদার্থ নয়। পূর্ব্বোক্ত কতক গুলি সারের একত্র মিশ্রণ ব্যবহার। যথা—মনুষ্য, গো অশ্বাদির মল মূত্র, খৈল উদ্ভিদাদির গলিতাংশ একত্র করিয়া সার প্রস্তুত করে। অস্বাভাবিক মিশ্র সার সর্ব্ব প্রকার উদ্ভিদেরই সমান উপকারক। ইহাতে কোন প্রকার উদ্ভিদেরই পোষণ উপযোগী পদার্থের অভাব হয় না। যাঁহারা নানা রূপ কৃষি ক্ষেত্র করিয়া থাকেন তাঁহাদের পক্ষে এবংবিধ সার কতক পরিমাণ প্রস্তুত রাখা নিতান্তই আবশ্যক। তাহা হইলে যখন যে কোন কৃষি ক্ষেত্রেই তাহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। আমরা এই স্থলেই সারের বিষয় সমাপ্ত করিয়া এখন অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিতে প্রস্তুত হইলাম।

উদ্ভিদ প্রকৃতি।

প্রথমতঃ উদ্ভিদ কি? এই প্রশ্নের মীমংসা করিতে গেলে এক বৃহৎ গোলোযোগ উপস্থিত হয়। বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, "যাহা মৃত্তিকাভেদ করিয়া উর্দ্ধে উত্থিত হয়" তাহাকেই উদ্ভিত বলা যায়। এই সিদ্ধান্ত সকল স্থানে রক্ষা পায় না। ঘরের চালের উপর, কি দালানের কার্ণিসের উপর হইতে সময় সময় যাহারা জন্মে তাহাদের অগ্রভাগ নিম্নাভিমুখে থাকে তাহাদিগকে কি বলা যাইবে? এস্থলেও বরং উর্দ্ধের অর্থ শূন্য মনে করা যায় তবে যে দিক্ ইচ্ছা সে দিক্ গেলেও সিদ্ধান্ত রক্ষা করা যাইতে পারে। এক বৃক্ষের শাখা ভেদ করিয়া যে অন্য বৃক্ষ উত্থিত হয় তাহাকে কি বলিব? একেবারে যাহারা কোন বস্তু ভেদ করে না যথা পানা, পানিফল (কোন দেশে খিখুব অথবা শিঙ্গাড়া বলে) এক জাতীয় শৈবাল অথবা শেলা এভিন্ন আরও এক জাতীয় লতিকা যথা শূন্যলতা (যাহার পরিচয় পূর্ব্বে স্থানান্তরে দেওয়া হইয়াছে)ইহাকে কি বলা যাইবে? এক জাতীয় প্রস্তর মৃত্তিকা হইতেই উত্থিত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে তাহাকে কি বলিব? উদ্ভিদ সম্বন্ধে যাহারা বিচার করিয়াছেন, তাঁহারাও সেই প্রস্তাবনে এই প্রস্তরকে উদ্ভিদ সংখ্যায় গণনা করেন নাই, অথবা পূর্ব্বোক্ত কএক প্রকারের কোন স্থির মীমাংসা করেননাই। আমাদের মতে

কেবল পূর্ব্বোক্ত লক্ষণের দ্বারা উদ্ভিদ জগতের সিদ্ধান্ত করা স্থির থাকিতে পারে না। আরো কতকগুলি লক্ষণের দ্বারা ইহার পরিচয়ের আবশ্যকতা বলিয়া আমরা মনে করি। পৃথিবীর সাময়িক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার সৃষ্টি আবশ্যক, আবার সেই ভাষার উপযোগী অভিধান আবশ্যক, এটা যে কেবল আমরাই নূতন কথা বলিলাম তাহা নয়। প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের সহিত এবং সামাজিক পরিবর্ত্তনের সহিত যে ইহা না ঘটিয়াছে কি ঘটিতেছে একথা কেহই বলিতে পারেন না। ইহার দ্বারা আমাদের আরও একটা বোধ হয় যে, যে সময়ে প্রাচীন পণ্ডিতগণ "উদ্ভিদ" এই শব্দ সৃষ্টি করিয়াছিলেন কি উক্ত বিধরূপ লক্ষণ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তৎকালে হয়ত প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল না। মনে করুন এখন মনুষ্য কি গরু ইত্যাদির যে লক্ষণ স্থিরীকৃত আছে, প্রাকৃতিক ঘটনায় যদি কোন সময়ে ইহার পরিবর্ত্তন ঘটে,(যথা মনুষ্য যদি তিন পদ, কি চতুর্ব্বাহু,কি দ্বিমুখ, কি গরু যদি ষষ্ঠপদ দ্বিপুচ্ছ ইত্যাদি প্রকার হয়) তথাপি পূর্ব্বোক্ত লক্ষণই স্থিরকর থাকিবে, একথা কি কোন জ্ঞানবান মনুষ্য স্বীকার করিতে পারেন? প্রাকৃতিক বৈষম্যতার দ্বারা এইরূপ সৃষ্টির বৈষম্য লক্ষণ যে আমরা না দেখিতেছি তাহাও নয়, যখন একটা ঘটিতে পারে তখন যে পাঁচটা ঘটিতে পারিবে না একথার প্রতি স্থির বিশ্বাস রাখা যাইবে কেন? যাহা হউক এ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা অনাবশ্যক, কিন্তু সামাজিক পরিবর্ত্তনের সহিত যে অভিধান পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

উদ্ভিদ জগতের তত্ত্ব নিরূপণার্থ অদ্য পর্য্যন্ত যে সমস্ত গ্রন্থের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাকে আমরা সম্পূর্ণ গ্রন্থ বলিতে পারি না। এখনও উদ্ভিদ জাগতিক অনেক বিষয় অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, আমাদের সামান্য মন হইতেও ইহার শত সহস্র প্রশ্ন উপস্থিত হইতে থাকে, উত্তর করিতে কি মীমাংসা করিতে চিত্ত বিঘূর্ণিত হয় ও ক্ষুদ্র মস্তক শূন্য হইয়া যায়। মনে করুন একই স্থানে একটী পদ্ম এবং একটী শাপলা রহিয়াছে এ উভয়ের অবয়বে অতি সামান্য বিভিন্নতা। এমন কি ইহাদিগকে একজাতীয় বলিলেও অত্যুক্তি

হয় না, স্বভাবেরও সাদৃশ্য রহিয়াছে, উভয়ই জলজ, উভয়ই শীতঋতুর প্রারম্ভে ধ্বংস হইতে থাকে। এই এত প্রকার সাদৃশ্যের মধ্যে আবার একটী ঘোরতর বৈষম্য একটী দিবাভাগে প্রস্ফুটিতহয় রাত্রে মুদিত হয় একটী রাত্রে প্রস্ফুটিত হয় দিবাতে মুদিত হয়। এই উভয়ের মধ্যে রাসায়নিক উপাদানের কি বিভিন্নতা আছে রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা কোন পণ্ডিত তাহা স্থির করিতে পারেন নাই, এই বৈষম্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক যুক্তি কি আছে কোন বিজ্ঞানবিদ অদ্যাপি তাহা স্থিরকরিতে পারেন নাই, কোন উদ্ভিদ বেত্তা এতদুভয়ের মৌলিক ক্রিয়ার বিভিন্ন ফল প্রদর্শিত করিতে পারেন নাই, কেহ যদি মনে করেন যে এরূপ প্রশ্ন করিলে অনেকই হইতে পারে, কিন্তু এরূপ নিকট সম্বন্ধ বিশিষ্ট এবং সৌসাদৃশ্য স্থলে বৈষম্যের দৃষ্টান্তও সচরাচর হয় না।

যাহা হউক এই উদ্ভিদ জগতের বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা কৃষক, সাধারণ ব্যবহার্য্য লভ্যজনক কৃষিক্ষেত্র স্থিত উদ্ভিদের প্রকৃতি আদির আবশ্যক বিষয়ই আমাদের এস্থলে আলোচ্য।

সহজে হৃদয়ঙ্গম হওয়ার জন্য দৃষ্টান্ত স্থলে উদ্ভিদ জগতের সঙ্গে জীব জগতের কোন বিষয়ে সাদৃশ্য আছে তাহাও কতক আলোচনা করা আবশ্যক।

জীবজগতে যেরূপ চারিটী মূল শ্রেণীবিভাগ রহিয়াছে, উদ্ভিদ জগৎকেও সেইরূপ চারি ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। যথা জলজ, স্থলজ, উভয়জ এবং শূন্যজ। জীব জগতেও এই চারিটী শ্রেণী বিভাগ রহিয়াছে।

বাহ্য জাগতিক পদার্থের সঙ্গে জীব জগতের যেরূপ নিকট সম্বন্ধ, উদ্ভিদ জগতেরও যে তদপেক্ষা দূর সম্বন্ধ নয় তাহা স্থানে স্থানেই আলোচনা করা হইয়াছে। প্রকৃতি গত যে সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহাও দেখা যাইবে, অনেকে উদ্ভিদদিগের মানসিক শক্তি থাকা স্বীকার করেন না, আমরা এই মতের সহিত সম্পূর্ণ যোগ দিতে পারিতেছি না। কোন কোন স্থলে এই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এখন তাহাকে মানসিক শক্তিই বলুন অথবা অন্য কোন আখ্যাই প্রদান করুন বস্তুতঃ এই শক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়।

• সূর্য্য-মুখী ফুলের পরিচয় অনেকেই অবগত আছেন ইহারা সূর্য্যের গতির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে থাকে। আমেরিকায় এক প্রকার গাছের আবিষ্কার হইয়াছে তাহার পত্র সকল উত্তর দক্ষিণাভিমুখে ভিন্ন থাকে না গাছ যেদিক ইচ্ছা সেদিক ঘুরাইলেও পত্র সকল উত্তর দক্ষিণাভিমুখ হইয়া থাকে এই জন্য সেই গাছের নাম দিক্‌নির্ণয় বৃক্ষ রাখা হইয়াছে।

একটী অন্য বৃক্ষের নিকট একটী নারিকেল বৃক্ষ রোপণ করিলে তাহা উক্ত বাধা প্রতিবন্ধকের আশঙ্কায় বক্র ভাবে যাইতে থাকে মানসিক শক্তি না থাকিলে কেন এরূপ যায়? একটী লতিকা এক স্থানে রোপণ করিলে যে দিকে অবলম্বনীয় বস্তু থাকে সেই দিকে গমন করে, সে কেমন করিয়া জানিতে পারে যে সেই দিকে তাহার অবলম্বনীয় পদার্থ রহিয়াছে? এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, এ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত পরিত্যাগ করিয়া একটী বৃহৎ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতেছে। মাংসভোজী এক রূপ উদ্ভিদের পরিচয় অনেকে অবগত থাকিতে পারেন এবং ক্রিয়াও স্মরণ হইতে পারে। সেই ব্যবহার দেখিলে কে বলিতে পারেন যে উদ্ভিদের মানসিক শক্তি নাই, জীব জন্তু আদি অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী হইলে যখন শাখা পল্লবাদি কম্পিত হইতে থাকে এবং ক্রমেই অপেক্ষাকৃত নিকট হইতে থাকিলে বিনা বাতাসেও শাখা পল্লবাদি ঘোরতর আন্দোলিত হইতে আরম্ভ করে এবং আকর্ষণ শক্তির সীমার মধ্যে পাইলে এক বারে আত্মসাৎ করিয়া লয়। তখন কেমন করিয়া বলিব যে ইহাদের মানসিক শক্তি এক বারেই নাই।

আমরা এই সকল কারণের দ্বারা উদ্ভিদাদির মানসিক শক্তি থাকা অনুমান করি; তবে জীব জগতেও যেমন শক্তির ন্যূনাতিরেক দৃষ্ট হয়, উদ্ভিদ জগতেও সেই ন্যূনাতিরেক আছে।

বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, এবং ওষধি এই চারিটী জাতি বিভাগের লক্ষণ, আদির বিবৃতি প্রকাশ করা আবশ্যক। এ চতুর্ব্বিধ উদ্ভিদ এক বীজ দল, দ্বিবীজ দল এবং অবৈজিক আকার ইহাও তিন ভাগে বিভক্ত; প্রকৃত মূল, অপ্রকৃত মূল এবং অমূলক।

বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্‌গমন কালে একটী মাত্র পাতা নিয়া যে বাহির

হয় তাহাকে এক বীজ দল বলা যায়। এই এক বীজ দল উদ্ভিদের মূল প্রকৃত, (প্রকৃত মূলের লক্ষণ এই যাহার প্রথমতঃ একটী মূল শিকড় নির্গত হইয়া নিম্নাভিমুখে যাইতে থাকে এবং চতুর্দ্দিক হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিকড় নির্গত হয়)। যাহা অঙ্কুর উদ্‌গমন কালেই দুইটী পত্র নিয়া বাহির হয় তাহাকে দ্বিবীজ দল বলে। দ্বিবীজ দল উদ্ভিদের মূল অপ্রকৃত। (অপ্রকৃত মূলের লক্ষণ এই, যাহার মূল শিকড় থাকে না এক বারেই ক্ষুদ্র শিকড় নির্গত হয় তাহাকে অপ্রকৃত মূল বলে) অবৈজিক— কাহার কাহার মতে যে সকল উদ্ভিদ ফল প্রসব করে না শাখা পল্লব অথবা মূল হইতে উৎপত্তি হয়, তাহাকে অবৈজিক বলিয়া থাকে। আমাদের মতে তাহা অবৈজিক নয়, যাহা কোন নির্দ্দিষ্ট উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন হয় তাহাকে আমর অবৈজিক বলি না। কোন প্রকার নির্দ্দিষ্ট বীজ ভিন্ন কেবল প্রাকৃতিক ঘটনায় যাহা উৎপন্ন হয় তাহাকে অবৈজিক বলি, (যাহার বিবৃতি স্থানান্তরে প্রকাশ করা হইয়াছে এ স্থানে তাহা পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন) অবৈজিক উদ্ভিদের মূলেরও কোন নির্দ্দিষ্ট নাই। ইহা কোন স্থানে অমূলক (শূন্য লতা ইত্যাদি) কোন স্থানে অপ্রকৃত মূলক।

বৃক্ষ জাতির লক্ষণ—শাখা প্রশাখা পল্লব বিশিষ্ট, মূল প্রকৃত এবং দৃঢ় কাষ্ঠযুক্ত এবং বৃহদাকার ধারণ করে যাহা তাহাকে বৃক্ষ বলি যথা,—আম, জাম, লেবু, কাঁঠাল, কুল, পেয়ারা ইত্যাদি। লতা—যাহা বিনাবলম্বনে উর্দ্ধে উত্থিত হইতে পারে না, মূল অপ্রকৃত এবং যাহার গুঁড়ি হইতে শীকড় নির্গত হয়, কিম্বা অগ্র ভাগ হইতে আকড়া বাহির হয় তাহাকে বলে লতা, যথা—ছিম্বী, কুমড়া, শশা, ঝিঙ্গা, তরমুজ, বাঙ্গি ইত্যাদি। গুল্ম—ইহা ক্ষুদ্র জাতীয়, ইহার মূলের প্রকৃতি ভিন্নরূপ বস্তুতঃ পক্ষে অপ্রকৃত মূল-বিশিষ্ঠ কিন্তু কোন কোন স্থলে কেবল মূলইমাত্র ইহার পদার্থ, যথা— আলু, কচু, মুলা ইত্যাদি; এবং বার্ত্তাকু, মরিচ ইত্যাদিও এই শ্রেণির অন্তর্গত গুল্ম জাতি দীর্ঘজীবী হয় না। ওষধি—ইহারও মূল অপ্রকৃত এবং একবার মাত্র ফল প্রসব করিয়া মরিয়া যায়, তাহাকে ওষধি বলে যথা,—ধান, তিল, শরিসা, যব, কলাই, মুসর ইত্যাদি।

ওষধি, জাতীয় উদ্ভিদের যে লক্ষণ বর্ণনা করা গেল ইহা সাধারণতঃ

প্রচলিত লক্ষণ। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে সর্ব্বত্র এ লক্ষণ রক্ষা পায় না। আমেরিকার অন্তর্গত পর্ডনিউগ্রানেডা নামক স্থানে একরূপ ধান জন্মে; সেই দেশের নামেই ঐ ধানের নাম অর্থাৎ নিউগ্রানেডা। এই ধান একবার ক্ষেত্রে বুনিলে সেই গাছেই তিনবার ধান হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের আর প্রাচীন লক্ষণ স্থিরতর রাখা যায় না, এই জন্যই বলিয়াছি যে, প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে অভিধানের পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

প্রকৃত মূল অপ্রকৃত মূলবিশিষ্ট উদ্ভিদের আরও একটী লক্ষণ, যাহার মূল অপ্রকৃত তাহার মধ্যে সার বিহীন, যথা—নারিকেল, সুপারি, খেজুর, তাল ইত্যাদি।

উদ্ভিদদিগের মধ্যে আরও একটী শ্রেণী বিভাগ আছে। পুষ্পক এবং অপুষ্পক এই দ্বিবিধ লক্ষণ পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ শ্রেণীর উদ্ভিদের মধ্যেই পাওয়া যায়। অপুষ্পক জাতীয় উদ্ভিদ বলিলেই একটা সাধারণ অনুমান হইতে পারে যে, ইহা বীজ হইতে উৎপন্ন হয় না। শাখা, পল্লব হইতে কিম্বা মূল হইতে উৎপন্ন হয়; কিন্তু সর্ব্বত্র এ অনুমান ও স্থিরতর থাকিতে পারে না। প্রাকৃতিক ঘটনায় যে সকল উদ্ভিদ জন্মে (যাহার পরিচয় পূর্ব্বে স্থানান্তরে উল্লেখ করা হইয়াছে) তাহারা সমুদয়ই অপুষ্পক, এভিন্ন ডুম্বুর নামক এক জাতীয় উদ্ভিদের ও পুষ্প হয় না অথচ বীজ হইতে উৎপন্ন হয়। ডুম্বুরের পুষ্প হয় না বটে কিন্তু ফল হয় পুষ্পক জাতির মধ্যেও কতক বীজ হইতে উৎপন্ন হয় আর কতক শাখা আদিতেও জন্মে।

অন্যান্য উদ্ভিদ তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের সঙ্গে সর্ব্বত্র আমাদের মতের এক্যতা রক্ষা পায় না, কোন বিষয় সম্বন্ধে তাঁহাদের মতানুযায়ী লক্ষণ গুলিক আমরা স্বীকার করি না। এভিন্ন আর কতকগুলিক যথা,—প্রকৃত মূল অপ্রকৃত মূল ইত্যাদির লক্ষণ সম্বন্ধে যে অনৈক্য ঘটিতেছে তাহার কারণ তাঁহারা কেবল সেই বিষয়েই অলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে বহু ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন এবং বহুবিধ লক্ষণাক্রান্ত করিয়াছেন আমাদের তৎসমুদয়ের সবিস্তার আলোচ্য বিষয় নাই সুতরাং কোন

স্থলে আমাদের আলোচ্য বিষয়ে সুবিধার জন্য সংকীর্ণ করিয়া লইয়াছি এবং আখ্যা প্রদান করিয়াছি :

উদ্ভিদদিগের স্বাভাবিক শক্তি এইরূপ—বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদের শিকড় যত দিন নিম্নাভিমুখে গতি রহিত হইয়া পার্শ্বস্থ চতুর্দ্দিকে গমন না করিবে তত দিন সেই বৃক্ষের ফল-পুষ্প প্রসবিনী শক্তি জন্মিবে না। বৃক্ষের প্রাকৃতিক শক্তি অনুসারে যখন এই গতি-ক্রিয়া রহিত হয় তখনই তাহার প্রসবিনী-শক্তি জন্মে। স্থানের ব্যতিক্রমে ইহার বৈলক্ষণ্য ঘটে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় একই জাতির একই বীজ-উৎপন্ন বৃক্ষ কোন স্থানে পাঁচ বৎসরে ফল ধরে এবং কোন স্থানে বা দশ বৎসরেও ফল ধরে। ইহার দুইটী কারণ আমাদের উপলব্ধি হয়।

১। স্থানীয় প্রাকৃতিক বৈষম্য—কোন স্থানের মৃত্তিকা বায়ু ইত্যাদি অর্থাৎ সেই জাতীয় উদ্ভিদ এমনই পুষ্টিকর যে অতি অল্প কালের মধ্যেই তাহার মূল বর্দ্ধিত হইয়া গতি শক্তি রহিত হইয়া যায়। কোন স্থানে বা তদ্রূপ পুষ্টিকর পদার্থ না থাকায় অতি মৃদু মৃদু গতিতে এই ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে থাকে, কাযেই কাল বিলম্ব ঘটে। বৃক্ষাদির মূল অনবরতই (বৃক্ষের জীবন কাল পর্য্যন্ত) নিম্নাভিমুখে গমন করিতে পারে না। মৃত্তিকার তরলতা শিক্ততা পঙ্কিলতাকে বৃক্ষমূল ভেদ করিতে সমর্থ হয় না প্রায় স্বভাবতঃই পঙ্কিল স্থানে উদ্ভিদ জন্মে না।* কারণ তাপাংস ভিন্ন আকর্ষণী শক্তি জন্মে না। কাজেই যে স্থানে তাপাংশ প্রবেশ করিতে না পারে সেখানে উদ্ভিদ মূলের গতি ক্রিয়া রহিত হইয়া পরে বৃক্ষাদির প্রকৃতি অনুসারে তাহার মূলে কঠিনকে ভেদ করিতে পারে। তবু পঙ্কিলতাকে ভেদ করিতে পারে না। কোন স্থানে ৫ হাত নিম্নেই অত্যন্ত শিক্ত কোন স্থানে ৭ হাত নিম্নে তদ্রূপ শিক্ত এই সকল নানা কারণে এরূপ ব্যতিক্রম ঘটে, সর্ব্ব প্রকার বৃক্ষেরই যে একরূপ শক্তি তাহা নয় কোন বৃক্ষের মূল অধিক নিম্নে যায় কোন বৃক্ষের তত দূরে যায় না। অল্প তাপাংশেই কোন বৃক্ষের আকর্ষণী শক্তি জন্মে কোন বৃক্ষের

* বৃক্ষাদির প্রকৃতি অনুসারে কোন কোন উদ্ভিদ জন্মিতে পারে জলজ এবং উভয়জ।

অপেক্ষাকৃত অধিক তাপাংশে জন্মে ইত্যাদি। আমরা জীব জগতের প্রসবিনীশক্তি সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ দেখিতে পাই, কোন জাতীয় প্রাণীর ২বৎসরে প্রসবিনী শক্তি জন্মে কোন জাতীয়ের ৫ বৎসরে জন্মে। ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী কেন, মনুষ্যের মধ্যেও দেখিতে পাই কোন স্থানের মনুষ্যের দ্বাদশ বৎসরে প্রসবিনী শক্তি জন্মে, কোন স্থানের লোকের ষোড়শ বৎসরে জন্মে ইত্যাদি। তবে মনুষ্যাদি জীবজগতেও অস্বাভাবিক ঘটনা দেখা যায়। যথা কেহবা দশম বৎসরে প্রসব করে। উদ্ভিদাদির মধ্যেও এরূপ অস্বাভাবিক ঘটনা আমাদের অনেক দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, এই অস্বাভাবিকতাও যে একবারে যুক্তিবিহীন দৈবঘটনা তাহা নহে, পূর্ব্বোক্ত কথা সকলই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ হয়। প্রাকৃতিক ঘটনা ভিন্ন কৃষকের যত্নেও পূর্ব্বোক্তরূপ ঘটিতে পারে। একটী আম্র-বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন করিয়া ৩ বৎসরে তাহা হইতে ফল লাভ করা গিয়াছে এস্থলে তাহার বিবৃতি প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়াছি।*

বৃক্ষমূলের নিম্নাভিমুখে গতি রহিত হইলেই যে প্রসবিনী শক্তি জন্মে তাহার আরও একটী সহজ দৃষ্টান্ত, এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে বীজোৎপন্ন বৃক্ষ অপেক্ষা কলমের বৃক্ষে সত্বরই ফল ধরে, কিন্তু শাখাকলম ভিন্ন সত্বর ফলেনা। মনে করুন একটী অপ্রসবী (যাহার প্রসবিনী শক্তি জন্মে নাই) বৃক্ষের সঙ্গে জোড় কলম বান্ধিয়া দিলে তাহা কখনই শাখাকলমের ন্যায় সত্বর ফলিবে না। কারণ উহা প্রকৃত মূলবিশিষ্ট, এবং তাহার মূলের নিম্নাভিমুখে গতি রহিত হয় নাই। শাখাকলমের শক্তি ইহা হইতে ভিন্নরূপ, যে বৃক্ষের শাখা কলম করা গেল সে বৃক্ষ প্রসবিনী শক্তি বিশিষ্ট এবং তাহার মূলের নিম্নাভিমুখে গতি ক্রিয়া রহিত হইয়াছে। সেই সম শক্তিবিশিষ্ট শাখাকলম করিলে তাহার প্রসবিনী শক্তি লোপ হয় কেন? শাখাকলমের বৃক্ষের মূলশিকড় থাকে না, মূলশিকড় ভিন্ন অন্য শিকড় নিম্নাভিমুখে যায় না। শাখাকলমের বৃক্ষ দীর্ঘজীবী হইতে পারে না। যে বৃক্ষের শাখাকলম করা যায় সেই বৃক্ষের অবশিষ্ট জীবনের অতি-রিক্ত কালের অধিক জীবিত থাকে না, (এই কারণে অত্যন্ত প্রাচীন

---

* কৃষিতত্ত্বের সংখ্যা পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেন।

বৃক্ষের শাখা কলম করা নিষিদ্ধ) তাহা একটা পরিবর্ত্তনের দ্বারা কতকটা আধিক্য জন্মিতে পারে।

বৃক্ষজাতির মধ্যে তালের ন্যায় অধিক দূর নিম্নাভিমুখে আর কোন বৃক্ষের মূলই গমন করে না এই জন্যই তাল বৃক্ষ অনেক বিলম্বে ফলে, এই জনাই একটা প্রবাদ আছে যে তালবৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহার ফল ভক্ষণ করা দীর্ঘজীবনের কাজ। সকলের ভাগ্যে ঘটে না। তাল ভিন্ন প্রায় সকল বৃক্ষই অনধিক অষ্টম বৎসরের মধ্যে ফলবান হয়। ইহার ন্যূনাধিক ঘটিলেই তাহাকে আমরা অস্বাভাবিক ঘটনা মনে করি তবে বৃক্ষের জাতি বিশেষে ইহার অগ্রেও ফলবান হয়। যথা দাড়িম্ব পেয়ারা ইত্যাদি।

ওষধি—ইহাদের নূতন শিকড় বহির্গত হওয়া রহিত হইলেই প্রসবিনী শক্তি জন্মে। ওষধি জাতি যে সচরাচর একবার মাত্র প্রসব করিয়াই ধ্বংশ হইয়া যায় তাহারও প্রধান কারণ এই. প্রথমতঃ যে সকল মূল নির্গত হয় তাহাদেরও বর্দ্ধন শক্তি থাকে না এবং নূতন মূল নির্গম শক্তিও রহিত হয়। পূর্ব্ব ক্রমে মূল সকলের কোমলতা দূর হইয়া দৃঢ় হইতে থাকে কাজেই আর রস আকর্ষণী শক্তি থাকে না। রস অভাবে ক্রমে শুষ্ক হইয়া যাইতে থাকে।

লতা এবং গুল্ম, ইহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহার প্রসবেরও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই, মৃত্যুরও নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। কি সর্ব্বাবিধ গুল্ম,কি সর্ব্ববিধ লতা কেহই এক প্রকৃতি বিশিষ্ট না। প্রায় অধিকাংশই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট সুতরাং ইহাদের সম্বন্ধে আমরা কোনএক পদ্ধতি করিতে পারিলাম না।

বৃক্ষাদির মূলের ক্রিয়ার সহিত ফল পুষ্পাদির লক্ষণালক্ষণের কি স্বাদ আদির কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয় না, জোড়কলমের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এক জাতীয় মূল বিশিষ্ট বৃক্ষের সহিত অন্য জাতীয় বৃক্ষ শাখায় জোড় কলম বান্ধিয়া দিলে সেই মূলবিশিষ্ট বৃক্ষের ফল পুষ্পের অবয়বের সহিত ইহার কোন সাদৃশ্য ঘটে না। যে জাতীয় শাখা জোড় দেওয়া গেল সেই জাতীয় ফল পুষ্প তাহাতে উৎপন্ন হয় যথা একটী

জবা পুষ্পের মূলবিশিষ্ট গাছের সহিত যদি এক খানি গোলাপের শাখা জোড় কলম বান্ধিয়া দেওয়া যায় তবে তাহাতে গোলাপই হইতে থাকে অথবা ঐ গাছ হইতে দুইরূপ পুষ্পই হয়। এক খানায় গোলাপ হয় অন্য খানায় জবা হয়। এইরূপ লেবু গাছের সঙ্গে আম্রশাখার জোড় কলম বান্ধিলে তাহাতে আম্রই হইয়া থাকে।

মনুষ্যাদির যেমন মস্তক দ্বারাই মানসিক শক্তির কার্য্য হয়, শরীরের অপরাংশ কেবল যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত এবং পরিচালিত হইয়া থাকে, শারীরিক বলের কার্য্য শরীর হইতেই হইয়া থাকে। যথা—যদি কোনরূপ শক্তি কি কৌশলের দ্বারা দশম বৎসরে একটী বালকের হৃৎপিণ্ডের সহিত পূর্ণ যৌবনাবস্থার একটী মনুষ্যের মস্তক লগ্ন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, তবে তাহার দ্বারা মানসিক শক্তির পূর্ণবিকাশের কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে। কিন্তু শারীরিক শক্তির পূর্ণ বৈকাশিক কার্য্য হইতে পারে না; মনে করুন হয়ত তাহার সন্তানোৎপাদন ইচ্ছা হইতে পারে, কিন্তু শক্তি জন্মিতে পারে না।

আমাদের এই কাল্পনিক যুক্তির সহিত বৃক্ষাদির পূর্ব্বোক্ত ঘটনার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইতে পারে।

গুল্ম এবং বৃক্ষাদির আর একটী প্রকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা সাময়িক ফল পুষ্প প্রসব করে অর্থাৎ কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রসব করে। তজ্জাতি বৃক্ষাদির মধ্যে যাহাদের ফল পুষ্পের বৃন্ত অতি শক্ত ফল পাকিলেও আপনা হইতে পড়িয়া যায় না, সেই সকল গুল্ম বৃক্ষের ফল পুষ্পাদি না পাকিলে পরবর্ত্তী সময়ে সেই বৃক্ষের ফল পুষ্প প্রসবিনী শক্তি কমিয়া যায়। গাব নারিকেল ইত্যাদি বৃক্ষে ইহা প্রত্যক্ষ লক্ষিত হইয়া থাকে, এই জন্যই কৃষকদিগের প্রবাদ যে, দাতার নারিকেল, বখিলের বাঁশ।

আমরা চা-ক্ষেত্রেও ইহার প্রমাণ পাইয়া থাকি, যে গাছের পত্র চয়ন না করা যায়, পরবর্ত্তী সময় সেই গাছে অতি অল্প পত্রই নির্গত হইয়া থাকে।

ক্ষেত্র-কর্ষণ প্রণালী।

স্বাভাবিক মৃত্তিকার উদ্ভিদাদি প্রজনন শক্তি নাই, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। অপ্রকৃত ও শঙ্কর জাতি মৃত্তিকা মিশ্রিত হইয়া প্রজনন শক্তির উৎপত্তি করে; নানাবিধ বস্তুরই গলিতাংশ মৃত্তিকারূপে পরিণত হইয়া পৃথিবীকে ক্রমে উচ্চ করিতেছে। ঐ সকল অপ্রকৃত মৃত্তিকা দুগ্ধের সরের ন্যায় ক্ষেত্রের উপরিভাগে পড়িতে থাকে। (এজন্য কোন কোন স্থানে ইহাকে গরানি অথবা গর মৃত্তিকা বলে।) যে বস্তু অপেক্ষা যে বস্তু লঘু তাহাই উপরে ভাসিয়া থাকে; জল অপেক্ষা তৈল লঘু জলের উপরে তৈল ভাসিয়া থাকে। কিন্তু জলের উপর তৈল যে পরিমাণ ভাষে বিশুদ্ধ দুগ্ধের উপর সে পরিমাণ ভাষে না। তাহার কারণ দুগ্ধে যে তৈলাক্ত পদার্থ আছে তাহা তৈল অপেক্ষা লঘু। জল হইতেই বরফ জন্মে অথচ জল অপেক্ষা বরফ লঘু বলিয়াই জলের উপর ভাষে, বস্তু সকলের গুরুত্ব লঘুত্বের কারণ বায়ু। যে বস্তুর অভ্যন্তরে যে পরিমাণ বায়ু আছে, সেই বস্তু তত পরিমাণে লঘু, বস্তু সকলের মধ্যে বায়ুর ন্যূনাধিক্যের কারণ সছিদ্রতা। যে বস্তুর অভ্যন্তরে যত পরিমাণ সছিদ্রতা সেই বস্তুর মধ্যে তত পরিমাণে বায়ু থাকে সুতরাং লঘু হয়। বায়ু কর্ত্তৃক জল জমিয়া বরফ হয়, বরফে সছিদ্রতা অধিক বলিয়াই জলের উপর ভাসে।

অকর্ম্মণ্য মৃত্তিকাপেক্ষা সার মৃত্তিকা অধিক সছিদ্র কাজেই তাহা লঘু। এক খণ্ড চিক্কণ (আঠালিয়া) মৃত্তিকা আর তত পরিমাণের এক খণ্ড সার মৃত্তিকা ওজন করিলে সমান হয় না। মুঙ্গের পাহাড়ে যে একরূপ পাথর তাহা কাল পাথর অপেক্ষা ওজন কম, তাহার কারণ এই যে কাল পাথর অপেক্ষা তাহা সছিদ্র, ইহার আরও এক পরীক্ষা এই যে, যে বস্তু যত সছিদ্র তাহা তত সহজে চূর্ণ কি বিশীর্ণ করা যায়। সার মৃত্তিকা অধিক সছিদ্র তাহা সহজে চূর্ণ হয়, কাজেই তাহা ওজনে লঘু, ইহার দ্বারা অবশ্য এ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, মৃত্তিকার সারাংশ ক্ষেত্রের উপরিভাগেই থাকে।

কিন্তু একবার উপরিভাগের সারাংশটা একটা কারণের দ্বারা কতক পরিমাণ নষ্ট হইয়া যায়। প্রথমতঃ সূর্য্যের তাপ মৃত্তিকার যতদূর

পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া প্রবেশ করে ততদূর পর্য্যন্ত উর্ব্বরা শক্তির কথঞ্চিৎ খর্ব্বতা করে। যে সকল পদার্থের সংযোগে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি হয়, ফসফরাস পটাশ, আমোনিয়া, যবক্ষার অম্ল, যবক্ষার দ্রাবক ইত্যাদি সূর্য্যের আকর্ষনের দ্বারা এ সকলের কতক পরিমাণে বাষ্পাকার জলেতে কতক বায়ুতে মিশিয়া যায়, ক্ষেত্র অকর্ষিত থাকায় আর তাহা পর্য্যাপ্তরূপে পুনঃ প্রবেশ করিতে পারে না। বিশেষতঃ কৃষির প্রধান উপযোগী যে জল, সেই জলীয় ভাগটাকে একেবারে শুষ্ক করিয়া ফেলে। দ্বিতীয়তঃ ভূমি কোন অবস্থায়ই এমন থাকে না যে তাহাতে কোন না কোন প্রকার উদ্ভিদ জন্মে না,* সেই সকল ঘাস জঙ্গলাদি নানা প্রকার উদ্ভিদাদি জন্মিয়া উপরিভাগের সারাংশটা কতক পরিমাণে গ্রাস করিয়া জীবনী শক্তি রক্ষা করে এবং বর্দ্ধিত হয়। আবার সময়ান্তরে তাহাই গলিত হইয়া সাররূপে পরিণত হয় কিন্তু একটী গলিত হইয়া সাররূপে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই আর একটী জন্মে। কাজেই ক্ষেত্রের উপরি ভাগের সারাংশটাকে যে কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস করে তাহার আর সন্দেহ নাই।

ভূমির অত্যন্ত নিম্নে যে উদ্ভিদের পোষণোপযোগী পদার্থ থাকে না তাহা উদ্ভিদের প্রকৃতি দ্বারাও কতক প্রমাণ পাওয়া যায়। অত্যন্ত বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষেরও শিকড় ক্রমাবচ্ছিন্ন কেবল নিম্নাভিমুখে যায় না, উদ্ভিদের প্রকৃতি অনুসারে যতদূর নিম্ন পর্য্যন্ত তাহার পোষণোপযোগী পদার্থ পায় তত দূর পর্য্যন্তই যায়। চতুর্দ্দিকে যে শিকড়াদি বিস্তৃত হইতে থাকে তাহারও কারণ, উদ্ভিদের স্ফীতা এবং শাখা প্রশাখা কাণ্ডাদির বিস্তারতানুসারে পোষণোপযোগী পদার্থের অধিক আবশ্যক করে, নিম্নাভিমুখে গেলে তদোপযোগী পদার্থ অধিক পায়না বলিয়াই চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হয়।

এই সকল নানা কারণের দ্বারা আমরা সিদ্ধান্ত করি যে ভূমির অত্যন্ত নিম্নতর স্থানে উদ্ভিদের পোষণোপযোগী সার পদার্থ থাকে না কিন্তু ইহার দ্বারা একেবারে এরূপ বুঝাইবে না যে কেবল দুই ইঞ্চি

---

* যে স্থানে কোন প্রকার উদ্ভিদ না জন্মে তাহা মরুভূমি, তাহা কৃষি ক্ষেত্রের উপযোগী না।

পরিমাণ ক্ষেত্র কর্ষণ করিলেই তাহাতে কৃষি জন্মাইতে পারা যায়। উদ্ভিদের প্রকৃতি অনুসারে ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে হয়, তবে স্থান বিশেষে কোন স্থানে পাঁচ হাত নিম্ন পর্য্যন্ত সার থাকিতে পারে, কোন স্থানে বা তদপেক্ষা কিছু অধিক পরিমাণ নীচেও থাকিতে পারে। যথা সকল বৃক্ষেই সমান পরিমাণ সার পড়ে না। যে বৃক্ষে সারাংশ অধিক তাহাতে সার অধিক পুরু হইয়া পড়ে।

যে ক্ষেত্রে যে কৃষি করিতে হইবে, সেই কৃষির প্রকৃতি অনুসারে তাহা কর্ষণ করা আবশ্যক। বৃহৎ জাতীয় বৃক্ষ ক্ষেত্রের জন্য সমুদয় ক্ষেত্র কর্ষণ না করিলেও হয়, মাত্র যেখানে চারা কি বীজ অথবা কলম রোপণ কি বপন করিতে হইবে সেই স্থানের মৃত্তিকা খনন করিতে হয়। চারা কি কলম রোপণ কালে দেখিতে হয় যে তাহার শিকড় সকল কত নিম্নে গিয়াছিল এবং কত প্রসারিত হইয়াছিল সেই পরিমাণ অপেক্ষা কিঞ্চিত নিম্ন এবং প্রশস্ত হওয়া আবশ্যক। শিকড় গুলির অগ্রভাগের কোমলাংশ পর্য্যন্ত যেন খাত স্থানে প্রশস্ত ভাবে থাকিতে পারে। প্রায় সর্ব্ব প্রকার উদ্ভিদেরই রোপণ কালে যদি শিকড়ের অগ্রভাগ বক্র ভাবে কি সঙ্কুচিত ভাবে থাকে, তবে তাহা প্রায় শীঘ্র বর্দ্ধিত হয় না, বরং অনেক গুলি একবারেই মরিয়া যায়। বৃহৎ জাতীয় বৃক্ষ সকলের শিকড় অতি অল্প দিনের মধ্যেই ক্রমে দৃঢ় হইয়া পড়ে, ক্ষেত্র অধিক কর্ষণ কি অল্প কর্ষণ না করিয়া দিলেও তাহারা আপন শক্তিতে মৃত্তিকা ভেদ এবং প্রয়োজনোপযোগী বস্তু আহরণ করিয়া জীবন যাপন করিতে পারে তবে কৃষকের, যত্ন থাকিলে সত্বর বর্দ্ধিত এবং বলশালী হইয়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফল ফুলাদি প্রসব করিতে থাকে।

যে সকল কৃষির কেবল মূলই ব্যবহারোপযোগী এবং প্রয়োজনীয়, যথা—মূলা, শালগম আলু, কচু, কেসুর, পলাণ্ডু ইত্যাদি। এই সকল কৃষি-ক্ষেত্রের মৃত্তিকা অধিক পরিমাণে খনন, কর্ষণ এবং অত্যন্ত চূর্ণ করিতে হয়। মৃত্তিকাভ্যন্তরে বায়ু অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিতে না পারিলে তাহাদের আকার বড় হইতে পারে না। এই জাতীয় উদ্ভিদের প্রকৃতি অত্যন্ত কোমল, মৃত্তিকার কঠিনতাকে আপন শক্তিতে ভেদ

করিয়া পুষ্টিবর্দ্ধন করিতে পারে না। রস আকর্ষণী শক্তিও ইহাদের অধিক।

যে সকল উদ্ভিদের বীজ অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র * (যথা—সরিষা, কফি তিল ইত্যাদি) উহাদের ক্ষেত্র অধিক কর্ষণ করা আবশ্যক, ইক্ষু ক্ষেত্রও অধিক কর্ষণ করিতে হয়। যে সকল উদ্ভিদের মূল যে পরিমাণ কোমল তাহার ক্ষেত্র সেই পরিমাণে কর্ষণ করিতে হয়।

যে সকল স্থানে প্রথমতঃই ধান বাইন (বুনিয়া ফেলা) না করিয়া ধানের গাছ রোপণ করা হয়, সেই সকল ক্ষেত্র কর্দ্দমিত অবস্থায়ই চাস করিতে হয়। জোয়ারের জলে কি বৃষ্টির জলে ক্ষেত্র প্লাবিত হইয়া না থাকিলে, জল সেচিয়া ক্ষেত্রে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া চাস দিতে হয়। কর্দ্দমিত মৃত্তিকায়ও জটিলতা থাকে এই পরিমাণ চাষ দিতে হয় যেন সমুদয় ক্ষেত্রের মৃত্তিকাই একবারে শিথিল হইয়া পড়ে।

প্রায় সর্ব্ব প্রকার কৃষিক্ষেত্রই অন্যূন একফিট পরিমাণ খাত হওয়া আবশ্যক। কোনকোন কৃষির স্বভাব অনুসারে আরও অধিক খনন করিতে হয়। বৃক্ষের শিকড় এবং মুকুলে যত বায়ু প্রবেশ করিতে পারে, ততই বৃক্ষের উপকার হয়, এজন্য কোন কোন স্থানে ক্ষেত্রের মধ্যে মধ্যে নালা কাটিয়া দেয়। নালা কাটাতে অল্পাধিকরূপে বৃক্ষের মূলে বাতাস প্রবেশ করিয়া কৃষির উপকার হয়, সন্দেহ নাই। যে সকল কৃষিক্ষেত্রে সর্ব্বদা কর্ষণ করিতে হয় না, সেই সকল ক্ষেত্রের মধ্যে এবং পার্শ্বে নালা কাটা হইয়া থাকে। যথা—নারিকেল সুপারি, আম, কাঁঠাল, কলাই ক্ষেত্র। যে সকল ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া কৃষি করিতে হয়, তাহাতে নালা কাটার প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত নাই। নালা কাটিলে ক্ষেত্র কর্ষণের অসুবিধা হয়†। ইংলণ্ড দেশে ক্ষেত্রের ২।৩ হাত নীচে আর ২০।২৫ হাত ব্যবধান করিয়া নালা কাটিয়া তাহার মধ্যে লোহার নল বসাইয়া দেয় একদিকে একটা বড় নল দিয়া মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট নল বসাইয়া বড় নলের সঙ্গে সমুদয় নলের মুখ মিশাইয়া দেয় বড়নলের

* ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে তিসীর ক্ষেত্র অত্যন্ত কর্ষণ না করিলেও জন্মে।
† যে অসুবিধা হয় তাহার বিবরণটী পরে দেওয়া যাইতেছে।

মুখ একটা পুষ্করিণী বা খালের দিগে থাকে বৃষ্টি হইলে ছোট ছোট নালা-দিয়া বড় নালার দ্বারা ক্ষেত্রের জল নির্গত হইয়া যায়। নলের উপরে মাটিদিয়া ক্ষেত্র সমতল করিয়া দেয় তাহাতেই চাসের ব্যাঘাত হয় না। নালা কাটার আরও বিশেষ উপকার এই হয় যে ক্ষেত্রের সার বৃষ্টির জলে ধুইয়া স্থানান্তরে যাইতে পারে না; এইরূপ নালা বিশিষ্ট ভূমি সহজে তপ্ত হয় না। নালা বিশিষ্ট ক্ষেত্র কেন যে তপ্ত হয় না, সে সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত। বস্তুতঃ তপ্ত যে হয় না সেটী সর্ব্ববাদি-সম্মত রবার্টসন নামে একজন সাহেব মান্দ্রাজে ইহার বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন * যে, ক্ষেত্রের নীচে নালা থাকিলে অনাবৃষ্টি ও রৌদ্রে শস্যের ক্ষতি করে না।

ক্ষেত্রের † আয়তন বড় হইলে যে চাষের শুবিধা হয় এবং সময় অল্প লাগে এ হিসাব আমাদের দেশের কৃষক মাত্রেই জানে না। ইংলণ্ড দেশে এক এক খানি কৃষিক্ষেত্র ২৫ বিঘা ৩০ বিঘা পরিমাণ, সে দেশের ন্যায় আমাদের দেশে কৃষি যন্ত্রেরও ব্যবহার নাই। বিশেষতঃ সর্ব্ব শুদ্ধ ২৫ বিঘা জমি প্রায় অধিকাংশ কৃষকের মোট চাসও নাই। কৃষক চাস করিবে কি, অনেক স্থানে এক জন ভূস্বামীর একত্রে এক স্থানে ২৫ বিঘা ক্ষেত্র পাওয়া দুষ্কর। যাহা হউক তথাচ সম্ভবতঃ ক্ষেত্রের আয়তন বড় করা কৃষকের উচিত। ক্ষেত্রের আয়তনের ন্যূনাতিরেকে চাস উপযোগী পশু দিগের ঘুরিতে ফিরিতে কত সময় যায় এবং চাস করিতে কত সময় যায়, তাহার হিসাব নিম্নে প্রদর্শিত হইল। ১০ ঘণ্টা কাল চাস করিলে যত সময় যে ভাবে যায় তাহার হিসাব।

ক্ষেত্রের বিস্তৃতি।	ঘোরাফেরাতে যত সময় ব্যয় হয়।		কর্ষণে যত সময় ব্যয় হয়।	
হাত	ঘণ্টা	মিনিট	ঘণ্টা	মিনিট
১৫৩	৫	১১	৪	৪৯
২৯৮	২	৪৪	৭	১৬
৪০০	২	১	৭	৫৯
৪০৪	১	৫৭	৮	৩
৫৪৮	১	২২	৮	৩৮

* See Robertson's of the Sydapet Farms 1872—73.

† এই নিয়মটী ব্যবসায়ীতে প্রকাশ করা হয় তদনুসারে আমরা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ পাইয়াছি।

ঘুরিতে ফিরিতে যে সময় যায় ঐ সময়টী পশু দিগের বিশ্রামের সময়; কিন্তু ক্ষেত্রের আয়তন এত বড় হওয়াও উচিৎ না যে পশুগণ একবার এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত যাইতে গেলে কেবল একদিকে লম্বা করিলে ঐ লাভ থাকেনা। মনে করুন ক্ষেত্রের উত্তর দক্ষিণ যেন ৫৪৮ হাত হইল পূর্ব্ব পশ্চিম ১৫৬ হাত হইল. তাহাতে অসময়ের অপব্যয় রক্ষা হয় না, কারণ চাষের নিয়ম এই, একবার উত্তর দক্ষিণদিকে চাষ দিলে আর একবার পূর্ব্বপশ্চিমদিকে চাষ দিতে হয়। কেবল একদিক চাষ দিলে ক্ষেত্রের সমুদয় মৃত্তিকা শিথিল এবং কর্ষিত হয় না. একেবারে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত ও যদি একবার লাঙ্গল যে স্থান দিয়া যায় পুনরায় তাহারই পার্শ্ব দিয়া নেওয়া যায় তথাচ উভয় লাঙ্গলের মধ্যে সূক্ষ্ম রেখাবৎ কতকাংশ অকর্ষিত থাকে। কাযেই উত্তর দক্ষিণ চাষ দিবার কালে, যে কতকটা সময় অপব্যয় হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, পূর্ব্ব পশ্চিম চাষের কালে আবার অধিক সময় অপব্যয় হয়। প্রতিদিন যে ১০ ঘন্টা চাষের নিয়মে হিসাব ধরা গেল, তদনুসারে যদি ধরা যায় যে উত্তর দক্ষিণ দিক যাহা ৫৪৮ হাত লম্বা এক দিকের চাষেই শেষ হইলে তাহা হইলে ঘুরা ফেরাই সময় বাদ দিলে ৮ ঘন্টা ৩৮ মিনিটে চাষ শেষ হইবে। কিন্তু সেই ক্ষেত্রই পূর্ব্ব পশ্চিম যাহা ১৫৬ হাত তাহা চাষ দিতে ঐ হিসাবে ১৩ ঘন্টা ৫৫ মিনিট লাগিবে। তাহা হইলে প্রায় ২ দিনই লাগিল, ঐ ক্ষেত্র যদি পূর্ব্ব পশ্চিমের ৫৪৮ হাত হইত তাহা হইলে পূর্ব্ব পশ্চিম চাষও এক দিকেই শেষ হইত। অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃষকদিগকে এই হিসাব বুঝান কষ্ট। তাহারা কোন মতেও ইহা বুঝিতে চাহে না, সময়ের অতিরিক্ততা হয়ত চাষীর দোষ অথবা পশুর দোষ দিয়া বলিয়া থাকে।

আমরা এস্থলে ক্ষেত্র কর্ষণের স্থূল স্থূল বিবরণ প্রকাশ করিলাম, কৃষিপ্রণালী স্থলে কৃষি স্বভাব অনুসারে চাষের বিশেষ বিবরণ লিখিত হইবে।

ক্ষেত্র যে কোন প্রকারেই খনন করিতে হয়, অর্থাৎ প্রকৃতি অনুসারে মৃত্তিকাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে হয়, কি অধিক খনন করিতে হয় তাহা একেবারে দুই, তিন, দিনের মধ্যে শেষ করিয়া বীজ বপন করা বিধেয় নহে।

তাহাতে ভূমধ্যস্থ তাপ বায়ু ও জালরূপ নির্গত হইতে পারে না, এবং বহিস্থ তাপ বায়ুও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ক্ষেত্র মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেনা। এক দিন এক ক্ষেত্রের এক চাষ শেষ করিয়া পর দিন অন্য ক্ষেত্র চাষ করিতে হয়। এইরূপ তিন চারি দিন পরে পুনরায় ঐ ক্ষেত্রে চাষ দিতে হয়, এইরূপ ক্রমে মধ্যে দুই চারি দিন ক্ষান্ত রাখিয়া চাষ করিলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তাপ বায়ু প্রবেশ করিয়া ক্ষেত্রকে অধিক শক্তিশালিনী করে। ক্ষেত্রে বীজ বপন করিবার অন্যূন ২ মাস পূর্ব্ব হইতে এইরূপে চাষক্রিয়া আরম্ভ করা উচিত, কোন কোন কৃষির জন্য তদপেক্ষা অধিক পূর্ব্বেও চাষ করিতে হয়।

ক্ষেত্র কর্ষণ জন্য বৎসরের মধ্যের প্রথম কোন্ সময় তাহা, বর্ত্তমান সময়ের কার্য্য প্রণালী অনুসারে নির্ণয় করিয়া লওয়া কঠিন। এক্ষণে অনেক কৃষকেরা (যাহারা দিন ক্ষণ মানিয়া থাকে) বৈশাখ মাসের পর প্রথম হাল চাষ করিবার সময়ে শুভ দিন দেখিয়া থাকে, সেটি আমাদের ভ্রম বলিয়া বোধ হয়। কৃষিকার্য্যের বৎসর বৈশাখ মাস হইতে গণনা হয় না। ফসলি একটা সন থাকা দেখা যায়। অনেক আইনের মধ্যে ফসলি সনের উল্লেখ থাকা দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্দারা বিশেষ কোন নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ না পাওয়া গেলেও অনেক কারণের দ্বারা বোধ হয় যে পৌষ মাসে ফসলি সনের শেষ হয়। চীনের ইতিহাস পাঠে দেখা যায়, চীনের রাজার আদেশ ভিন্ন দেশের প্রথম হল চালনা হইতে পারেনা। বসন্ত ঋতুর প্রথমে কোন একটী শুভ দিন দেখিয়া দেশের সমুদয় কৃষকমণ্ডলী রাজবাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া আসেন এবং সকলে একত্রিত হইলে, একখানি হাল জুড়িয়া প্রথমতঃ রাজা কতক পরিমাণ কর্ষণ করেন, পরে ক্রমে মর্য্যাদানুসারে কৃষকগণ ঐরূপ কর্ষণ করিলে শেষ সকলে একত্রিত কর্ষণ করে। সেই দিবস রাজবাটীতে মহাসমারোহে কৃষকদিগের ভোজ হইয়া থাকে ও রাজকোষ হইতে কৃষকদিগকে নূতন বস্ত্র বিতরণ করা হয়। চীন দেশে কৃষকেরাই সর্ব্বশ্রেণী অপেক্ষা সম্ভ্রান্ত এবং মর্য্যাদাবান্। চীনেরা অন্য দেশের সভ্যতার অনুরোধে প্রাচীন প্রথা লঙ্ঘন করে না বলিয়াই অদ্যাপিও সেখানে এইরীতি প্রচলিত আছে। ফলতঃ এটী যে একটী সুনিয়ম, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কৃষিকার্য্যে

রাজার এইরূপ উৎসাহ এবং মনোযোগ না থাকিলে কৃষির উন্নতি হইতে পারে না। ভারতবর্ষেও এককালে এসম্বন্ধে অনেক সুনিয়ম ছিল।

যাহা হউক এখন দেখা যাইতেছে চিনের ইতিহাসের দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বসন্ত ঋতুর প্রারম্ভেই কৃষি বৎসরের অথবা ফসলি সনের প্রথম সময়। নানা কারণ দ্বারা আমাদেরও বোধ হয় মাঘ মাসই কৃষি বৎসরের প্রথম আরম্ভ কাল। আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ, সমুদয় কৃষির অপেক্ষা ধান্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, বোধ হয় সেই ধান্য হইতেই কৃষি বৎসরের গণনা করা হইয়াছে।

পরাশরের কৃষি-সংহিতা পাঠে ইহার একেবারে নির্দ্দিষ্ট করা যায় না। তিনি একস্থানে বলিয়া গিয়াছেন, প্রথম কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিতে মাঘ মাসে ক্ষেত্রে সার দিবে, ফাল্গুন মাসে ক্ষেত্র কর্ষণ করিবে। তৎপর বীজ বপনাদি করিবে। ইহার দ্বারা স্থির মীমাংসা না হইলেও বোধ হয় যে, তিনিও মাঘ মাসকে কৃষি-বৎসরের প্রথম সময় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ আমরাও নানা কারণ দ্বারা মাঘ মাসকেই কৃষিবৎসরের প্রথম সময় নির্দ্ধারণ করিলাম।

পরাশর ভাবী বৎসরের শস্যের ফলাফল সম্বন্ধে একটী নিয়ম বলিয়াছেন। বৎসরের প্রথম হল প্রবাহ সময়ে গোগণ যদি মূত্র ত্যাগ করে তবে বন্যা হয় ও মল ত্যাগ করিলে শস্য অধিক হয়। আমরা ইহার প্রতি লক্ষ রাখিয়া পরীক্ষা করিতে পারি নাই, অনেকে ইহাকে অমূলক বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা এখন পর্য্যন্তও সে উপহাসে যোগ দিতে ইচ্ছুক নহি। আমাদের বিশ্বাস যে পরাশরের বহুদর্শিতার ফল অনুসারে এসকল নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। যাঁহারা উপহাস করেন, তাঁহারাই যে কোন্ অভিজ্ঞতার দ্বারা কোন্ সূত্রানুসারে উপহাস করেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না।

কৃষি পর্য্যায়।

ক্ষেত্র পরিবর্ত্তন করা অর্থাৎ এক ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ এক কৃষিই করিলে ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হইয়া যায়, এদেশীয় কৃষকেরা ইহার বৈজ্ঞানিক কারণ অবগত না থাকিলেও ক্ষেত্র পরিবর্ত্তনের রীতি প্রচলিত থাকা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষেত্র পরিবর্ত্তন করার কারণ এই যে, যে জাতীয় পরমাণুর সমষ্টিতে যে জাতীয় উদ্ভিদের উৎপত্তি, এক ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ এক জাতীয় উদ্ভিদ উৎপাদনে ক্ষেত্র হইতে সেই জাতীয় পরমাণু বিদূরিত হইয়া যায়, সুতরাং তাহাদের আর পুষ্টি বর্দ্ধন হইতে পারে না। ধান, যব, গম, সরিষা ইত্যাদি কতকগুলি কৃষিতে ন্যূনাধিক রূপে প্রায় অনেক প্রকার ভৌতিক পদার্থই আছে। সুতরাং এ সকল কৃষি ক্ষেত্র পরিবর্ত্তন না করিলেও তত ক্ষতি হয় না। তথাচ তাহাতেও মধ্যে মধ্যে সার ব্যবহার না করিলে উহা ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।*

কৃষি পর্য্যায় অবগত থাকা কৃষক মাত্রেরই নিতান্ত প্রয়োজন। আমাদের দেশে কৃষি শাস্ত্রও নাই অথবা থাকিলেও তাহা পাঠ করিয়া কেহ কার্য্য করে না। প্রাচীন কৃষকদিগের মত নিয়া এই সকল কার্য্য করিয়া থাকে। সময় সময় ৫।৭ জন একত্রিত হইয়া কমিটী করিয়াও নির্ব্বাচন করা হইয়া থাকে। আমরা যত দূর দেখিয়াছি তাহাতে এইরূপ পর্য্যালোচনা করিলে সুবিধা হয়,যে সকল ক্ষেত্র বর্ষার প্রারম্ভ হইতেই জলে ডুবিয়া যায়, আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে জল থাকে না, তাহাতে আউশ ধান বাইন করিয়া কাটিয়া নিয়া,শেষেমৃত্তিকাসিক্ত থাকা সময়েই বিনা চাষে সরিষা এবং মটর ছিটাইয়া ফেলিলেই হয়। পর বৎসর তাহাতে পাট এবং মুগ অথবা কলাই বাইন করিতে হয়। সরিষা, মটর কলাই অপেক্ষা মুগ, মাষ কলাই অনুর্ব্বরা ভূমিতেও হয়। তৃতীয় বৎসর নীল আর তামাক দিলে ভাল হয়। তামাকের জন্য নীলের পাতা অতিউত্তম সার। তাহা স্থানান্তরে প্রকাশ করা যাইবে। যে ক্ষেত্রে ইক্ষু দিতে হয় দ্বিতীয় বৎসর তাহাতে হরিদ্রা অথবা মাণকচু,

* বোধ হয় এই জন্যই হিন্দু সমাজের অধিনায়কগণ নিকট সম্পর্কিত-দিগের মধ্যে (যাহার সঙ্গে রক্তের নিকট সংস্রব) পরস্পর বিবাহ পদ্ধতি রহিত করিয়াছিলেন।

তৃতীয় বৎসর আদা অথবা ভেন্না (স্থান বিশেষে এরেড়ি বলে)। আদা ও হরিদ্রার সঙ্গে সঙ্গে বাগুন, মরীচ দিলেও ক্ষতি হয় না। আলুর ক্ষেত্র প্রায় বার মাস অর্থাৎ শস্য তুলিয়া নিয়া পতিতাবস্থায় রাখিলেই ভাল হয়। অগত্যা তাহাতে শশা, ঝিঙ্গা এবং নটে ইত্যাদি দেওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয় বৎসর তাহাতে পলাণ্ডু এবং ভাদরিয়া কুমড়া দিতে হয়, তৃতীয় বৎসর মূলা এবং ছিনার দেওয়া যাইতে পারে।

যোগাবাদ অর্থাৎ একত্রে নানাবিধ কৃষি উৎপাদন করা এ সম্বন্ধে নানা প্রকার মত বিভিন্নতা আছে। কেহ বলেন, এক ক্ষেত্র হইতে একত্রে নানা-বিধ কৃষি উৎপাদন করিয়া লইলে সেইভূমির উদ্ভিদ পোষণ পদার্থ একবারে উঠিয়া যায়, তৎপর সেই ক্ষেত্র পতিত ফেলিয়া না রাখিলে আর উৎপাদিকা শক্তি জন্মে না। কেহ বলেন, উদ্ভিদগণ যেমন আপন প্রকৃতি অনুসারে মৃত্তিকা হইতেও রসাকর্ষণ করিয়া আপনার পুষ্টি সাধন করে, তেমন বাহ্য পদার্থ অর্থাৎ জল, বায়ু তাপ হইতেও নানাবিধ পদার্থ আকর্ষণ করিয়া ভূমিতে প্রদান করে, তাহাতেই যোগাবাদে ভূমির উর্ব্বরতা নষ্ট করে না। আমরা এসম্বন্ধে কার্য্যতঃ যাহা দেখিয়াছি তাহাই প্রকাশ করিতেছি। যোগাবাদ নানা দেশে নানা প্রকার। হিন্দুস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে গম, যব, ভুট্টা, দোরি একত্রে চাষ করে, কিন্তু দ্বিতীয় বৎসর তাহারা ক্ষেত্র পতিত ফেলিয়া রাখে না, ক্ষেত্রে গোবর ইত্যাদি সার দেয়। ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে "পুরাতিয়া" বলিয়া এক জাতি আছে, ইহারা কৃষিকার্য্য ভিন্ন অন্য ব্যবসা করে না, কেবল বাসস্থানে বসিয়াই গৃহ প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে কৃষিকার্য্য করে না, দূর দূরান্তর স্থানে গিয়াও ক্ষেত্র মনোনীত করিয়া কৃষিকার্য্য করে। ইহাদের কৃষি ক্ষেত্রে, শাক্ সবজি, তরকারি ইত্যাদি ও প্রায় দেখা যায়, অনেক স্থান চাষ করে না, অনধিক পাঁচ অন্যূন ৩ বিঘা পরিমাণ ক্ষেত্র করে, ক্ষেত্র খানির চতুর্দ্দিকে খাল (স্থান বিশেষে কাঁচা বলে) কাটিয়া কান্দি বান্ধে, কান্দির উপর চতুর্দ্দিকে নানা জাতীয় কলা, ভেন্না, অড়হর লাগায়, তাহার মধ্যে মধ্যে শশা ঝিঙ্গা রেণা (কোন স্থানে ঘোশিঙ্গা বলে)। ক্ষেত্রের মধ্যে আলু, বেগুন, মরীচ, আদা, হরিদ্রা, কাঁরাই, তরমুজ, উচ্ছে, বাজি ইত্যাদি নানাবিধ কৃষি উৎপাদন

করে, সচরাচর প্রায় দুই জন লোকই থাকে, ঐ কৃষি ক্ষেত্রের মধ্যেই ছোট এক খানি ঘর করিয়া বাস করে। সমুদয় কৃষি উঠিয়া গেলে আর সেখানে থাকে না। অথবা পুনর্ব্বার সেই ক্ষেত্র চাস করে না, এই ক্ষেত্র হইতে ন্যূনাধিক চারি শত টাকা উৎপন্ন করিয়া নেয়। ইহা ভিন্ন বাহির বরেও নানাবিধ কৃষি অল্প পরিমাণে জন্মাইয়া থাকে।

পার্ব্বতীয় জাতি দিগের কৃষিপ্রণালী ইহা হইতে ভিন্ন প্রকার। পর্ব্বতের প্রায় নিবীড় অরণ্য দেখিয়া স্থান নির্ব্বাচন করিয়া লয়। ক্ষেত্র নির্ব্বাচন কালে মৃত্তিকা পরীক্ষা করে। এক খণ্ড মৃত্তিকা তুলিয়া লইয়া একটা বৃক্ষের উপর মারে তাহাতে যদি মৃত্তিকাখণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায় তবেই সে ক্ষেত্র উত্তম স্থির করে। এ পরীক্ষা মন্দ নয়। তখন জঙ্গল কাটিয়া শ্রেণীমত ফেলিয়া যায়, জঙ্গল শুষ্ক হইলে অগ্নি দ্বারা পুড়িয়া দেয়। যাহাকিছু অদাহ্য থাকে তাহা চাছিয়া ফেলিয়া দেয়। শেষ নানা বিধ কৃষির বীজ একত্র করে, ধান, তিল, কার্পাস, শশা, ঝিঙ্গা, তরমুজ, বাঙ্গি কিবা, করলা, কুমরা, ভুট্টা, (ভুট্টাকে তাহারা সমধান বলে) চিনা, কাউন ইত্যাদি এক সঙ্গে মিসাইয়া ক্ষেত্রে নেয়। তার পর টাকোয়াল (দায়ের ন্যায় একরূপ অস্ত্র, তাহার অগ্রভাগ সিধা এবং ধারাল) দ্বারায় এক কি দেড় হাত অন্তর একটী একটী স্থান ঘা দিয়া মাটী আল্গা করিয়া তন্মধ্যে ঐ একত্রিত বীজ সকলের একমুষ্টি ধরিয়া (তাহাতে যাহাই উঠে) বপন করে। তার পর উদ্ভিদের প্রকৃতি অনুসারে যথাসময় ফল প্রসব করিতে থাকে যখন যে ফল হয় তখন তাহা তুলিয়া কি কাটিয়া লয়। ঐ ক্ষেত্রেই কচু এবং কচুর মুখীও লাগায়, সে কচু একরূপ ভিন্ন প্রকার। তাহাকে হাতির পারা কচু বলে। হাতির পারা চেপ্টা এবং অঙ্গুলির ন্যায় অগ্রভাগে একটু একটু বর্দ্ধিত থাকে, এই কচু অত্যন্ত সুখাদ্য, গলাধরে না। অন্যান্য কচুর ন্যায় ইহার মধ্যে আঁশ থাকেনা, মধ্যে অত্যন্ত ধবল অতি সহজে সুসিদ্ধ হয়।

কিন্তু ইহারা একস্থানে বারবার কৃষিক্ষেত্র করে না। কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন যে স্থানের অভাব নাই বলিয়াই এইরূপ করে, বস্তুতঃ তাহা নয়, তাহা তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াও জানা গিয়াছে; বলে যে দুই

বৎসর এক স্থানে শস্য ভাল হয় না, নূতন ক্ষেত্র করিতে তাহাদের পরিশ্রমও অধিক না হয় এমন না।

এ সম্বন্ধে আমাদের যে মতামত আছে তাহাতে আমরা বলিতে পারি যে যোগা বাদে অপেক্ষাকৃত ক্ষেত্রের উর্ব্বরা শক্তির খর্ব্ব করে বলিয়াই বোধ হয়, তবে কোন কোন যোগা বাদে উপকার ও আছে। যথা নারিকেল, সুপারির বাগান করিতে হইলে মধ্যে মধ্যে কলাগাছ লাগাইলে বিশেষ উপকার করে, নারিকেল সুপারি গাছ বাল্যাবস্থায় অপেক্ষাকৃত তাপ কম সহ্য করিতে পারে, বিশেষতঃ কলাগাছ পচিয়া উহাদের সারের কার্য্য করে। কোন কোন স্থানে তিল আর আশু ধান্য একত্রে বাইন করাতে ক্ষেত্রের বিশেষ অনিষ্ট করে না। দেখা গিয়াছে বিল অঞ্চলে আশু ধান, আমন ধান একত্রে বাইন করে, সে উভয় একজাতীয় উদ্ভিদ বলিয়া অনিষ্ট করিতে পারে না। আশু ধান পাকিলে আমন ধানের পাতা সহ কাটিয়া নেয়, তাহাতে সেই আমন ধানের কোন অনিষ্ট হয় না।

ক্ষেত্র পরিবর্ত্তনের পর্য্যায় স্থলে যে কয়েকটী কৃষির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহাই যে তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট তাহা নয়। বহুবিধ প্রকার কৃষি, তন্মধ্যে ১০টী ১৫টীর বই নাম উল্লেখ করা হয় নাই। ইহার দ্বারা কেবল একটা সূত্র দেখাইয়া দেওয়া মাত্র। কৃষি-কার্য্যে কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি জন্মিলে এই সূত্র অবলম্বন করিয়া কৃষকেরা নিজের অনুসন্ধানেই অনেক পর্য্যায় নির্ণয় করিয়া লইতে পারেন।

উদ্ভিদ চিকিৎসা।

মনুষ্যাদি প্রাণিদিগেরও যেরূপ নানা বিধ রোগ হয়, উদ্ভিদেরও ঠিক সেইরূপ না হইলেও কতক গুলি রোগ হইতে আমরা দেখিতে পাই। উদ্ভিদের জীবন ফসলের সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন, অদ্যাপি কোন উদ্ভিদতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ তাহা করেন নাই, যে কোন্ জাতীয় উদ্ভিদ কতকাল জীবিত থাকিতে পারে। কোন লোকের এক জীবনে ইহার নির্ণয় করিয়া উঠা সম্ভবপর হইতে পারে না। কেবল মাত্র ঔষধি জাতীয় উদ্ভিদেরই

জীবনের সংখ্যা আমরা দেখিতে পাই। ইহারা একবার ফল প্রসব করিলে আর জীবিত থাকে না। সর্ব্ব জাতীয় উদ্ভিদেরই কাল-মৃত্যু অকাল মৃত্যু দেখিতে পাওয়া যায়। একবারে বার্দ্ধক্যাবস্থায় জরা জীর্ণ হইয়া যে মৃত্যু হয় তাহাই কাল মৃত্যু, অপঘাত এবং দৈবাৎ যে মৃত্যু হয় তাহাই অকাল মৃত্যু। সময় সময় স্থান বিশেষে মনুষ্যাদির যেমন সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে উদ্ভিদেরও কখন কখন তদ্রূপ সংক্রামক রোগ উপস্থিত হয়।

উদ্ভিদের রোগ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল ইহা কবি কল্পনা বলিয়া কেহ মনে করিবেন না, একটু সামান্য অনুসন্ধান করিলেই প্রত্যক্ষতা লাভ করা যাইতে পারে। উদ্ভিদের সর্ব্ব প্রকার রোগের লক্ষণ এবং কারণ কি তাহার নির্ব্বাচনের উপায় ব্যবস্থা করিয়া উঠা আমাদের পক্ষে অতি কঠিন এবং এপর্য্যন্ত আমরা এ সম্বন্ধে কোন গ্রন্থাদি দেখিতে পাই নাই। বিশেষতঃ অতি অল্প কাল যাবতই উদ্ভিদ জগতের সঙ্গে পরিচিত ভাবে এই অল্প কালের মধ্যে অতি সামান্যরূপ যে পর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছি তাহাই প্রকাশ করা যাইতেছে।

মনুষ্যাদিরও মূল দুইটী কারণে রোগের উৎপত্তি হয়, ১। শারীরিক ব্যতিক্রমে, ২। প্রাকৃতিক ব্যতিক্রমে। প্রাকৃতিক ব্যতিক্রমে যাহা ঘটে তাহারই নাম সংক্রামক এবং দৈবায়ত্ত। শুদ্ধ শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করিলেই যে চিরকাল নিরোগী হইয়া থাকিতে পারা যায় তাহা নয়, প্রাকৃতিক ব্যতিক্রমে কি দৈবায়ত্তে যে সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইবে তাহা শারীরিক নিয়ম পালনে রক্ষা হইতে পারে না যথা বসন্ত ওলাউঠা ইত্যাদি উপস্থিত হয়। তবে ঔষধাদি দ্বারা নিবারণ হইতে পারে, কিন্তু শারীরিক নিয়ম পালন করিলেই যে এবম্বিধ রোগ উৎপত্তি হইতে পারিবেনা একথা বলা যাইতে পারে না।

উদ্ভিদের বন্ধ্যাত্তই কৃষকের পক্ষে অধিক অনিষ্টকর। ফল পুষ্পের আশ্বাসে কৃষি-ক্ষেত্র করা, যদি তাহাই না হয় তবে তদপেক্ষা আর অধিক কষ্টের বিষয় কি? স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে গৃহীর পক্ষে যেমন কষ্ট, কৃষি-ক্ষেত্রের বন্ধ্যাত্ব ঘটিলে কৃষকের পক্ষে তৎকালের জন্য তদপেক্ষা অধিক

কৃষ্ট হইয়া থাকে। অবস্থা ভেদে গৃহী তাঁহার অপত্য স্নেহ বৃত্তির তৃপ্তি জন্য দত্তক গ্রহণ করিতে পারে কৃষক সর্ব্ব স্থলে তাহা পারে না কোন কোন স্থানে কৃষকেরাও তাহা করিয়া থাকে। (এস্থলে বৃক্ষাদির কলম করাকেই আমরা কৃষকের দত্তক মনে করি) কিন্তু এতদুভয়ে প্রকৃতি গত ঘোর বৈষম্য।

প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে একাকালিন অত্যন্ত সবলতায়ও বন্ধ্যাত্ব ঘটে এবং অত্যন্ত দুর্ব্বলতায়ও ঘটে। মনুষ্যাদির মধ্যেও আমরা ঠিক এইরূপ দেখিতে পাই।

উদ্ভিদদিগের এই বন্ধ্যাত্ব নিবারণ করার কি দূর করার কোন একটী নির্দ্দিষ্ট সূত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদের জাতি বিশেষে প্রকৃতি বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন করিতে হয়। সবলতা নিবন্ধন কি দুর্ব্বলতা নিবন্ধন ঘটিয়াছে প্রথমত তাহা নির্দ্দেশ করিয়া তাহার উপায় করিতে হয়।

কি কি কারণের দ্বারায় ক্রিয়ার উৎপত্তি হইল অর্থাৎ শরীরস্থ কোন উপাদানের অভাবে বা অসমতায় ক্রিয়াটী উৎপন্ন হইল প্রথমতঃ ইহাই নির্দ্দেশ করা চিকিৎসা শাস্ত্রের একটী মূল নিয়ম। সর্ব্বত্রই এই সূত্রের সমান আবশ্যক।

উদ্ভিদ মূলে (প্রাকৃতিক ঘটনার দ্বারাই হউক কি ব্যবহারের দ্বারাই হউক) অত্যন্ত সার ব্যবহার করিলে সবলতা নিবন্ধন বন্ধ্যাত্ব ঘটে পক্ষান্তরে উদ্ভিদের প্রকৃতি অনুরূপ ক্ষেত্র না হইলে দুর্ব্বলতা নিবন্ধনও বন্ধ্যাত্ব ঘটে। এই উভয় বিধ কারণের সঙ্গেই বায়ু এবং তেজের সম্পর্ক অধিক। যে স্থলে দেখা যায় যে উদ্ভিদের প্রকৃতি অনুসারে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তেজ এবং বায়ু পাইতেছে না প্রথমতঃ সেই বাধা কি প্রতিবন্ধক দূর করিতে হয়। অনেক স্থলে মাত্র এই প্রতিকার দ্বারায়ই ফল লাভ হইয়া থাকে। আমাদের দেশে একটা সাধারণ প্রবাদ আছে যে চন্দ্ররশ্মি দ্বারা উদ্ভিদদিগের প্রসবিনী শক্তি সমুৎপন্ন হয়, এই প্রবাদ বাক্যটির প্রতি আমরা নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারি নাই। তেজ এবং আলোক উদ্ভিদদিগের ফলপুষ্পাদি প্রসবিনী-শক্তির একটী প্রধান উপকরণ সন্দেহ নাই, কিন্তু

কেবল একমাত্র চন্দ্ররশ্মির দ্বারাই এই কার্য্য সম্পাদিত হয় বলিয়া আমরা স্থির করিতে পারি না। এতদ্বারা যে স্থলে কৃত কার্য্য না হওয়া যায়, সে স্থলে উদ্ভিদের আকৃতি অবয়বের দ্বারা যদি দুর্ব্বলতার লক্ষণ প্রতীয়মান হয় তখন তাহার প্রকৃতি অনুসারে প্রয়োগ করিতে হয়, আর যে স্থলে দুর্ব্বলতার লক্ষণ লক্ষিত না হয় সেগুলির জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট সূত্র দেখিতে পাই নাই উদ্ভিদের প্রকৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন করিতে হয়।

এ স্থলে আমাদের দেশের একটী প্রসিদ্ধ প্রবাদের অসত্যতার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। (তাল গাছ তাল না হইয়া জটাকৃতি একরূপ বস্তু হইয়া থাকে তাহাকে বলে জটুয়া তাল গাছ,) এই প্রকার তাল গাছ পুং জাতীয় বলিয়া অর্থাৎ ফল প্রসবিনী শক্তি নাই বলিয়া প্রসিদ্ধ; বোধ হয় অনেকেই এ প্রবাদ শুনিয়া থাকিবেন। এটী নিতান্ত অমূলক কথা, বস্তুতঃ তাল গাছের ইহাও একপ্রকার বন্ধ্যাত্ব অবস্থা। উক্ত বিধ গাছের সেই জটাকৃতি পদার্থ গুলিকে সমূলে কাটিয়া ফেলিয়া গাছের নিম্ন দেশে মৃত্তিকা হইতে এক কি দেড় হাত পরিমাণ উপরি ভাগে বাটুল দ্বারায় একটী ছিদ্র করিতে হয় সেই ছিদ্রটী যেন প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণ হয় কিন্তু একেবারে যাইকটী ভেদ হইয়া না যায়। এইরূপ ছিদ্র করিলে তাহা হইতে এক প্রকার রস নির্গত হইতে থাকে। এইরূপ উপায় অবলম্বন দ্বারা (গাছের বন্ধ্যাত্ব দূর হইয়া) ফল প্রসব করিতে দেখা গিয়াছে।

নারিকেল গাছ বন্ধ্যা হইলে, কার্ত্তিক মাসে কি বৈশাখ মাসে ‡ গাছের মস্তকটী পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। ডগার মূলে যে বল্কলবৎ আবরণ থাকে সেগুলি ফেলিয়া দিতে হয়। সমস্ত ডগাগুলি ছড়িয়া নিম্নাভিমুখী করিয়া দিতে হয়, গাছ মুকুলিত না হওয়া পর্য্যন্ত ডগা সকল নিম্নাভিমুখেই থাকে এই জন্য ডগার অগ্রভাগে কোন ভার পদার্থ বান্ধিয়া রাখিতে হয়, এইরূপ করিবার কারণ এই যে ডগা সকল নিম্নাভিমুখী না হইলে গাছের

‡ যদিও নারিকেল গাছ প্রায় বার মাস ফলিতে দেখা যায় তথাচ এই দুইটী ইহাদের মুকুলিত হইবার সময়।

মস্তককে চাপিয়া রাখে তেজ আলো বায়ু ইত্যাদি তন্মধ্যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রবেশ করিতে পারে না। গাছের নিম্নদেশে মৃত্তিকার উপরিভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিকড়বৎ যে দেখা যায়, গোন মৃত্তিকার দ্বারা তাহা ঢাকিয়া দিলে বৃক্ষ মূলের তাপ এবং বায়ুর গতির আধিক্যতা রহিত করিয়া প্রসবিনী শক্তি উৎপাদন করে।

নারিকেল গাছের আরও একটী উপদ্রব ঘটে। তাহাতেও বন্ধ্যাত্ব ঘটে এবং ক্রমে ক্রমে জীবনী-শক্তির হ্রাস হইয়া গাছ মরিয়াও যায়। কোন কোন নারিকেল গাছের মস্তকে একরকম পোক থাকে (তাহাকে ক্রুচ্‌পোকা বলে) এই পোকায় গাছের মাইজ কাটিয়া দেয় সেই মাইজ বাহির হইলে দেখা যায় যেন কেহ কাইচির দ্বারা ছাটিয়া দিয়াছে। ক্রমাগত এইরূপে মাইজ কাটাতে সমস্ত ডগা খর্ব্বাকৃতি হইয়া পরে, ক্রমে গাছের প্রসবিনী-শক্তি এবং জীবনী শক্তি উভয় রহিত হইতে থাকে। ইহা দূর করিবার তিনটী উপায় আছে। ১। কার্‌বলিক এসিড্ * জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিলে এই পোকা মরিয়া যায়। ২। আক্কেত্রা দিলে মরিয়া যায়। এতদ্ভিন্ন আর একটী উপায় আছে, কতক পরিমাণ গুড়, অল্প পরিমাণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তরল হইলে তাহা গাছের মস্তকে ঢালিয়া দিতে হয়, এরূপ ভাবে দিতে হয় যেন গাছ বাহিয়া ধারা মৃত্তিকায় পরে তাহাতে পিপীলিকা সকল ক্রমে ক্রমে গাছের মস্তকে উঠিতে থাকে, যে রন্ধ্রমধ্যে পোকা সকল থাকে গুড় মিশ্রিত জল তথায় যায় পিপীলিকা সকলও গুড়ের লোভে রন্ধ্রমধ্যে প্রবেশ করিয়া রন্ধ্রস্থিত পোকাসকলকে দংশন করিতে থাকে তাহাতে পোকা মরিয়া যায়। গুড় নিঃশেষিত হইলে পিপিলিকাও বহির্গত হইয়া চলিয়া যায়। এই তিনটী নিয়মকে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে।

শাখা পল্লবাদি বিশিষ্ট বৃক্ষ জাতীয়ের বন্ধ্যাত্ব ঘটিলে, সেই জাতীয় অপরাপর বৃক্ষ সকলের ফল যখন পাকে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহার অব্যবহিত কাল পরে (অর্থাৎ আষাঢ় মাসে যে সকল বৃক্ষের ফল পাকে

---

* প্রায় সর্ব্বপ্রকার কৃষিক্ষেত্রে পোকা ধরিলেই তন্নিবারণার্থে কার্‌বলিক এসিড্ ব্যবহার করা যায়।

সেই জাতীয় বৃক্ষের শ্রাবণ মাসে) ছোট ছোট শাখা এবং পল্লবাদি তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা কাটিয়া দিতে হয়। কার্ত্তিক মাসে (যে সকল বৃক্ষ অগ্রহায়ণ মাসেই মুকুলিত হয় তাহাদের আশ্বিন মাসে অর্থাৎ বৃক্ষের প্রকৃতি বুঝিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে) বৃক্ষ মূলের চতুঃস্পার্শ্বস্থ মৃত্তিকা সকল খনন করিয়া তুলিয়া শিকড় সকল বাহির করিয়া দিতে হয়, কেবল মাত্র কএকটী বৃহৎ শিকড় বাহির করিয়া দিলে হয় না ছোট ছোট শিকড় গুলিকে ও কোমল অগ্রভাগ বাহির করিয়া দিতে হয়। উদ্ভিদের প্রকৃতি এবং অবস্থা (সবলতা) অনুসারে ন্যূনাধিক এক সপ্তাহ কাল এই ভাবে রাখিতে হয়। তৎপর বৃক্ষমূলের খনিত স্থান জল দ্বারায় পূর্ণ করিয়া দিতে হয়, সপ্তাহ কালের মধ্যে যত বার জল শুষ্ক হইয়া যায় ততবার তাহা পূর্ণ করিয়া দেওয়া উচিত। পরে ঐ জল শুষ্ক হইয়া গেলে অন্য স্থান হইতে নূতন মৃত্তিকা আনিয়া খনিত স্থান সকল উত্তমরূপে পূর্ণ করিয়া দিতে হয়। কাঁঠাল গাছের পক্ষে আরও একটু ভিন্ন নিয়ম আছে, এই কার্য্য শেষ হইয়া গেলে, খর বন দ্বারা কি চাটাই ইত্যাদি দ্বারা বৃক্ষটীকে কএক দিন (ক্ষুদ্র শাখা পল্লব ভিন্ন) সমুদয় আবৃত করিয়া দিতে হয়, * এতদ্ভিন্ন আরও একটী নিয়ম যাহা পূর্ব্বে প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ করা হইয়াছে। এইরূপ উপায় অবলম্বন করিলে বৃক্ষের প্রসবিনী শক্তি উৎপন্ন হয়। বন্ধ্যা ভিন্ন প্রসবিনী শক্তিবিশিষ্ট বৃক্ষের জন্যেও এইরূপ নিয়ম অবলম্বন করা বিধেয়। তাহাতে বৃক্ষের জীবনীশক্তি, প্রসবিনীশক্তি, উভয়েরই আধিক্য হয় এবং জীবনের নূতন শক্তি প্রদান করে, বৃক্ষাদির পক্ষে এই উপায় অবলম্বন করা সাধারণ নিয়ম।

এতদ্দ্বারা যদি বন্ধ্যাত্ব দূরীকৃত না হয় তবে একটী লৌহশলাকা বৃক্ষের অভ্যন্তরে এরূপ ভাবে প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়, যে বৃক্ষের অর্দ্ধেক পরিমাণ ভেদ হইয়া বৃক্ষের মধ্যস্থ মাইজে তাহা স্পর্শ করে, কিন্তু একবারে ভেদ হইয়া না যায়। তাহা হইলেই অত্যাধিক সবলতা দূর হইয়া বৃক্ষ ফলবতী হইতে থাকে।

---

* প্রবাদ আছে—শীতোত্তম বর্ষার জল
প্রচুর কাল কণ্টকী ফল।

লতিকাদি জাতীয়ের পক্ষে এইরূপ বিধান করিতে হয়, মূলদেশের মৃত্তিকা হইতে অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণ উপরিভাগে এক খানা ছুরিকা দ্বারায় বিদীর্ণ করিয়া, এক খানি চাড়া (হাড়ি ইত্যাদি ভাঙ্গা) কি এক খণ্ড বাঁশের চটি দিয়া রাখিতে হয় লতিকার মধ্যদেশ বিদীর্ণ করিয়া দিলে তাহা হইতে কতকগুলি কস ঝড়িতে থাকে, কিন্তু বিদারিত ভাগের মধ্যে কিছু না দিয়া রাখিলে পুনরায় মিশ্রিত হইয়া যায় তাহা হইলে আর চিকিৎসার কোন কোন ফল দর্শে না. এভিন্ন লতিকার পল্লবাদি কর্ত্তন করিয়া দিতে হয়।

ওষধি জাতীয় উদ্ভিদ ক্ষেত্রের একবারে বন্ধ্যাত্ব দোষ প্রায় ঘটে না, তবে ফলের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে, এই ন্যূনাধিক্য কৃষি শাস্ত্রের ব্যতিক্রম আচরণেই অধিকাংশ ঘটে, এবং প্রাকৃতিক ব্যতিক্রমে ঘটনা হয় (অর্থাৎ অতি বৃষ্টি অনাবৃষ্টির দ্বারা ঘটে. কি কৃষির অবস্থা বিশেষে বায়ুর প্রবলতা ঘটে। (ধান্য ক্ষেত্রের গর্ব্ভাবস্থায় যদি প্রবল বায়ুতে গাছ সকল ভূমিসাৎ হয় তবে গর্ব্ভস্থ ফল আর প্রসবিত হয় না অথবা কেবল গর্ব্ভ হইতে নির্গত হইলে যদি এরূপ ঘটে তবে সেই কালের অভ্যন্তরে শস্য জন্মে না) কিন্তু এসকল ঘটনা ক্ষেত্রবিশেষে অথবা ব্যক্তি বিশেষের ভাগ্যক্রমে ঘটে না। আমাদের সামান্য জ্ঞানের এসকল ঘটনা নিবারণের উপায় দেখিতে পাই না। এসকল ঘটনা ভিন্নও ফলের ন্যূনাতিরেক হয়, ক্ষেত্রের সবলতা নিবন্ধন, দ্বিতীয়তঃ বীজ অধিক বপন করিলে ক্ষীণতা নিবন্ধন। প্রথম কারণে ঘটিলে * ক্ষেত্রস্থ কৃষির অগ্রভাগ কাটিয়া ফেলিতে হয়, দ্বিতীয় কারণে ঘটিলে বিদারক (কৃষিযন্ত্র বিশেষ, কোন স্থানে আচড়া বলে,) দ্বারায় ক্ষেত্রস্থ কৃষির যৌবনাবস্থার পূর্ব্ব সময়েই পাতলা করিয়া দিতে হয়। ইহাতে যেমন ঘনতা দূর হয়, তেমন অন্যবিধ অকর্ম্মণ্য জঙ্গলাদিও পরিস্কার হয়। কোন কোন অবস্থায় কাইস্তা (কোন দেশে কাঁচি বলে) দ্বারায়ও নিরাইয়া দিয়া থাকে। কিন্তু স্থান বিশেষে বিদা

* সাধারণ কৃষকেরা তাহাকে ডাকিয়া যাওয়া অথবা স্থান বিশেষে দামাইয়া যাওয়া বলে।

ব্যবহার করা আবশ্যক এবং উপকারক, তাহা কৃষিযন্ত্র ব্যবহারের ফলে বিশেষরূপ প্রকাশ করা যাইতেছে।

দুর্ব্বলতা নিবন্ধন যে বন্ধ্যাত্ব ঘটে তাহাতে ক্ষেত্রের অবস্থা এবং কৃষির প্রকৃতি বুঝিয়া সার প্রয়োগই তাহার চিকিৎসা।

উদ্ভিদ দিগের আর এক প্রকার রোগ, পোকা ধরা, এই পোকা ধরা কয়েক কারণে উপস্থিত হয়, ইহা এক প্রকার দৈবায়ত্ত। কৃষি ক্ষেত্রের সংক্রামক রোগ বিশেষ যখন উপস্থিত হয় তখন মাত্র দুই এক খানি ক্ষেত্রকে নষ্ট করিয়া যায় না, মাঠকে মাঠ, নষ্ট করিয়া ফেলে। এমন কি ইহা উপস্থিত হইলে ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে এক এক খানি ক্ষেত্রকে নষ্ট করিয়া ফেলে। বৃষ্টি না হইয়া মেঘাড়ম্বর করিয়া থাকিলেই এইরূপ পোকের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহা নিবারণের কোন উপায় আমরা নির্দ্ধারণ করিতে পারি নাই। এতদ্ভিন্নও পোকা হইতে দেখা যায়, তাহা কোন কোন লতা গুল্মের স্বভাবতঃ তাহাতে পোকা ধরে। দ্বিতীয় অপরিপক্ক গোবরের সার ব্যবহার করাতেও কৃষি ক্ষেত্রে পোকা ধরিয়া থাকে। এই সকল পোকা নষ্ট করিবার জন্য কেহ কেহ ছলফিউরিক এসিড ব্যবহার করিতে মত দিয়া থাকেন, তাহাতে উপকার হইলেও আমরা ব্যয় সাধ্য বলিয়া সে পরামর্শ দেই না। ঘুঁটিয়ার ভস্ম দিলেই উপকার হইতে পারে, অথবা উদ্ভিদের প্রকৃতি বিশেষে কাষ্ঠের ভস্মেও উপকার হয়। যথা আলুর ক্ষেত্রে কাষ্ঠের ভস্ম ব্যবহার করিলে পোকা ধরে না, অথবা যদি ক্ষেত্রে ভস্ম ব্যবহার করা না হইয়া থাকে, তবে পোকা ধরিলেও ঐ ভস্ম ক্ষেত্রে দিলে পোকা নিবারণ হয়।

আমরা কতকগুলি কারণের দ্বারা অনুমান করি যে মনুষ্যাদিরও যেমন শিরা ধমনি ইত্যাদি আছে। উদ্ভিদগণেরও সেইরূপ শিরা ইত্যাদি আছে, মনুষ্যাদির যেমন কোন এক অঙ্গের শিরা দ্বারা কোন কারণে রক্তের গতিশক্তি রোধ হইলে সেই অঙ্গে একটী রোগের উৎপত্তি হইয়া স্থূলতা, শুষ্কতা কি অবশতা ঘটিয়া পড়ে অথচ তাহাতে সহসা একবারে জীবনীশক্তি রহিত করে না,—উদ্ভিদদিগেরও সেইরূপ ঘটিয়া থাকে। কোন একটী সবল সুশ্রী বৃক্ষ তাহার কোন একখানি শাখা শুষ্ক

হইয়া গিয়াছে কি যাইতেছে, কি কোন একটী বৃক্ষের কোন এক শাখায় একটী স্থলে যেন একটী ব্রণ ইত্যাদির ন্যায় বোধ হয়, অথচ বৃক্ষের জীবনী শক্তির সহসা এতদ্দ্বারা অনিষ্ট ঘটিতেছে না যখন একাংশের স্থূলতা বা শুষ্কতা ঘটে তখন শিরা থাকা সিদ্ধান্ত করা কোন মতেই অসঙ্গত বোধ হয় না। যে শাখার শিরার দ্বারা কোন কারণে রস আকর্ষণী শক্তি রোধ হইয়া পড়ে তখনই তাহা শুষ্ক হইতে থাকে। যখন কোন বৃক্ষ শাখায় এইরূপ অবস্থা দেখা যায় তখনই অর্থাৎ একবারে শুষ্ক নীরস হইবার পূর্ব্বেই তাহা ছেদন করিয়া দেওয়া উচিত, তাহা না করিলে ঐ শাখার নিকট সম্বন্ধ বিশিষ্ট কি সংস্পৃষ্ট শাখাকেও ক্রমে ঐরূপ অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে * যে অংশে স্থূলতা ঘটে তাহা একবারে ছেদন না করিয়া সেই স্থূল স্থানে কতক পরিমাণ কাটিয়া দিলে অপরাংশের অনিষ্ট ঘটিতে পারে না, এই সকল প্রকরণ উদ্ভিদদিগের অস্ত্র চিকিৎসা বিশেষ।

মনুষ্যাদি ক্রমান্বয়ে স্থূল কায় হইতে থাকিলে চিকিৎসা শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ তাহাকে মেদরোগ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। উদ্ভিদদিগের মধ্যেও মেদরোগ ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্বে প্রসঙ্গ ক্রমে যে ৮ হস্ত পরিসর কলাগাছ কি দেড় হস্ত পরিসর, কুমড়া গাছের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাকেও আমরা মেদ রোগ ব্যাখ্যা করি।

সময় সময় কোন বৃক্ষাদির অকস্মাৎ অকাল মৃত্যু দেখিতে পাওয়া যায়, কোন প্রকার বিষাক্ত পদার্থের সংস্পর্শে বা সংস্পৃষ্টে ঘটনা হয় বলিয়া আমরা অনুমান করি। সকল প্রকার বিষাক্ত পদার্থই যেমন সকল প্রাণীর পক্ষে সম ফল দায়ক হয় না। উদ্ভিদদিগের পক্ষেও সেইরূপ, যে জাতীয় বৃক্ষের জন্য যাহা বিষাক্ত এবং তাহার যে পরিমাণ সংযোগে তাহার জীবনী শক্তি নষ্ট হইতে পারে, সেই জাতীয় সেই পরিমাণে ঘটিলেই তাহার মৃত্যু হয়। বায়ু যোগে, জল যোগে এবং ভূমধ্যস্থ পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে বিষের উৎপত্তি হয় এবং কোন কোন বিষ প্রায় সর্ব্বপ্রকার প্রাণিরই প্রাণঘাতক উদ্ভিদের মধ্যে সেইরূপ। কোন

---

* প্রতি বৎসর বৃক্ষশাখা ছাটিয়া দেওয়াতে বৃক্ষের এরোগ ঘটিতে পারে না।

একটি বৃক্ষের কতকটা স্থান খনন করিয়া (বৃক্ষের অবস্থা এবং প্রকৃতি অনুসারে) কতক পরিমাণ ক্ষারযুক্ত বৃক্ষের মজ্জা স্পর্শ করাইয়া দিলে অনধিক সপ্তাহ কালের মধ্যে মরিয়া যাইবে। ইহা প্রায় সর্ব্ব প্রকার উদ্ভিদেরই প্রাণনাশক পদার্থ। সর্ব্ব প্রকার বিষাক্ত পদার্থই যে, সকল প্রকার বৃক্ষের পক্ষে সম ফলদায়ক না, তাহার একটী অত্যাশ্চর্য্য দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতেছে। অত্যন্ত কণ্টকাকীর্ণ দুরারোহ শিমুল বৃক্ষ হইতে তুলা পাড়িবার সহজ উপায় নাই। শিমুলের ফল সকল পড়িবার উপযুক্ত সময় হইলে, বৃক্ষের নিম্ন ভাগের কতকটা স্থান বাটালী দ্বারা খনন করিয়া (বৃক্ষের অবস্থানুসারে) অনধিক এক তোলা পরিমাণ বিশুদ্ধ হিঙ্গু বৃক্ষের মজ্জা স্পর্শ করিয়া দিয়া কতকটা জল দিয়া পুনরায় বন্ধ করিয়া দিতে হয় অর্থাৎ খনন করা কালে যে সকল কাঠ কুটা বাহির হয় তাহাই দিয়া উপরে কতকটা কর্দ্দম দ্বারা বন্ধ করিয়া দিতে হয়, যেন ঐ স্থানে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে এই ভাবে রাখিলে পর দিবস প্রাতে গিয়া দেখিবে যে বৃক্ষস্থ সমুদয় ফল তলায় পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই প্রাতঃকাল সময়েই ঐ হিঙ্গ নির্গত করিয়া পুনরায় জল দ্বারায় সেই স্থান ভালরূপ ধৌত করিয়া ফেলিতে হয় যে তাহাতে আর হিঙ্গের স্পর্শ না থাকে। হিঙ্গ ফেলিয়া না দিলে বৃক্ষটী অচিরাৎ মরিয়া যাইবে। কিন্তু এই হিঙ্গ একটী তেঁতুল গাছে কি তাল গাছে এই ভাবে দিলে তাহার বিষাক্ত শক্তিতে তেঁতুল অথবা তাল পড়িয়া যায় না।

এই প্রস্তাবে একটী তর্ক উপস্থিত হইতে পারে যে, যে স্থলে একটী বাগানে সমুদয়ই একজাতীয় বৃক্ষ। অতি নিকটবর্ত্তী রহিয়াছে তাহার মধ্যের একটী মরে কেন? আমাদের চক্ষে এখন পর্য্যন্ত এরূপ ঘটনা পড়ে নাই সুতরাং আমরা তাহার বিশেষ কারণ অনুসন্ধান করি নাই। তবে সাধারণতঃ এ তর্কের মীমাংসা এইরূপে করা যাইতে পারে। আধুনিক চিকিৎসাবিদ্ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন "ওলাউঠা রোগ কেবল শারীরিক নিয়ম পালনের ব্যতিক্রমে ঘটে না। এক প্রকার বিষাক্ত বায়ুর সংস্পর্শে উপজাত হয়" মনে করুন এক গৃহে পাঁচ জন লোক বাস করিতেছি কি শয়ন করিয়া আছে ইহার মধ্যে একজনের ওলাউঠা উপস্থিত হয়। এই

বিষাক্ত বায়ু যদি মাত্র একজনের শরীরে প্রবেশ করিতে পারে তবে রাসায়নিক সংযোগে বিষের উৎপত্তি হইয়া যে ক্ষেত্রস্থ একটী উদ্ভিদের প্রাণনাশ করিবে তাহা অসঙ্গত হইতে পারে না।

এই অকস্মাৎ মৃত্যুর প্রতি পূর্ব্ব হইতে সুক্ষ্ম দৃষ্টি থাকিলে রক্ষা করা যাইতে পারে। এক বার এক দিনেই বৃক্ষটীর সম্পূর্ণরূপ মৃত্যু ঘটে না, দুই তিন দিবস পূর্ব্ব হইতে বৃক্ষের পত্রাদির প্রফুল্লভাব দূর হইয়া রুগ্ন ব্যক্তির ন্যায় সংকুচিত ভাব ধারণ করে। তারপর ক্রমে ক্রমে পত্রগুলি শুষ্ক হইতে থাকে, যখন বৃক্ষের সংকোচিত ভাবের লক্ষণ লক্ষিত হইতে থাকে তখনই তাহার মূলদেশের মৃত্তিকা সকল খনন করিয়া দূরীকৃত করিতে হয়। (প্রকৃতি অনুসারে) পরিষ্কার জল দিতে হয়, বায়ু প্রবেশ করাইতে হয়, পরে পুনরায় ভিন্নস্থান হইতে মৃত্তিকা আনিয়া সার সংযোগে খাত স্থান পূর্ণ করিতে হয় তাহা হইলেই, মৃত্যু হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে। কিন্তু পত্রশুষ্ক হইয়া গলিত হইতে আরম্ভ হইলে আর চিকিৎসায় কোন ফল হইতে পারে না। যথা সর্প দংষ্ট ব্যক্তির কেশ আদি উৎপাটিত হইলে যেমন চিকিৎসায় অসাধ্য হইয়া পড়ে। প্রতি বৎসর বৃক্ষমূলের মৃত্তিকা খনন করিয়া নূতন মৃত্তিকা দিলে প্রায় বৃক্ষাদির এরূপ আকস্মিক মৃত্যু হয় না।

যে সকল উদ্ভিদের ফল, পুষ্প, কি মূল বড় করিবার ইচ্ছা থাকে তাহাদের শাখা প্রশাখা অত্যন্ত বৃদ্ধিশীল হইতে দেওয়া উচিত না, এবং অধিক পরিমাণ ফল পুষ্প হওয়াও নিবারণ করিতে হয়, পুষ্পের কুসুম এবং ফলের গুটি হইলেই তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। শাখা প্রশাখাদি সবিস্তার এবং বর্দ্ধিত হইলে ফল পুষ্পাদিতে অধিক রস পায় না, তাহাতেই বড় হইতে পারে না। ফল পুষ্প অধিক হইতে দিলে কখনই তাহাতে বড় হওয়ার আশা করা যাইতে পারে না বরং শাখা প্রশাখাদির বর্দ্ধিত অবস্থা অপেক্ষা ফল পুষ্পের অধিকতর বড় হওয়ার পক্ষে অধিক অনিষ্টকর, এই সূত্রানুসারে ফল বড় বড় করিতে হইলে তাহার মূল হইতে ডেম্ উঠিতে দেওয়া উচিত না। ইক্ষুদণ্ড বড় করিতে হইলে তাহার মূল হইতে অন্য কোড় উঠিতে দেওয়া উচিত না।

একটী ছাগির বা কুকুরের অনেকটী ছানা হইলে তাহা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে সবল করিতে হইলে মাত্র এক একটী রাখিয়া দিতে হয়, তাহার কারণ যে মাতৃদুগ্ধ অধিক পান করিয়া সবল হইতে থাকে। উদ্ভিদের ফল পুষ্পেও তাহাদের প্রসূতির শরিরের রস পান করিয়া সবলতা ধারণ করে, বরং পশ্বাদিরা অতি অল্পকাল মাতৃস্তন পান করিয়া শেষ আপনারাই আপনাদের আহার অন্বেষণ করিয়া লয়। ফল পুষ্প সকল বৃক্ষরস ভিন্ন অন্যস্থান হইতে আহরণ করিতে পারে না, পক্ব সময় পর্য্যন্তই প্রসূতির শরীরের সুরস আকর্ষণ করিতে থাকে। সুতরাং ফল পুষ্পের আধিক্যতায় তাহাদের আকার বড় হওয়ার পক্ষে অধিক অনিষ্ট করে।

বীজ সংগ্রহ।

কৃষি কার্য্যের জন্য ক্ষেত্র এবং বীজ এই দুটীই যে প্রধান উপাদান একথা কেহকে বুঝাইবার জন্য যত্ন করিতে হইবে না। এতদুভয়ের মধ্যে যে তারতম্য আছে তাহা ক্ষেত্র নির্ব্বাচন অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে কিন্তু তারতম্য থাকিলেও বীজের উত্তমতা আবশ্যক। অধিক উপযোগী অধিক ফলদায়ক সহজ যত্নে ও উৎকর্ষতা লাভ করে, একথা অবশ্য স্বীকার্য্য।

উদ্ভিদের প্রকৃতি অনুসারে বীজ ও নানা রূপ। বীজ বলিলে কেবল ফল অথবা ফলের আভ্যন্তরিক বৈজিক পদার্থ বুঝাইবে না। যে বস্তু যদ্দারায় উৎপাদিত হয় সেই তাহার বীজ। উদ্ভিদ,শাখাতে জন্মে, ফলেতে জন্মে, ফলের অভ্যান্তরস্থ বিচীতে জন্মে, মূলে জন্মে, এবং কোন কোন উদ্ভিদ পত্রেতেও জন্মে। উদ্ভিদ উৎপাদক বৈজীক শক্তি বিশিষ্ট যত প্রকার বস্তুর উল্লেখ করা হইল তাহার অন্যান্য প্রকার প্রায় অনেকেই অবগত আছেন অথবা স্থানান্তরে ক্রমে তাহা প্রকাশ করা যাইবে। পত্রেতে যে উদ্ভিদ জন্মে ইহা অনেকেই অবগত থাকিতে পারেন, সেই কৌতুহল নিবারণ জন্য মাত্র এস্থলে তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে। পাথর চুনার (কোন স্থানে পাথরকুচি বলে) পাতাতেই গাছ জন্মে।

যে সকল উদ্ভিদের ফল কি ফলের আভ্যন্তরিক বিচী বীজরূপে ব্যবহৃত হয় সে সমস্ত অপরিপক্কাবস্থায় নিতান্তই ব্যবহারের অনোপযোগী। বিশেষতঃ বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদের বীজ সংগ্রহ করিতে হইলে প্রাচীন বৃক্ষ হইতে সংগ্রহ করা উচিত। অনুসন্ধানের দ্বারা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে নারিকেল এবং সুপারির যত বড় গাছের ফল বীজরূপে ব্যবহার করা যায়, গাছ তত পরিমাণ হইলেই মরিয়া যায়। * বীজ সংগ্রহ কালে যদি আর একটী বিষয় সতর্কতা অবলম্বন করা যায় তবে অনেক উপকার হয়। যে ক্ষেত্রস্থিত উদ্ভিদ হইতে বীজ সংগ্রহ করা যায় সেই ক্ষেত্রস্থ মৃত্তিকা কিরূপ, তাহাতে কোন্ কোন্ উৎপাদন কি পরিমাণ আছে তাহা জানিয়া রাখিয়া বীজ বপন কালে তদনুরূপ উপাদান বিশিষ্ট ক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিলে আর কোন আশঙ্কাই থাকে না। এই জন্য কৃষকেরা আপন ক্ষেত্রের সংগৃহীত বীজ ভিন্ন অজ্ঞাত অপরিচিত ক্ষেত্রেরবীজ প্রায় পার্য্যমানে ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক হয় না। অনেক সময় অনেক বৈদেশিক বীজও ব্যবহার করিতে হয় বটে, কিন্তু তাহার ক্ষেত্রের গুণাগুণও নির্ব্বাচিত আছে। সুতরাং তাহা অপরিচিত না। বৈদেশিক বীজ ব্যবহার করিতে হইলে, বীজ সংগ্রহ সময়েই তাহার ক্ষেত্রের গুণাগুণও জানা আবশ্যক। যাঁহারা ততদূর অনুসন্ধান না করিয়া কি না জানিয়া ব্যবহারে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা প্রায়ই অকৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। যে সকল বীজ হইতে প্রথমতঃ চারা উৎপন্ন করিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়, তৎসমুদায়ের প্রতি এরূপ দৃষ্টি রাখা নিতান্তই আবশ্যক যে, যেরূপ ক্ষেত্রে চারা রোপণ করিতে হইবে তদ্রূপ উপাদানবিশিষ্ট স্থানে যেন চারা করা হয়। গাছের যে ফল প্রথম হয় অথবা প্রথম পাকে, তাহাই বীজের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত।

নারিকেল আশ্বিন মাসেও ঝুনা হয়, বৈশাখ মাসেও ঝুনা হয়, আশ্বিন মাসের ঝুনা অপেক্ষা বৈশাখ মাসের ঝুনা নারিকেল বীজের জন্য অধিক উপযোগী। নারিকেল, গাছে থাকিতেও তাহা হইতে গজ (অঙ্কুর) বাহির হয়। সেই চারা পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম কিন্তু তাহা সচরাচর অধিক পরিমাণ

---

* এই সকল সূত্রেই বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধের এক প্রধান কারণ।

পাওয়া যায় না। বৈশাখ মাসের ঝুনা নারিকেল পাড়িয়া তাহার বোঁঠার নিকটের খোসাটা ফেলিয়া দিতে হয়, তাহাতে গজ শীঘ্র বাহির হয় এবং সিধা হইয়া উঠে, যে নারিকেলের গজ বক্রভাবে ছোবরা ভেদ করিয়া নির্গত হয় সে চারা সবল এবং দীর্ঘজীবী হয় না।

সুপারী ভাদ্র মাস হইতে পাকিতে আরম্ভ হইয়া পৌষ মাস পর্য্যন্ত পাকিতে থা ক, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কার্ত্তিক মাসের পাকা সুপারী বীজের জন্য উত্তম ব্যবস্থা। সুগোল সুপারী বীজের জন্য অধিক উপযোগী সু রী চারা করিবার নিয়ম নানাপ্রকার। সর্ব্বাপেক্ষা এইটীই উত্তম। দেড় কি এক হস্ত পরিমাণ মৃত্তিকা খনন করিয়া (সুপারীর অর্থাৎ বীজের পরিমাণ অনুসারে দীর্ঘপ্রস্থ করিয়া) তন্মধ্যে একটী একটী করিয়া সুপারীর বোট উপরিভাগে রাখিয়া সারি দিয়া সাজাইতে হয়, তদুপরে মাটিতে বালিতে একত্রিত করিয়া চারি অঙ্গুলি পরিমাণ সেই মাটি দিতে হয় পুনরায় তদুপরি পূর্ব্ববিধরূপে সাজাইতে হয়। কিন্তু একটু সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয় যেন, পূর্ব্বটীর সমসূত্রে পরেরটী স্থাপিত না হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে স্তরে স্তরে মৃত্তিকা এবং সুপারী সাজাইয়া রাখিতে হয়। এক একটী গর্ত্তে চারি পাঁচটী স্তরের অধিক দেওয়া উচিত না। মধ্যে মধ্যে সেই স্থানে গরুর মূত্র এবং জল একত্রে মিশ্রিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। অনধিক দুই মাসের মধ্যে সুপারীর অঙ্কুর বাহির হয়, সর্ব্বউপরিস্থ স্তরের চারা উঠিলেই জানিবে যে সকল সুপারীরই চারা বাহি হইয়াছে। তখন অতি উত্তম চূর্ণীকৃত মৃত্তিকার সার মিশ্রিত করিয়া ঐ চারা সকল অর্দ্ধহস্ত পরিমাণ ব্যবধানে রোপণ করিতে হয়। আবশ্যকমতে মধ্যে মধ্যে জল দিতে হয়। এইরূপে দুই তিন মাস অতিত হইলে পুনরায় স্থানান্তরে রোপণ করিতে হয়। শেষ আষাঢ় মাসে বৃষ্টির আধিক্য সময়ে বাগানে রোপণ করিতে হয় পুনঃপুনঃ নাড়িয়া লাগাইলে সুপার গাছ শীঘ্র ফলে প্রবাদ আছে। সাত নাড়াতে গুয়া কাঁঠাল নাড়ায় ভুয়া। সুপা র গাছের আর একটী পরীক্ষা আছে, সুপারীর চারা উদ্গম হইলে, প্রথমতঃ তাহার মূলস্থ সুপারী হইতে যে কএকটী শিকড় নির্গত হইয়াছে, সেই গাছে, সেই কএক ছড়া করিয়া সুপারী

হইবে। গাছের বিশেষ কোন বিঘ্ন ভিন্ন এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে না।

কাঁঠাল, গাছে সুপক্ক হইলে, তাহা হইতে বীজ সংগ্রহ করিতে হয়, সুপক্ক হইলে প্রায় অধিকাংশস্থলে কাঁঠালের মধ্যেই বীজ সকল অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। অন্যান্য সকল বীজই উত্তমরূপ শুষ্ক না হইলে বপন নিষিদ্ধ, কিন্তু কাঁঠালের বীজ সম্বন্ধে সে বিধি না। কাঁঠালের বীজ শুষ্ক হইলে তাহা একবারে বীজের অযোগ্য হইয়া যায়। কাঁঠালের মধ্যে যতগুলিন বিচী থাকে সকলগুলিকই বীজের উপযোগী না। প্রথমতঃ কাঁঠালের বোটের নিকটস্থ কোয়াতে যে বিচী থাকে তাহাই বীজের জন্য নির্ব্বাচন করিতে হয়। তন্মধ্যেও প্রভেদ আছে,যেসকল বিচী একটু চেপ্টাকৃতি সেই গুলিক বীজের জন্য উত্তম। সাধারণতঃ ঐপ্রকার বিচী, মেদী অর্থাৎ স্ত্রীজাতি বলে. অপরগুলিককে নর অর্থাৎ পুরুষজাতি বলে। এই বীজ নির্ব্বাচনের ক্রটিতে বৃক্ষ অগ্র পশ্চাৎ ফলিত হইয়া থাকে, কাঁঠালের বীজ যেখানে বপন করিতে হয় তথা হইতে স্থানান্তর বিধেয় না তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আর একটী প্রকরণ আছে, একটী গাছপাকা কাঁঠাল লইয়া, তাহার মধ্যের মাইজ অথবা সাপটী টানিয়া নির্গত করিয়া ফেলিয়া আস্তা কাঁঠালটী একটী গর্ত্তের মধ্যে স্থাপন করিয়া মৃত্তিকা চাপা দিয়া রাখিতে হয়। তাহা হইতে একবারে অনেকগুলিক অঙ্কুর জড়িত হইয়া বহির্গত হয় দুইএকটী বিচ্ছিন্নভাবে উঠিলেও তাহাকে কোমল অবস্থা থাকিতেই অপরগুলিকের সহিত জড়িত করিয়া দিতে হয়, এইরূপ গাছে অনেক ফল হয়, এইরূপ গাছকে হাজারী গাছ বলে। কাঁঠালগাছের কলম করিলে তাহাতে ভাল হয় না ভুয়া হইয়া যায়।

অম্র—ইহার বীজ অন্য কোনরূপ ব্যবহারে আসে না, সুতরাং অম্র খাইয়া যদৃচ্ছা ইহা ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং অতি অযত্নে তাহা হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হয়। কতক অম্র সংযোগে ইহার বীজ বপন করিলে ভাল হয়। অম্রের বীজোৎপন্ন বৃক্ষও যে চারি বৎসরে ফল ধরে তাহার প্রকরণাদি কৃষিতত্ত্বের সংখ্যা পাঠ করিলে অবগত হইতে পারিবেন।

আলু, ইহার মধ্যেও নর, মাদী, নির্ব্বাচিত হইয়াছে সকল আলু

লাগাইলে সম পরিমাণে ফল লাভ করা যায় না। যে সকল আলু দেখিতে দীর্ঘাকৃতি, তাহাই বীজের উপযোগী এবং সেই গুলিই মেদী অর্থাৎ স্ত্রীজাতীয় বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। কেহ কেহ অখণ্ড আলু বীজরূপে ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন। কেহ বা খণ্ড খণ্ড করিয়া রোপণের বিধি দিয়াছেন। আমরা এই উভয় প্রকারেরই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, খণ্ডকৃত বীজে ফসল কম হয়, তাহার আর অন্য কোন কারণ নাই। একটী অখণ্ড আলুতে যতগুলি চোক থাকে, খণ্ডীকৃত আলুতে তত থাকে না। কিন্তু আলুর যত গুলি চোক থাকে ততটী অঙ্কুর উৎপাদিত হয়। সুতরাং চোক অধিক থাকিলে তাহাহইতে বহুসংখ্যক অঙ্কুর নির্গত হইয়া একবারে একটী গোছা বান্ধিয়া গাছ বাহির হইয়া ফসল অধিক অধিক হয়। এভিন্ন অখণ্ড বীজের আলুও অপেক্ষাকৃত বড় হয়। অত্যন্ত পরিপক্ক আলু এবং একবারে অপরিপক্ক আলু উভয়ই বীজের অনুপযোগী। অর্থাৎ সর্ব্ব প্রথমে যে আলু উঠে তাহাও বীজের জন্য রাখিতে হয় না এবং একেবারে শেষ তোলা আলুও রাখিতে হয় না মধ্যম তোলার আলুর বীজ রাখা কর্ত্তব্য।

মূলা—ক্ষেত্রস্থ মূলার সাধারণতঃ যে দানা হয়, তাহাতে ভাল বীজ হয় না। মূলার যে অংশ ক্ষেত্রস্থ মৃত্তিকার উপরে থাকে সেই অংশ কাটিয়া ভিন্ন স্থানে পুনরায় রোপণ করিয়া রাখিতে হয়, তাহা হইতে যে দানা জন্মে সেই সকল দানাই বীজের উপযোগী। মূলার উৎকর্ষের জন্য আর এক প্রকার বীজ প্রস্তুত করিতে হয়। পূর্ব্বোক্তরূপ মৃত্তিকার উপরিস্থিত অংশ কাটিয়া, এক খানি চাকুর দ্বারা তাহার মধ্যের শাস গুলি খুলিয়া দুই দিকে দুইটী সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া সূত্র দ্বারা লট্‌কাইয়া মধ্যের খোল, জল দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিতে হয়। কিন্তু এমন স্থানে লট্‌কাইতে হয় যে বায়ু, আলোক এবং অল্প পরিমাণ তাপাংশও লাগিতে পারে। এজন্য ঘরের চালের ছাইচেই সাধারণতঃ লট্‌কানও হয়। এই ভাবে কিছু দিন থাকিলে তাহা হইতে ফুল এবং ফল হয়, সেই ফলের বীজ সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। অন্যান্য প্রকার প্রায় সকল বীজ নূতন লাগান ভাল। কেবল আমেরিকান শসা আর মূলার বীজ পুরাতন না হইলে ভাল হয় না।

এজন্য ভাল কৃষকেরা মূলার বীজ চারি পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত ঘরে রাখিয়া পরিশেষে তাহা বীজরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে।

হরিদ্রা—ইহার বীজের ব্যবহার সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। হরিদ্রা খণ্ড খণ্ড করিয়া বপন করিলেও গাছ হয়, কিন্তু তাহার নীচে অতি সামান্য পরিমাণ হলুদ পাওয়া যায়। এমন কি যে পরিমাণ বপন করা হয় তৎপরিমাণ হয় কি না সন্দেহ। আস্ত-হরিদ্রা বপন করিলে তাহার প্রতি চোক হইতেই এক একটী অঙ্কুর নির্গত হইয়া এক একটী ছোপা হইয়া থাকে। হরিদ্রা গাছের সঙ্গে যে কতকটা মূল থাকে, ("হরিদ্রা এবং মূল" এ উভয়ের একটু বিভিন্নতা আছে। মূল হইতে শিকড়বৎ যে অংশ নির্গত হয় তাহাই হরিদ্রা নামে খ্যাত এবং ব্যবহার্য্য) গাছের সহিত মূলটী রাখিয়া গাছের অগ্রভাগ কাটিয়া ফেলিতে হয়, শেষ তাহাই বীজরূপে ক্ষেত্রে বপন করা হয়। অখণ্ড হলুদ লাগান অপেক্ষা এই প্রকার বীজ লাগানে কৃষকের লাভ আছে কেননা ইহাতে বীজের মূল্য অধিক পড়ে না। হলুদ দুই তিন বৎসর ক্ষেত্রে রাখিলে যে অপেক্ষাকৃত অধিক হয়, সে পূর্ব্ব বৎসরের সঞ্চিত হলুদ থাকে না। কেবল হলুদ কেন, হলুদ, আদা, শটি ওল ইত্যাদি। অর্থাৎ যে সকল মূলিয় পদার্থের গাছ শীত ঋতুর প্রারম্ভ হইতে শুষ্ক হইতে থাকে, তাহাদিগের মূল মৃত্তিকাভ্যন্তরে থাকায় তাহা প্রতি বৎসরই পচিয়া যায়, কেবল তাহার বীজাংশ মাত্র অবশিষ্ট থাকে তাহা হইতে পুনরায় গাছ জন্মে। তবে যে অপেক্ষাকৃত অধিক কি বড় হয় তাহার কারণ, যে অংশ পচিয়া যায় তাহাতেও বীজাংশ থাকে সুতরাং গাছের ছোপা বান্ধে এবং যে অংশ পচিয়া যায় তাহাতে গাছের পুষ্টিকর সারের কার্য্য করে। যাহারা ওলের আকৃতি বড় করিতে ইচ্ছুক হয়, তাহারা প্রতি বৎসর গাছ মরিয়া গেলে কি মরিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ওল তুলিয়া রাখে, পর বৎসর বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে পুনরায় সেই ওল লাগায়। এইরূপে ক্রমে তিন চারি বৎসর লাগাইয়া থাকে। পোনর ষোল সের ওজনের ওলও দেখা গিয়াছে। আদা এবং হরিদ্রাও প্রতি বৎসর তুলিয়া রাখা উচিত। ক্ষেত্রে থাকাতে বিশেষ ফল নাই।

পেয়াজ—ইহা নানাপ্রকার; তন্মধ্যে সচরাচর আমরা দুই প্রকার

দেখিতে পাই, ছোট পেয়াজ আর বড় পেয়াজ। উভয়ই এক পদার্থ গুণ এবং আকৃতিতেও অধিক বৈষম্য নাই, কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে বৈজিক শক্তির বিভিন্নতা রহিয়াছে। ছোট পেয়াজ,—ইহার পেয়াজ লাগাইলেই গাছ জন্মিয়া নিম্নভাগ পেয়াজ হইয়া থাকে। কিন্তু বড় পেয়াজ লাগাইলে গাছ হয় বটে, কিন্তু তাহাতে মূলে পেয়াজ হয় না। বড় পেয়াজের দানা বীজরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। প্রথমতঃ কোন এক স্থানে বীজ দ্বারা চারা করিতে হয়,আর অঙ্কুর উৎপাদিত হইলে তাহা ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়।

মানকচু—একটী কচুগাছের গোড়ায় দশটী বারটী ছোট ছোট চারা হইয়া থাকে, তাহাই বীজরূপে ব্যবহৃত হয়, স্থানবিশেষে ইহা একপ্রকার বহুমূল্য বস্তু,—এমন কি কৃষকেরা এই বীজ সংগ্রহের জন্য দিনমানের পথ পর্য্যন্ত যাইয়া থাকে। তাহারা অনভিজ্ঞতাবশতঃ এইরূপ ব্যয় এবং পরিশ্রম স্বীকার করে। অন্যূন দুই বিঘা ক্ষেত্রের উপযোগী বীজ একটী মানকচু হইতে উৎপাদন করা যায়। একটী মানকচু তুলিয়া একখানি অস্ত্র দ্বারা তাহার গাত্রস্থ শিকড়গুলিক চাছিয়া লইতে হয়। কতকটা স্থানের মৃত্তিকা অত্যন্ত চূর্ণ ও শিথিল করিয়া কতকপরিমাণ ছাই মিশ্রিত করিতে হয়, তাহার মধ্যে সংগৃহীত শিকড়গুলিকে ছড়াইয়া হস্ত দ্বারা মৃত্তিকাটা সমান করিয়া দিতে হয়। ঐ সকল শিকড় হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য চারা উৎপন্ন হয়। শিকড়ের প্রায় প্রত্যেক অংশেই একএকটী চারা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কলা—ইহা নানা জাতীয়, বৈজিক অবৈজিক দুইপ্রকারই আছে, কিন্তু যাহার মধ্যে বিচি আছে তাহারও বিচি বীজরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না। কলাগাছের মূল হইতে যে সকল ডেম উঠে, তাহাই বীজরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। এই স্থলে আমরা একটী আশ্চর্য্য ঘটনার পরিচয় দিতেছি। কলার মধ্যে সবরিকলা অবৈজিক বলিয়াই খ্যাত। এই সবরিকলা বীজরূপে ব্যবহার করিয়া তাহা হইতে গাছ উৎপাদন করা যাইতে পারে। সবরিকলার মধ্যে যে একটী শাঁস থাকে সেটী অপেক্ষাকৃত একটু শক্ত, তাহার গাত্রে কাল কাল বিন্দুর ন্যায়

লক্ষিত হয়, কলা ছাড়াইয়া সেই পদার্থটীকে বাহির করিতে হয়। অনন্তর উহা ধানের কাঁচা খড়ের গায়ে লেপিয়া একটু রৌদ্রে দিতে হয়। পরে প্রায় কানিছাকা মতন কতক চূর্ণ মৃত্তিকা ঐ খড়ের নীচে দিতে হয় এবং কতকপরিমাণ অতি সাবধানে ঐ খড়ের উপর ছড়াইয়া দিতে হয়। তাহার উপরে কতকপরিমাণ উচ্চ করিয়া একটী ছায়া [illegible] হয়, রাত্রে ছায়া ফেলিয়া দিতে হয় যেন, পর্য্যাপ্তপরিমাণে শিশির এবং বায়ু লাগিতে পারে। মধ্যে মধ্যে জল দিতে হয়, কিন্তু জল দেওয়া অতি সাবধানতার আবশ্যক। জল এমনভাবে দিতে হয় যেন, শিশিরবিন্দুর ন্যায় পতিত হয়। ইহা হইতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্কুর উৎপাদিত হয়, সে অঙ্কুর সকল দুর্ব্বাদির অঙ্কুর অপেক্ষাও ক্ষুদ্র এবং কোমল। ক্রমে ঐ সকল বড় হইয়া তাহার জাতীয় আকৃতি ধারণ করিতে থাকে। এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তৎকালে স্থানান্তর করিয়া রোপণ করিতে হয়, এই গাছে উত্তম কলা জন্মে।

ইক্ষু——জাতিবিশেষে, স্থানবিশেষে কার্ত্তিক হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ইহার বীজ সংগৃহীত হয়, যখনই কাটিবার উপযুক্ত সময় হয়, তখনই ইহার অগ্রভাগ বীজের জন্য রক্ষিত হয়। স্থানবিশেষে ব্যবহারের লক্ষণ ভিন্নপ্রকার। কোন কোন স্থানে, ইক্ষুর অগ্রভাগের যে স্থানে চোক আছে, তিনটী অথবা চারিটী চোক রাখিয়া এক এক খণ্ড করে, একখানি ইক্ষুতে এইরূপে তিনখানি খণ্ড বাহির করে, পুতিয়া দেয়, তাহা হইতেই গাছ জন্মে। কোন কোন স্থানে ইক্ষুর অগ্রভাগটী কাটিয়া ছায়াবিশিষ্ট কর্দ্দমিত স্থানে পুতিয়া রাখে; পরে তাহার প্রত্যেক চোক হইতেই একএকটী গাছ বাহির হয়। শেষে সুধার অস্ত্র দ্বারায় সেই ইক্ষুর গাঁটটী মধ্যে রাখিয়া দুইদিকের পাকের মধ্যে কাটিয়া একএকটী গাছ পৃথক করিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করে। পূর্ব্বোক্তপ্রকার অপেক্ষা শেষোক্তপ্রকার প্রণালীই অধিক উপযোগী, প্রথমোক্তপ্রকারে সকল স্থানে গাছ ভাল হয়না।

ধান, যব, গম, তিল, সরিষা, তিসি, মুগ, মসুর, খেসারি, মটর, ছোলা ইত্যাদি ওষধি জাতীয় উদ্ভিদের বীজ ইহাদের সম্বন্ধে অধিক বলা অনাবশ্যক মনে করিয়াছি। ইহাদিগের ব্যবহারপ্রণালীতে প্রায় বিভিন্নতা

পুষ্ট হয় না। সাধারণতঃ প্রায় সকলেই ইহার ব্যবহার জানেন অথবা দেখিয়া থাকেন। যিনি এপর্য্যন্তও অনভিজ্ঞ, তাঁহার পক্ষে প্রথমতঃ পল্লি-গ্রামের কৃষকদিগের নিকট থাকিয়া কৃষিশাস্ত্রের ক, খ, শিক্ষা করা উচিত। বীজের সাধারণ নিয়ম সমূহে যাহা বলা হইয়াছে, এতজ্জন্য বীজের জন্য সেই সাধারণ সূত্র স্মরণ রাখিলেই হইতে পারে। ক্ষেত্রের সুপক্ক, এবং ক্ষেত্রস্থ শস্যের উত্তমাংশ, সর্ব্বাগ্রে বীজের জন্য রাখা কৃষকের নিতান্ত কর্ত্তব্য।

বীজ সংরক্ষণ সম্বন্ধে মহর্ষি পরাশর কয়েকটী বিধি করিয়াছেন তাঁহার মতে গোশালাতে, রন্ধন গৃহে ও সূতিকাগারে, শস্যের বীজ রাখা নিষিদ্ধ। এবং গর্ব্ভিণী, নব-প্রসূতি, রজস্বলা, বন্ধ্যা ও অশুচি ব্যক্তিকে বীজ স্পর্শ করিতে দেওয়া অকর্ত্তব্য। বৃহস্পতি, শুক্র ও সোম, এই তিন বারে বীজ বপন প্রসিদ্ধ।

নানা জাতীয় বীজ অতি উত্তমরূপে পরিশুষ্ক করিয়া রাখিতে হয় বীজের রস উত্তমরূপ পরিশুষ্ক না হইলে তন্মধ্যে কীট জন্মিয়া বীজ সকল অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। যে সকল ফলের আভ্যন্তরীণ বীজ রাখিতে হয় (যথা লাউ, কুমড়, শসা, ঝিঙ্গা, বেগুন ইত্যাদি) সেই সকল জাতীয় উদ্ভিদের গাছে প্রথম যে ফল হয়, তাহা পরিপুষ্ট হইলে তাহাই বীজরূপে রাখিতে হয় এবং যতদিন গাছ জীবিত থাকে বীজ ততদিন গাছেই রাখা আবশ্যক। তৎপর তাহা হইতে বীজ বাহির করিয়া উত্তমরূপে ধৌত করণান্তর শুখাইয়া রাখিতে হয়। মিষ্ট-কুমড়ার বীজ না ধুইয়া ছাই মাখিয়া রৌদ্রে দিতে হয়, ধৌত করিলে সেই বীজোৎপন্ন গাছের ফল মিষ্ট হয় না। বেগুনের বীজও ধৌত করিলে তদুৎপন্ন বেগুন সুস্বাদু হয় না। ইউরোপীয় কৃষকেরা কাচ নির্ম্মিত পাত্রে বীজ রাখিয়া উত্তমরূপ বন্ধ করিয়া রাখে যে, তন্মধ্যে কোন প্রকার কীটাদি প্রবেশ করিতে না পারে। বস্তুতঃ এরূপ যত্নের সহিত রক্ষা না করিলে বীজ কখনই ভাল থাকে না। একই ক্ষেত্র-উৎপন্ন বীজ হইতে পুনঃ পুনঃ শস্যোৎপাদন করিলে ক্রমে তাহা নিস্তেজ হইয়া যায়। এজন্য সময় সময়, ভিন্ন স্থান হইতে উত্তম বীজ সংগ্রহ করিয়া ক্ষেত্রে বপন করা বিধেয়। ইউরোপীয়

কৃষকেরা সর্ব্বদাই তদ্রূপ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। আমাদের দেশে বীজের অযত্নেও দিন দিন কৃষিসকল নিস্তেজ হইয়া যাইতেছে, কৃষকেরা তৎপ্রতি মনোযোগ করে না অথবা তাহার অনুসন্ধান অতি অল্পই করিয়া থাকে।

১। এস্থলে সর্ব্বপ্রকার উদ্ভিদ বীজের বিশেষ বিবৃতি প্রকাশ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। অথবা আমরা সর্ব্বপ্রকার বীজের তত্ত্বজ্ঞতা লাভ করিতে পারিযাছি একথাও বলিতে পারি না। সাধারণতঃ কৃষির ব্যাবহারোপযোগী বীজ সম্বন্ধে যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তত্তাবতের বিশেষ বিবৃতি প্রকাশ করিতে হইলে কেবল বীজ সম্বন্ধেই একখানি গ্রন্থ হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ তত্তাবতের বিশেষ বিবৃতি প্রকাশ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়াও বোধ হইতেছে না। বিশেষ বিশেষ লক্ষণালক্ষণ দ্বারা যাহার উৎকৃষ্টতা নিকৃষ্টতা ঘটে, কি যাহার ব্যবহার সম্বন্ধে মত বিভিন্নতা দেখা গিয়াছে, অথবা সাধারণ ব্যবহার প্রণালী হইতে ভিন্ন প্রণালীতে যাহা উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে, এস্থলে তৎসম্বন্ধে কিয়ৎপরিমাণে সংক্ষেপ আলোচনা উদ্দেশ্য।

বীজ সম্বন্ধে আরও একটী সতর্কতা নিতে হয়। যে ক্ষেত্রে কখনও সার দেওয়া হয় নাই, সেই ক্ষেত্রের বীজ আনিয়া যদি প্রথমতই, প্রণালী অনুসারে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ সার দিয়া ক্ষেত্রে বপন করা যায়, তবে তাহাতে ভাল ফল ফলে না, তাহাকে ক্রমে উপযোগী করিতে হয় অর্থাৎ প্রথম বৎসর অল্প, তৎপর বৎসর তদপেক্ষা কিছু বেশী ইত্যাদি প্রকার ৩।৪ বৎসরে উহাকে উপযোগী করিয়া লইতে হয়। মনুষ্যাদির মধ্যেও ইহার অনেক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা নানারূপ কদর্য্য আহার করে, তাহাকে একবারে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ঘৃতপক্ক মাংসাদি খাওয়াইলে উপকার না হইয়া অপকার হয়। ক্রমে অভ্যাস আবশ্যক।

পশু পালন।

কৃষি কার্য্যে ব্যবহারের জন্য তদুপযোগী পশু একটী প্রধান অবলম্বন। অন্যান্য দেশের কৃষকেরা ধনী, জ্ঞানী, বিদ্বান এবং তাঁহাদের কৃষিকার্য্যের জন্য অতি ব্যাপক স্থান, প্রশস্ত ক্ষেত্র ইত্যাদি নানাবিধ সুবিধা থাকায় তাঁহারা সময় সময় বাষ্পীয় যন্ত্রযোগেও অনেক কার্য্য করিয়া থাকেন। তথাপি তাঁহারাও কৃষিকার্য্যের জন্য পশুর আবশ্যকতা স্বীকার করেন। ব্যবহার করেন এবং বিশেষ মনোযোগের সহিত পশু পালনের যত্ন-চেষ্টার ব্যবস্থা করেন। আমাদের দেশের কৃষকেরা তেমন ধনী, জ্ঞানী, বিদ্বান নহে এবং তেমন প্রশস্ত স্থান ব্যাপিয়া কেহ কৃষিকার্য্য করেও না, করিতে পারেও না, সুতরাং আমাদের দেশের কৃষি-কার্য্যের জন্য পশু একটি প্রধান অবলম্বন, কেবল প্রধান অবলম্বন কেন, একমাত্র পশুর উপরেই নির্ভর করে। কাযেই আমাদের দেশের কৃষকের পক্ষে কৃষি কার্য্যের উপযোগী পশুদিগের লালন পালনে অধিক যত্ন অধিক চেষ্টাকরা কর্ত্তব্য।

ধর্ম্মশাস্ত্রে বিধি আছে সকল জীবের প্রতি সমভাবে দয়া রাখা উচিত। নীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়য়াছেন যদ্দ্বারা উপকার লাভ করা যায়, তাহার নিকট প্রত্যুপকার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত। ব্যবসায়ীর নিকট সকল সময়েও ধর্ম্মশাস্ত্র নীতিশাস্ত্রের উপদেশ ভাল বোধ না হইতে পারে। তাঁহারা যে স্বার্থ-শাস্ত্রে দীক্ষিত, আমরা সেই স্বার্থ শাস্ত্রানুসারে তাঁহা-দিগকে পরামর্শ দিতেছি, যে কৃষিকার্য্যের ব্যবহারোপযোগী পশুপালনে যে যত্ন চেষ্টা করিতে হয়, সে কেবল ধর্ম্মশাস্ত্র নীতিশাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে নয়, স্বার্থপরতানুসারে। যাহারা স্বার্থপরতন্ত্র হইয়াও এবংবিধ পশুর উন্নতি ত্রুটি করেন তাঁহাদের মনে স্বার্থের ভাব মাত্র আছে, ব্যবহার করিতে জানেন না। পশুদিগকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার নাদিলে, উচিতরূপ যত্ন না করিলে তাহারা উপযুক্তরূপ পরিশ্রম করিয়া তাঁহার কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে কেন? বিশেষতঃ পশুরা যে আহার করে, সেও কৃষকের অপব্যয় না। পশুর মল মূত্র দ্বারা কৃষকের মহৎ উপকার সাধিত হয়। পশুর খোরাকে যে ব্যয় পড়ে, তাহার মল মূত্রের সারে সে মূল্যের বড়

ন্যূন হয় না। বনের ঘাস খাওয়াইয়া যদ্দ্বারা এতদর্থে লাভ করা যায় উহাও যাহারা করিতে ইচ্ছুক না হয়, তাহারা কি ধর্ম্মশাস্ত্র কি নীতি শাস্ত্র কি স্বার্থ শাস্ত্র সর্ব্ব শাস্ত্রের বহির্ভূত।

প্রাচীন ঋষি মহাত্মা পরাশর তাঁহার কৃষিসংহিতায় পশুপালন সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আত্মবৎ ব্যক্তিকে পশুপালন কার্য্যে নিযুক্ত করিবে। তাহার কারণ এই যে পশুর দ্বারা যাহার স্বার্থ নাই তদ্রূপ লোকের প্রতি তাহার পালনের ভার দিলে কখনই তাহা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয় না। তিনি আরও কতকগুলি ব্যবস্থা করিয়াছেন। গোশালায় কাঁসার পাত্র, কার্পাসের বীজ, ভস্মখণ্ড, মাচ ও কাঁসার পাত্র ধোয়া জল, তুঁষ, সম্মার্জ্জনী মুষল ও উচ্ছিষ্ট দ্রব্য রাখিলে এবং ছাগ বন্ধন করিলে গোরুর অনিষ্ট হয়। বর্ত্তমান সময়ে এসকল কথা অনেকের নিকট উপহাসের হইতে পারে, বস্তুত ইহা উপহাসের বিষয় নয়, বৈজ্ঞানিক যুক্তি না থাকিলেও এসকল যে অনেক বহুদর্শিতা লাভের ফল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কোন বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত এখনও এই সূত্র অবলম্বন করিয়া চিন্তা এবং অনুসন্ধান করিলে যে বৈজ্ঞানিক যুক্তির একেবারে অভাব হইবে এ কথা আমরা মনে করিতে পারি না।

আমাদের দেশে কৃষিকার্য্যের জন্য গরু এবং মহিষ এই দুইপ্রকার পশুই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে ঘোড়াও ব্যবহৃত হয়। আমরা মহিষ অপেক্ষাও ঘোড়ার উপকারিতা অধিক দেখিতে পাই, ঘোড়া অপেক্ষা মহিষ পরিশ্রমী কম। বিশেষতঃ একটু রৌদ্রের আধিক্য হইলে আর কোন মতেই তাহাকে নিবারণ করিয়া রাখা যায় না। দ্বিতীয়তঃ ঘোড়া অপেক্ষা মহিষে অধিক আহার করে সুতরাং উহার পালনে কষ্ট। তৃতীয়তঃ মহিষের মল মূত্রে সারের কার্য্য করে না, ঘোড়ার মল মূত্র অতি উত্তম সার।

আমাদের দেশের সাধারণতঃ হাল চাষের প্রণালী, দুইটী গরু দুইটী মহিষ না হইলে এক খানি হাল চাষ করা যায় না, আমিরা একটী ঘোড়া, একটী মহিষ দ্বারাই এক এক খানি চাষ করিয়াছি। বলবান্ গরু হইলে

একটী গরুর দ্বারাও এক খানি হাল চাস করা যাইতে পারে। কিরূপ যন্ত্রযোগে এইরূপ একটী পশুর দ্বারা হাল চাষ করা যাইতে পারে, তাহা কৃষিযন্ত্র অধ্যায়ে বিবৃত করা যাইতেছে।

কৃষিকার্য্যে ঘোড়ার ব্যবহার আমরা নিতান্ত সুব্যবস্থা মনে করি। তাহাতে যে কৃষকের ব্যয়াধিক্য হয় তাহাও নয়। অত্যন্ত মূল্যবান ঘোড়ায় আবশ্যক হয় না, সাধারণতঃ ছেকড়া গাড়িতে যে সকল ঘোড়ার ব্যবহার হইয়া থাকে, তদ্রূপ ঘোড়া হইলেই চাসকার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে। তদ্রূপ এক একটী ঘোড়ার মূল্য ১৫ কি ২০ টাকা। একটী ঘোড়াতেই এক খানি হাল চলিতে পারে। বোধ হয় এতদপেক্ষা অল্প মূল্যের গরু কি মহিষ দ্বারা কেহই চাস করিয়া থাকেন না, অথবা করিতে পারে না।

এখন এই সকল পশুদিগের পালন সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে। গ্রীষ্মাদি ঋতুর সময় পশুদিগকে প্রত্যূষে স্নান করাইয়া মল মূত্রাদি যাহা গাত্রে লাগে তাহা পরিষ্কৃত এবং মার্জ্জিত করিয়া দিতে হয়। তৎপর হালে যুড়িতে হয়, বিশেষ আবশ্যক ভিন্ন দেড় প্রহরের অধিক কাল চাস করিতে হয় না। কার্য্যান্তে কিছুকাল ছায়াতে বান্ধিয়া রাখিয়া আহারীয় বস্তু দিতে হয়। কিঞ্চিত কাল এইভাবে বিশ্রামান্তে পুনরায় স্নান করাইয়া দিতে হয়। স্নানান্তে রক্ষকের জিম্বায় দিয়া মাঠে চরাইয়া ঘাষ খাওয়াইতে হয়। সন্ধ্যার সময় তাহাদের বাসা গৃহে বান্ধিয়া এক একটীর গামলায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহারীয় বস্তু দিয়া রাখিতে হয়। যে সকল স্থানে মশা সাধারণতঃ কম থাকে সে সকল স্থানেও পশুগৃহের নিকট তাহাদের মল মূত্রাদি দ্বারা মশার উৎপত্তি হইয়া পশুদিগের প্রতি অত্যন্ত উপদ্রব করে। এজন্য পশুদিগের বাসগৃহে সন্ধ্যার সময় একটী ধুমার সাজাল করিয়া দিতে হয়। তাহা হইলে রাত্রিতে সুখে নিদ্রা যাইতে পারে।* অনেক অনভিজ্ঞ কৃষকেরা হাল যুড়িয়াই গরু জলে

---

* শীতকালে পশুগৃহ রাত্রে অগ্নিকুণ্ড করিয়া দেওয়া উচিত নচেৎ পশুগণ শীতে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এই জন্যই শীত ঋতুতে পশু হীনপ্রভ এবং রোগাক্রান্ত হইতে দেখা যায়, অন্যান্য দেশের কৃষকেরা

নামাইয়া দেয়, কেবল গরু কেন তাহারা নিজেরাও সঙ্গে সঙ্গে উত্তপ্ত শরীরে জলে নামিয়া স্নান করে। উত্তপ্তাবস্থায় জলে নামিলে উপকার না হইয়া অ নষ্ট হয় তাহা তাহারা জানে না। পশুদিগকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াই বাস গৃহের মল মূত্রাদি উত্তম রূপে পরিষ্কৃত করিয়া দেওয়া উচিত। পশুদিগের ও ঘৃণা আছে, দুর্গন্ধ বোধ আছে, আহারীয় দ্রব্যে মল মূত্রাদি মিশ্রিত হইলে আর তাহা ভক্ষণ করে না। গাভি বৎস একত্রে মাঠে ছাড়িয়া দিলে বৎসে দুগ্ধ খাইয়া ফেলে, এই জন্য গাভির স্তনে গোময় মাখিয়া দেয় তাহাতে বৎস আর মাতৃ-স্তনের নিকটে যায় না। অতি অদৃশ্য ভাবেও যদি মল মূত্রাদি আহারীয় বস্তুর সহিত মিশ্রিত থাকে তবে ঘ্রাণের দ্বারাই তাহা বুঝিতে পারিয়া পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যায়। ইহার দ্বারা নিশ্চয়ই অনুমান করা যাইতে পারে, যে গৃহ অপরিষ্কৃত থাকিলে দুর্গন্ধে ঘৃণায় পশুগণ নিতান্ত অসুখে বাস করে। উপায় হীন বলিয়া বাধ্য হইয়া থাকে। তজ্জন্য প্রভুর তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। পশু পালনের ভার অন্যের প্রতি ন্যস্ত থাকিলেও তৎপ্রতি প্রভুর সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। প্রতি দিন প্রাতে এবং সায়ংকালে পশুশালা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে হয়। সর্ব্বদা লালন পালন এবং যত্ন করাতে পশুর প্রতিও প্রভুর স্নেহ জন্মে, পশুরও প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে, পশুদিগের যদি নামাঙ্কিত করিয়া রাখা যায় তবে যখন যেটীর নাম নিয়া ডাক দেওয়া যায় তখনেই সে নিকটে আসে, একটু আদরের ভাব দেখিলে নিকটে আসিয়া হাত চাটে, গাত্র লেহন করে, কণ্ডুয়ান করিবার জন্য গলা খানি এগিয়া দেয়। আবার একটু উগ্রভাব দেখিলে একটু দূরে থাকিয়া অত্যন্ত সশঙ্কিত ভাব ধারণ করে।

পশুদিগের সময়ে সময়ে রোগ উপস্থিত হয়, তৎকালে তাহাদের চিকিৎসা এবং বিশেষ শুশ্রূষা করা আবশ্যক পশুদিগের চিকিৎসার জন্য

শীতের সময় পশুদিগের গাত্রে ছালার চট অথবা কম্বল দিয়া থাকে এ দরিদ্র দেশের পক্ষে সে ব্যবস্থা করিতে আমাদের সাহস হয় না। শীত ঋতুর সময় গরুর শৃঙ্গে এবং মেরুদণ্ডে কিঞ্চিত তৈল দিয়া দিলে তাহাদের শীত কম হয়।

পৃথক ব্যবস্থা আছে, কৃষকের পক্ষে তাহাও কতক জানা আবশ্যক, 'পশু চিকিৎসা' নামক এক খানি গ্রন্থ আছে তাহা পাঠ করিলেই জানা যাইতে পারে।

কৃষক যে কএকটী পশু, কৃষিকার্য্যে ব্যবহার করিয়া থাকেন, (অর্থাৎ যদি তিনি চারিটী পশুর দ্বারা দুইখানি হালে চাস করেন কি চারি খানি হালে চাস করেন, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ পশু রাখা উচিত ব্যবস্থা। অন্ততঃ অর্দ্ধাংশ পরিমাণ (চারিটীর স্থলে ছয়টী) রাখা নিতান্তই আবশ্যক অতিরিক্ত অংশের দ্বারা বিশ্রাম করাইতে হয়। অতিরিক্ত অংশ যে অনাবশ্যক কি তদ্দ্বারা কোন উপকার হয় না তাহা মনে করিবেন না। অতিরিক্ত পরিশ্রম দ্বারা ক্লান্ত হইয়া পড়িলে ক্রমে গতিশক্তি কমিয়া যায়, নিরুপায় বলিয়া তখন অপার্য্যমানে চলিতে থাকে, তখন কৃষক এবং পশু উভয়েরই বিরক্ত হইতে হয়। এই অবস্থার সময় দুই ঘণ্টায় কৃষক যত পরিমাণ চাস করিতে পারিবে অপর দুইটী অক্লান্ত অশ্রান্ত পশুর দ্বারা এক ঘণ্টায় তত পরিমাণ চাস করিতে পারিবে, এবং কৃষককেও অধিক বিরক্ত হইতে হইবে না। অতিরিক্ত পশু রাখা কৃষকের পক্ষে অনাবশ্যক কি অপব্যয় বলা যাইতে পারে না ইহাতে কৃষকের লাভ আছে এবং তাহার ব্যবহারীয় পশুও সুখে থাকে।

আমাদের দেশের গ্রাম্য পশুদিগের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। দিন দিনই হীনপ্রভ দুর্ব্বল এবং অল্পায়ু হইয়া পড়িতেছে, একমাত্র অযত্নই ইহার মূল। এখনও চেষ্টা করিলে অনেক উৎকর্ষতা এবং উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে। উত্তম বীজে জন্মিলে যে সন্তান উত্তম হইবে একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না, অনেক বিজ্ঞ লোকেরা পশুদিগের সম্বন্ধে পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, বৎসের—আকার, গঠন, বল, বর্ণ এবং লোম পিতার ন্যায়, অপর গুণ এবং স্বভাব মাতার ন্যায় হইয়া থাকে। অন্ততঃ যদি এক এক গ্রামের কৃষক একত্রিত হইয়া এক একটী উত্তম সবল ষাঁড় আনিয়া রাখেন এবং তদ্দ্বারা আপনাদের পালিত পশুর সন্তান উৎপাদন করিয়া লন, এবং পূর্ব্বোক্তরূপ যত্ন চেষ্টা করেন তবে ক্রমে আমাদের দেশের পশুর ও হীনাবস্থা দূর হইয়া ক্রমে সবল শরীর দীর্ঘ কায়

এবং দীর্ঘ জীবী হইতে পারে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মধ্য বিভাগের চিপ কমিসনর সাহেব পশুদিগের উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিশেষ যত্ন চেষ্টা করিতেছেন, তজ্জন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র।

পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে পশুপালন একটী গুরুতর ব্রত ছিল, অনেক মুনি ঋষিগণ পশু পালন করিতেন, অনেক রাজার গৃহে অসংখ্য পরিমাণ পশু পালিত হইত, এবং সময় সময় তাঁহারা দানও করিতেন, অদ্যাপিও আমাদের দেশে গোসেবা একটী প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া অনেকে গোসেবা করিয়া থাকেন।

গো, অশ্ব প্রভৃতি দানেও অত্যন্ত পুণ্য বলিয়া বিশ্বাস আছে এই সকল পুণ্যের কি ধর্ম্মের যদি অন্য কোন অর্থ থাকে থাকুক, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু আমরা ইহাতে স্বার্থের ভাবই অধিক দেখি, সঙ্গে সঙ্গে কৃতজ্ঞতাও কথঞ্চিত থাকিতে পারে। যত্ন চেষ্টার দ্বারা পশুর উন্নতি কি উৎকর্ষতা সাধিত হইলে, কি সুখশান্তিতে থাকিলে, সে তাহার পরকালের জন্য ধর্ম্ম উপার্জ্জন করে না, অথবা সামাজিক উন্নতির চেষ্টা করে না, কিম্বা পরিণামের সুখের জন্য আহারাদি সঞ্চয় করিয়া রাখে না। আজীবন মনুষ্যের খাটনা খাটিতে থাকে, মনুষ্যের উপকারার্থে জীবন ব্যয়িত করে। এমন পশুর প্রতি যত্ন না করা ঘোর মূর্খতা এবং অকৃতজ্ঞতা।

কৃষকের পক্ষে পশুর ঘাসের জন্য প্রতিবৎসর কতকপরিমাণে ভূমি পতিত ফেলিয়া রাখা উচিত, তাহা পর্য্যায়ক্রমে পতিত রাখিতে হয়। প্রথম বৎসর যে সকল স্থান পতিত রাখা হইল দ্বিতীয় বৎসর তাহা চাস করিয়া অন্য ভূমি পতিত রাখিতে হয়। এইরূপ পতিত রাখাতেও কৃষকের উপকার আছে। পূর্ব্ববৎসরের পতিত ক্ষেত্র পর বৎসর কর্ষণ করিলে; তাহাতে অধিক ফসল পাওয়া যায়। ইহার গুণাগুণ ক্ষেত্র-নির্ব্বাচন অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে। বিশেষতঃ পশুর আহারীয় অন্বেষণে যে সময় ব্যয়িত হয় কি ক্রয় করিতে মূল্য লাগে; তাহা অপেক্ষাকৃত কমিয়া যায়।

কৃষিযন্ত্র।

মনুষ্য একমাত্র জ্ঞানবলে বলীয়ান। একজন রাজনৈতিক পণ্ডিত বলিয়া ছিলেন, যে একটী কামানের বল দ্বারা না হয় একখানি গ্রাম বা নগর নষ্ট হইতে পারে, কিন্তু একটী মনুষ্যের জ্ঞানবল দ্বারা একটী রাজার রাজ্য নষ্ট হইতে পারে। বস্তুতঃ একমাত্র জ্ঞানবলের নিকট সমুদয় বল পরাস্ত। এতকাল মনুষ্য এই জ্ঞানবল দ্বারা পশু-পক্ষী ইত্যাদির প্রতি আধিপত্য এবং রাজত্ব করিয়াছেন, এখন জ্ঞানচর্চ্চার আধিক্যতায় ভৌতিক পদার্থের উপরেও রাজত্ব করিতেছেন। শারীরিক বলের ক্রিয়া ব্যক্তিগত এবং নশ্বর জ্ঞানবলের ক্রিয়া পৃথিবী ব্যাপী বিস্তৃত এবং অবিনশ্বর।

পরিশ্রমের লাঘব করা, সময়ের অপব্যয় রক্ষা করা, কার্য্যের ফলকে নির্বিঘ্ন করা এই তিনটী জ্ঞানচর্চ্চার প্রধান ফল। প্রায় সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান-চর্চ্চার ফলকেই এই তিনটী সূত্র দ্বারা বিভক্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। যাহা হউক, সে সকল মিমাংসা আমাদের এস্থলের উদ্দেশ্য নয়।

মনে করুন মনুষ্য যখন, জ্ঞানবল লাভে অনধিকারী ছিল, তখন যদি একজন কলিকাতা হইতে সত্বর কাশী যাইতে ইচ্ছা করিত, তবে কি উপায় অবলম্বন করিত? হয়ত দশ কি বিশ হাজার লোক সংগ্রহ করিয়া তাহার স্কন্ধে আরোহণ করিত, এবং একএকজন কতদূর স্থান দৌড়িয়া যাইত, তাহাতে যত লোকের যত সময় ব্যয়িত হইত, তাহার মোট সমষ্টি কত? তাহাতেই কি একদিনে কাশী যাইতে পারিত? তবে যখন মনুষ্য জ্ঞানের দ্বারা কথঞ্চিত বলীয়ান হইয়া পশুর প্রতি প্রভুত্ব করিতে সক্ষম হইল, তখন দেখিল যে, একশত কি দুই শত ঘোড়ার দ্বারা সত্বর যাইতে পারা যায়? তাহাতে অবশ্য পূর্ব্বাপেক্ষা সময়ের অপব্যয়ে অপেক্ষাকৃত লাঘব হইল, কিন্তু তথাপিও কি একদিনে যাইতে সক্ষম হইত? যখন তদপেক্ষা আরও কিছু অধিক জ্ঞানের অধিকারী হইল, তখন দেখিল, যে চক্রাকার পদার্থের সংযোগে কোন বস্তু নির্ম্মাণ করিয়া ঘোড়া যুড়িয়া দিলে ইহা অপেক্ষা সহজে এবং নির্বিঘ্নে যাওয়া যাইতে পারে। তখন গাড়ীর সৃষ্টি হইল। তাহাতেও একদিনে যাইতে সক্ষম হইত না, এখন মনুষ্য জ্ঞানবলে অধিক বলীয়ান হইয়া যাহার প্রাপ্তি নাই

ক্লান্তি নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই সেই ভৌতিক পদার্থের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া অতি সহজে একদিনে সহস্র সহস্র লোক একত্রে কাশী যাইতেছে। যিনি জ্ঞানবলে এই শক্তির প্রচার করিয়াছেন, মানবজাতি কি কখনও তাহাকে ভুলিতে পারিবে? এরূপ শত শত দৃষ্টান্ত সকলেরই বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহা এস্থলে অনাবশ্যক, কিন্তু ইহাই যে মানবজ্ঞানের চরম ফল কি শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছে এ কথা আমরা বলিতে পারি না।

বর্ত্তমানসময়ে রেলওয়েরগাড়ী কাহারও অবিদিত নাই। তবে এ পুরাতন প্রস্তাবের অবতরণা কেন; আর কিছুর জন্য নহে,আমাদের দেশের ব্যবহৃত কৃষি যন্ত্রের সঙ্গে তুলনায় অনুমান করা যাইতে পারিবে যে জ্ঞানের কোন্ অবস্থার কার্য্য। মনে করুন মনুষ্য প্রথমতঃ অজ্ঞানাবস্থায় হয়তো হস্ত দ্বারা মাটি খুঁড়িয়া বীজ বপন করিত। তার পর যখন লৌহ দ্বারা অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করার জ্ঞান লাভ করিলে তখন ক্রমে দাও, কাচি, কোদাল প্রভৃতি দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিয়া বীজ বপন আরম্ভ করিল * তার পর জ্ঞান বলে যখন পশু মনুষ্যের আয়ত্তাধীন হইল তখন গরুর দ্বারা হাল চাস আরম্ভ হইল। আজ পর্য্যন্তও মানব-জ্ঞানের চরম ফল এই স্থানেই স্থিত রহিয়াছে, সেই অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের সময়ে (অথবা তাহারও পূর্ব্বে) যে দুইটী গরুর স্কন্ধে একটী জোওয়াল দিয়া একটী লাঙ্গল চাস করার প্রথা, অদ্যাপিও তাহার তিলার্দ্ধ মাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। পৃথিবীর উন্নতিতে আমাদের দেশের কি ফল হইয়াছে? দেশের লোক বিদ্বান্ হইয়া, জ্ঞানী হইয়া কেহ কি কিছু আবিষ্কার করিয়াছেন? কোন দিন কি কেহ অন্ততঃ এক ঘণ্টা কালও চিন্তা করিয়াছেন আবিষ্কার ও চিন্তা করা দূরের কথা অন্য দেশের প্রচলিত যন্ত্রাদিই কি প্রচলনের জন্য যত্ন চেষ্টা করিয়াছেন, দেশের উন্নতি উন্নতি বলিয়া যে চীৎকার উঠিয়াছে সে কেবল দাসত্ব বৃত্তির উন্নতি হইয়াছে। কৃষির এখনও বাল্যাবস্থা, মাতৃ

* অদ্যাপিও পার্ব্বতীয় অসভ্য জাতিরা টাকোয়াল (অথবা স্থান বিশেষে অন্য নাম) দ্বারা মৃত্তিকায় এক একটী আঘাত করিয়া তন্মধ্যে বীজ বপন করে।

ক্রোড় হইতে শিশু সন্তান কিঞ্চিন্মাত্র গতি শক্তির সক্ষম হইলে যেমন ধূলা খেলা করে, আমাদের দেশের কৃষিযন্ত্রাদির এখনও সেই অবস্থা রহিয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ কৃষকশ্রেণীর মূর্খতা এপর্য্যন্ত কোন বিজ্ঞ লোকেরা কৃষিকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই, তাহা হইলে এতদিন অনেক উন্নতি হইত। অনভিজ্ঞ কৃষকেরা কোন চিন্তা করে না অনুসন্ধান করে না হয়তো মনে করিয়া বসিয়া আছে যে ক্ষেত্র কর্ষণের জন্য ঈশ্বরই এই লাঙ্গল জোয়ালের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন, অথবা তিনিই পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইহার দ্বারা এইরূপেই কর্ষণ করিতে হইবে।

যে দেশের কি যে স্থানের লোক যে বিষয়ে যত অনভিজ্ঞ রহিয়াছে, সেই দেশের লোকের কার্য্যেতে তত শ্রমাধিক্যতা এবং অসুবিধা রহিয়াছে তাহার একটী উদাহরণ এস্থলে দেখাইতেছি। ইক্ষু মাড়িয়া রস লইবার সময় প্রায় সকল স্থানের কৃষকেরাই ঘানিতে দুইটী গরু জুড়িয়া দিয়া একটী বালকের দ্বারা গরু ঘুরাইয়া ইক্ষুর রস মাড়িয়া লয়। শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানের কৃষকেরা সেই ঘানি মনুষ্য দ্বারা ঘুড়ায় অন্যূন চারি জন বলবান্ মনুষ্য ভিন্ন এই ঘুড়ান কার্য্য সম্পাদন হয় না এই চারিটী লোকের খোড়াকে বেতনে অন্যূন দৈনিক ১৷৷৹ দেড় টাকা ব্যয় পড়ে। পঞ্চম বৎসরের বালকের দ্বারা যে কার্য্য সম্পাদন হয় সেই কার্য্যে চারিজন বলবান্ লোকের আবশ্যক এবং দৈনিক ১৷৷৹ দেড় টাকা ব্যয় পড়ে কেমন করিয়া কৃষকের লাভ হইবে? অন্যান্য স্থানের এই সুবিধা জানিয়া শুনিয়াও দেশের রীতি বিরুদ্ধ বলিয়া সদুপায় অবলম্বন করিতে সম্মত হয় না।

ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের যে সকল কৃষিযন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে তৎসমুদয় আমাদের দেশের ব্যবহারের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী কি না সন্দেহ। আমরা এপর্য্যন্ত তৎসমুদয় যন্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া দেখিতেও পারি নাই। যাহাহউক আমরা সামান্য জ্ঞানে সামান্য চেষ্টায় কএক প্রকার কৃষিযন্ত্রের ব্যবস্থা করিতেছি। আমাদের দেশে যেরূপ লাঙ্গলের ব্যবহার আছে তাহারও একটী পরিমাপ আছে, মাপের ত্রুটিতে হয়তো লাঙ্গল অধিক মাটির নীচে বসিয়া যায় তাহা টানিতে পশুর অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হয়। আবার হয়ত এমন হইয়া পড়ে যে লাঙ্গল মাটির মধ্যে প্রবেশ করে না

উপরে উপরে চলিয়া যায়। লাঙ্গলের ফালের অগ্রভাগ হইতে বক্র স্থানের যত দূরতা ফালের অগ্রভাগ হইতে ঈশের ব্যবধানতা ঠিক তত পরিমাণ হইলে লাঙ্গল বেজুত হয় না। যে কয়েক প্রকার যন্ত্রের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে তাহা যে একেবারে ঠিকঠাক্ পরিমাপশুদ্ধ বুঝাইয়া দেওয়া সে বড় কঠিন, প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া দিলেও ঠিক এস্কেলের দ্বারা অঙ্কিত করা কষ্ট. যাহউক সাধ্যমত যতদূর হয় বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

এক পশুর দ্বারা যে এক খানি লাঙ্গল চলে তাহাকে একবাহী লাঙ্গল বলা যায়। প্রচলিত লাঙ্গলের সহিত ইহার আর অধিক বিভিন্নতা কিছুই নাই। লাঙ্গলের সঙ্গে যে ঈশ খানি সংলগ্ন থাকিয়া উভয় পশুর স্কন্ধস্থিত জোয়ালের সঙ্গে আবদ্ধ করিতে হয় ইহা তদ্রূপ না হইয়া জোড়ালা এক খানি কাঠ দ্বারা এক খানি ঈষ প্রস্তুত করিতে হয়, লাঙ্গলের সঙ্গে তাহার মূলটী ঈষের ন্যায় সংলগ্ন থাকিয়া দুইটী শাখা দুই দিকে থাকে এক ঘোড়ার গাড়ীতে যেমন ঘোড়ার দুই পার্শ্বে দুইটী বোমা থাকে ঐ লাঙ্গ-লের সংলগ্ন ঈষের দুই খানি বাঁশ অথবা কাঠ বান্ধিয়া পশুর স্কন্ধস্থিত জোওয়ালে সংলগ্ন করিলেই লাঙ্গল চালান যায়। (১) চিহ্নিত আকার অঙ্কিত করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

(ক) চিহ্নিত স্থান ঈষের মূল ভাগ (খ খ) চিহ্নিত স্থান তাহার দুই শাখা, (গ) চিহ্নিত দুইটী পার্শ্বস্থিত বাঁশ অথবা কাঠ (ঘ) চিহ্নিতটী জোও-য়াল এই জোওয়ালের সঙ্গে পার্শ্বস্থিত বাঁশ দুই খানি আবদ্ধ করিয়া দিতে হয় এবং বাঁশের অপরভাগ ঈশের দুই শাখার সহিত সংলগ্ন থাকে। জোয়ালের সঙ্গে অপর যে দুইটী চিহ্ন আছে এই দুইটী সলাকা পশুর স্কন্ধের দুই দিকে দুইটি থাকে। পশু একটু সুশিক্ষিত হইলে, এই দুইটী সলাকা না হইলেও চলে। চিত্রের পরিমাপ যে ঠিক অঙ্কিত হইয়াছে তাহা নয়। (চ) হইতে (ক) যত দূর ব্যবধান (চ) হইতে (ক)র দূরতা ঠিক তত পরিমাণ হইলে লাঙ্গল বেজুত হয় না।

আর একপ্রকার লাঙ্গল—দুইটী ঘোড়ার দ্বারা পাঁচ খানি লাঙ্গল অতি সুবিধামতন চলিতে পারে। সবলতানুসারে ছয় কি সাতখানা পর্য্যন্তও চালান যাইতে পারে। ইহাকে বলে, যুক্ত লাঙ্গল ইংলণ্ডের

কর্ষণীযন্ত্রের সহিত অনেক সাদৃশ্য আছে। ইহাতে আরও একটী সুবিধা হইতে পারে, কৃষকের রৌদ্র বৃষ্টি নিবারিত হইয়া এবং জল কাদা স্পর্শ না করিয়া জুতা পায় দিয়া বসিয়া চাস করা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন প্রয়োজনমতে লাঙ্গল সকল খুলিয়া রাখিয়া ক্ষেত্রের শস্যাদি (গাড়ীর ন্যায়) ইহার উপরে তুলিয়া বাড়ীতে আনা যাইতে পারে। ইহাতে ব্যয় আধিক্য বলিয়া কৃষকমণ্ডলী চমৎকৃত হইবেন না। ২০ কি ২৫ টাকা হইলেই ইহার একখানি প্রস্তুত হইতে পারে। এরূপ লাঙ্গল দ্বারা কর্দ্দমিত ক্ষেত্র অপেক্ষা শুষ্ক ক্ষেত্র চাষ করা অধিক সুবিধা।

তিন হাত দীর্ঘ এবং দুই হাত প্রস্থ এক খানি ফ্রেম (Frame.) চৌকাঠের ন্যায় প্রস্তুত করিতে হয়, তাহাতে পাঁচটী চাকা (Wheel.) লাগিবে পশ্চাৎ দিগের দুইটী সামান্য চাকা হইলেই হয়, সম্মুখের দিকের তিনটী স্প্রিং (Spring.) যুক্ত চাকা লাগিবে, ঐ চৌকাঠের মধ্যে আরও এক খানি কাঠ সংযুক্ত করিতে হইবে পশ্চাৎ ভাগে এবং মধ্যভাগের কাঠের সঙ্গে লাঙ্গল সকল স্ক্রু (Screw.) দ্বারা আবদ্ধ করিতে হয়; লাঙ্গল সকলে স্ক্রু দিবার জন্য চারি পাঁচটী খাট ছিদ্র রাখিতে হয়। মৃত্তিকার গভীরতা খনন করিবার আবশ্যকানুসারে লাঙ্গল সকল উপরে তুলিয়া এবং নিম্নে নামাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। লাঙ্গল সকল অর্দ্ধ হস্ত অন্তর অন্তর সংলগ্ন থাকে। পশ্চাদ্বর্ত্তী কাঠের যে যে স্থানে লাঙ্গল সংলগ্নিত হইয়াছে সম্মুখের কাঠে তাহার সমসূত্রে না হয় পূর্ব্ববর্ত্তী দুই খানি লাঙ্গলের মধ্যে যেন সংলগ্ন করা হয়। এই চৌকাঠের সম্মুখ ভাগের কাঠের সঙ্গে আর যে দুই খানি কাঠ ত্রিকোণ আকারে সংযুক্ত থাকে তদুপরি বসিবার উপযুক্ত একখানি তক্তা দিয়া উপরে চাচ চাটাই কি অন্যরূপ অন্য কোন পদার্থের দ্বারা আচ্ছাদন দিলে কৃষক সেই স্থানে বসিয়া অশ্বদিগকে চালনা করিতে পারেন। ঐ ত্রিকোণ আকার কাঠের সঙ্গে আর কাঠ জুড়িয়া (যে ভাবে গাড়ীর ঘোড়া জোড়ে) তাহার সঙ্গে ঘোড়া জুড়িয়া গাড়ীর ঘোড়ার জোতের ন্যায় (ইহাকে রাশ্ও বলে) জোত কৃষকের হাতে থাকে, তদ্দ্বারা তিনি ঘোড়াদিগকে ফিরাইতে ঘুরাইতে পারেন। (২) চিহ্নিত চিত্র অঙ্কিত করা যাইতেছে।

(ক) চিহ্নিত স্থানদ্বয় পশ্চাদ্বর্ত্তী চাকা, (খ) চিহ্নিত স্থানদ্বয় সম্মুখবর্ত্তী চাকা এই দুইটী স্প্রিঙ্গযুক্ত, (গ) চিহ্নিত স্থান সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী চাকা এইটীও স্প্রিঙ্গযুক্ত। ঐ স্থান হইতে যে একটী লম্বাকৃতি কাঠ, তাহার (ঘ) চিহ্নিত স্থানে ঘোড়া জুড়িতে হয় (চ) চিহ্নিত স্থানত্রয়ে পশ্চাদ্বর্ত্তী কাঠযুক্ত লাঙ্গল (ছ) চিহ্নিত স্থান মধ্যবর্ত্তী কাষ্ঠযুক্ত লাঙ্গল, (জ) চিহ্নিত স্থান কৃষকের বসিবার স্থান।

ক্ষেত্রের চাকা ভাঙ্গার জন্য কৃষকেরা মুদ্গর ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা না করিয়া ডলনা ব্যবহার করিলে অতি সহজ পরিশ্রমে হইতে পারে। ইহাতে চাকা ভাঙ্গা এবং মই উভয় কার্য্যই হইতে পারে, অধিকন্তু ক্ষেত্রস্থ জঙ্গলাদিও কতকপরিমাণে পরিষ্কার হইয়া যায়। ২॥০ আড়াই হাত পরিমাণ লম্বা ২ হাত পরিমাণ বেড়ে মোটা একটী কাঠ (যে কাঠ ওজনে ভারি এবং দৃঢ়) তাহা ব্যালোনের আকৃতি সুগোল করিতে হয়। ব্যালোনের দুই দিকে কতক স্থান যে চিকণ থাকে (যে স্থানে হস্ত রাখিয়া উড়ায়) ঐ কাঠেরও সেইরূপ দুই দিকে দুইটী রাখিয়া দুইটী চাকার সহিত সংলগ্ন থাকে গরুর গাড়ীর চাকা যেরূপে আটকা থাকে ঠিক সেইরূপে থাকে। যে মোটা কাঠের কথা বলা হইল, সেই কাঠের গাত্রে কতকগুলি লোহার কাঁটা বসাইয়া দিলে সেগুলি, অর্গেনের মধ্যের ব্যালোন আকৃতি যন্ত্রের গাত্রে যেরূপ অসমান ভাবে এবং শ্রেণীবদ্ধ বিহীন কাঁটা থাকে সেইরূপে অসমান ভাবে থাকা আবশ্যক। এই যন্ত্রের সহিত ঘোড়া কি মহিষ জুড়িয়া চালনা করিতে হয়। ঘোড়ার গলায় চামড়ার গোলাকৃতি একটা পদার্থ দিয়া যেরূপে গাড়ী জোড়ে সেইরূপে এই যন্ত্র পশুর সঙ্গে জুড়িতে হয়। (৩) চিহ্নিত চিত্র দেখিবেন।

(ক) চিহ্নিতটী ডলনা (Roller.) (খ) চিহ্নিত দুইটী চাকা ঐ ডলনায় আবদ্ধ আছে। গোলাকার গুলিন লৌহ কাঁটা, (গ) চিহ্নিত রজ্জু দুই গাছি চাকার বহির্ভাগ যুক্ত থাকিয়া (ঘ) চিহ্নিত চর্ম্মনির্ম্মিত গোলাকার পদার্থ যাহা পশুর গলায় সংলগ্ন আছে তাহার সহিত আবদ্ধ করিতে হয়। রজ্জু দুই গাছি এমন পরিমাণ লম্বা থাকা আবশ্যক যে পশুটী চলিবার সময় ডলনার কাঁটা তাহার পায়ে না লাগিতে পারে।

আচরা—এক প্রকার যন্ত্র কোন কোন স্থানে ইহার ব্যবহার প্রচলিত আছে, এবং সকল স্থানের কৃষকের পক্ষে আবশ্যকও করে না। ইহা দুইটী কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। বৃষ্টির জল ইত্যাদিতে ক্ষেত্রের উপর এক প্রকার শর পড়ে শেষে শুষ্ক হইলে চটা বান্ধে এবং মধ্যে ফাটিয়া যায় সেই সকল চটাতে উদ্ভিদ মূলকে অত্যন্ত কঠিন ভাবে চাপিয়া রাখাতে তাহার বৃদ্ধি হইতে পারে না। ক্ষেত্রে আচড়া দিলে ঐ সকল চটা ভাঙ্গিয়া মাটি আলগা করিয়া দেয়। দ্বিতীয়তঃ শস্য ক্ষেত্রের মধ্যে যে জঙ্গল জন্মে তাহা পরিষ্কৃত হয়। আচড়াতে ক্ষেত্রস্থ শস্যের গাছও দুই একটী উঠিয়া না যায় তাহা নয়। তবে তাহাতে ক্ষতি করে না পাতলা হওয়াতে বরং উপকার হয়। ২॥ কি ৩ হাত পরিমাণ এক খানি লম্বা কাঠের সঙ্গে কতকগুলি সলা সংলগ্ন থাকে, সলাগুলিকের অগ্রভাগ চোথা। সলা গুলিক, সকল সমান থাকে না। ছোট বড় থাকে, তিন তিন অঙ্গুলি পরিমাণ এক একটীর ব্যবধান। লাঙ্গলের উপরিভাগে ধরিবার যেরূপ স্থান থাকে, সলা সংযুক্ত কাঠ খানির ঠিক মধ্যভাগে তদ্রূপ এক খানি কাঠ থাকে। দুইটী গরু দিয়া যেরূপে লাঙ্গল জোড়ে ঠিক সেই রূপে জুড়িয়া চালনা করিতে হয়। (৪) চিহ্নিত চিত্র দেখ।

(ক) চিহ্নিত কাঠের সঙ্গে সকল কাঠ সংলগ্ন আছে (খ) চিহ্নিত ধরিবার স্থান (গ) চিহ্নিত গরুর স্কন্ধস্থিত জোয়ালের সহিত সংলগ্ন থাকিবে।

আমাদের দেশের সাধারণতঃ প্রচলিত কৃষি যন্ত্রাদির নাম এবং ব্যবহার বোধ হয় প্রায় অনেকেই অবগত আছেন, কিন্তু এমন অনেকে আছেন যে তাঁহারা দেখা দূরেরকথা নামও শুনেন নাই, তজ্জন্য তাহার নাম এবং ব্যবহারের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

লাঙ্গল—যদ্দ্বারায় মাটি বিদারিত হয়, ফাল—এটী লৌহনির্ম্মিত, লাঙ্গলের যে অংশে মাটি বিদারিত হয় তাহার অগ্রভাগের সহিত সংলগ্ন থাকে। ঈষ—যে কাষ্ঠটী লাঙ্গলের মধ্যে যুক্ত থাকিয়া পশুর স্কন্ধস্থিত জোঁয়ালের সহিত আবদ্ধ থাকে। জোঁয়াল—যাহা পশুর স্কন্ধের উপরি ভাগে থাকে। মই—ইহা দুই প্রকার ব্যবহার হইতে দেখা গিয়াছে।

অধিকাংশ স্থানেই চক্ (একটী বাঁশকে দুই ভাগ করিয়া তাহার মধ্যে কএটী শলাকা দিয়া প্রস্তুত করে) ব্যবহৃত হয়, কোন কোন স্থানে ঢেঁকির ন্যায় একটী কাঠ দ্বারাও এই কার্য্য করে। ক্ষেত্রের চাকা ভাঙ্গা, এবং মাটি সমান করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে এতদ্ভিন্ন কাঁচি, কোদাল, নিরাণি ইত্যাদি ব্যবহার হইয়া থাকে।

আর একপ্রকার কৃষিযন্ত্র, বোরো ক্ষেত্রের জন্য ব্যবহৃত হয়, বিল জমীতে যাহারা বোরোক্ষেত্র করে সেই ক্ষেত্রের ধাপ দল ঘাষাদি টানিবার জন্য এই যন্ত্র আবশ্যক হয় ইহাকে দলকোটা বলে, একটী চৈড়ের (কোন দেশে লগি বলে) আকৃতি বাঁশের গোড়ায় একখানি তেডালা কাঠের একদিক কাটিয়া ফেলিয়া দুইদিক রাখিয়া তাহার একদিক বেতের দ্বারা বাঁশের গোড়ারদিকে বান্ধিতে হয়। বাঁশের গোড়ায় ঐ কাঠে ঘাষ দলাদি বাঝাইয়া উপরে থাকিয়া বাঁশের আগা ধরিয়া টানিলে ক্রমে নিকটে আসিলে কিনারে তুলিতে হয়। একটী আকার অঙ্কিত করা যাইতেছে। (৫) চিহ্নিত চিত্র দেখ।

(ক) চিহ্নিত স্থান বাঁশের গোড়া (খ) চিহ্নিত স্থান কাঠের একদিক যাহা বাঁশের সহিত বেতের দ্বারা সংবদ্ধ আছে (গ) চিহ্নিত স্থান কাঠের অগ্রভাগ যদ্বারা ঘাষ জঙ্গল বাঝাইতে হয় (ঘ) চিহ্নিত স্থান বাঁশের অগ্রভাগ এই স্থান ধরিয়া টানিতে হয়।

কৃষকের বাসস্থান।

অন্যান্য দেশের লোক একএকটী নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায় লিপ্ত থাকে। এক সময়ে আমাদের দেশেও এ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, কার্য্য এবং ব্যবসায়ানুসারে জাতিবিভাগ হইয়াছিল—এখন আর সেরূপ নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়েতেই মাত্র কেহ লিপ্ত প্রায় নাই। কৃষকের পুত্রেও চাকরি করে, শিল্পকারেরা কৃষি করে। এই সকল বিশৃঙ্খল গতিকে কেহই কোন কার্য্যে উন্নতি করিতে পারে না। কেহই কোন একটী বিস্তৃত স্থানব্যাপিয়া কৃষি করে না সকলেই দুই বিঘা পাঁচ বিঘা দশ বিঘা এইরূপ করে। কেহর হয় তো মাত্র কএকখানি ধানের

ক্ষেত্র আছে, কেহর ইক্ষুক্ষেত্র আছে। ধান্যক্ষেত্রের কার্য্য সমাধান্তেই তাহাকে অন্য কার্য্য করিতে হয় ইত্যাদি। আবার হয় তো রামের বাড়ীর নিকট শ্যামের ২/ বিঘা ক্ষেত্র আছে (এক মাইল ব্যবধান) আবার শ্যামের বাড়ীর নিকটেও রামের ক্ষেত্র আছে।* শ্যামের গরুতে রামের ধান খাইতেছে, রামের গরুতেও শ্যামের ধান নষ্ট করিতেছে ইত্যাদি প্রকার পরস্পর সকলেরই অসুবিধা। ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানের কৃষকেরা এক একটী নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ সুবিস্তৃত স্থানে কৃষিকার্য্য করে, একজনের সীমার মধ্যে অন্যজনের কোন সংস্রব থাকে না। আপন আপন সীমাকে বেড়ার দ্বারা কি অন্য কোনরূপে এমন ভাবে রাখে যে, তাহাতে অন্যের পশ্বাদিও আসিতে পারিবে না অথবা নিজের পশ্বাদিও অন্যের ক্ষেত্রে যাইতে পারে না। কৃষকের বাসস্থান সেই কৃষি-ক্ষেত্রের ঠিক মধ্যস্থানে থাকে এবং যাহারা কৃষিকার্য্য করে তাহারা আর কোন কার্য্য করে না মাত্র কৃষিকার্য্যে লিপ্ত থাকে, এমন কি কৃষিজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতেও তাহারা স্থানান্তরে যায় না। বণিকসম্প্রদায়িক লোকেরা আসিয়া ক্রয় করিয়া নিয়া যায়। কৃষিকার্য্যের যন্ত্রাদি নির্ম্মাণের জন্য কামার সূতার কৃষকের বাড়ীর নিকটেই এক পার্শে কারখানা থাকে। এক মুহুর্ত্তও কৃষিক্ষেত্র কি কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যাইতে হয় না, মনে করুন, এ কত সুবিধার বিষয়। একমাত্র কার্য্যের চিন্তা একমাত্র কার্য্যে মননিবেশ, এবং সেই কার্য্যক্ষেত্র ক্ষণকালের জন্য চক্ষের অন্তরাল হয় না, বিশেষতঃ এক মুহূর্ত্ত সময়ও অপব্যয় হয় না।

আমাদের দেশের লোকেরা সময়ের অপব্যয়টা কেহ গ্রাহ্যই করেন না। রামের ক্ষেতে /২ সের বেগুন হইয়াছে বেগুন নিয়া রামকে বাজারে যাইতে হইল, শ্যামের /২ সের ছিমড়া হইয়াছে তাহাকেও ছিমড়া নিয়া বাজারে যাইতে হইল,রামেরও দুইটী গরু চরাইতে দিন যাইতেছে শ্যামেরও পাঁচটী গরু চরাইতে দিন যাইতেছে অথচ একজনের দ্বারাই একার্য্য

* সাধারণ ভাষায় বলিয়া থাকে, দূর কৃষি আর চোর পরশি গৃহস্থের প্রধান অসুবিধা।

সম্পাদন হইতে পারে। পরস্পর উভয়েরই সময়ের অপব্যয় রক্ষা হইয়া সুবিধা হয় তাহা কেহ মনে করে না সকলকেই বাজারে যাইতে হয় কেন? প্রশস্ত কৃষিক্ষেত্র না থাকায় কৃষকের বাসস্থান নানা স্থানে অনির্দ্দিষ্টরূপে থাকায় কোন ব্যবসায়ী লোক আসিয়া কৃষিজাত দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে না,একজনের ২/মণ বেগুন ক্রয় করিতে হইলে,পাঁচখানি গ্রাম কুড়িয়া পায় না বিশেষতঃ কোথায় বা ক্ষেত্র, কোথায় বা কৃষকের বাড়ী? দেশের এসকল অসুবিধা যাইবার নয়, যত দিন দেশের লোক (এসকল বুঝিয়া) একত্রিত (জএণ্ট ষ্টক) হইয়া কার্য্য করিতে না শিখিবেন ততদিন এ অসুবিধা দূর হইবে না। কেবল কৃষক মিলিলেও কি হইবে? মধ্যে বিঘ্ন রহিয়াছেন জমিদার। জমিদারেরাই প্রধান বিঘ্ন মনে করুন, আপনে একটী স্থান নির্ব্বাচন করিয়া একটী কোম্পানি খুলিলেন,সেই স্থানটীতে পাচটী ভূম্যধিকারীর জাএগা দুজন সম্মত হইয়াছিলেন, আর তিনজন মনে করিলেন, বেটা দায় ঠেকিয়াছে এখন এক টাকার স্থলে দশ টাকা না হইলে দিব না। যাহউক, ধান ভানিতে শীবের গীত গাইয়া কি করিব।

এখন হইতে যাহারা কৃষিব্যবসায়ী হইয়া কৃষিকার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, কি করিবেন তাহাদিগকে আমরা এই পরামর্শ দেই, ছোটই করুন কি বড়ই করুন, একটী নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ স্থান নির্ব্বাচন করিবেন যেন সীমার মধ্যে অন্যের অধিকার না বর্ত্তিতে পারে তাহার মধ্যস্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিবেন, যেন ঘরে বসিয়াও চতুর্দ্দিক সমদৃষ্টি থাকিতে পারে। সমুদয় ক্ষেত্র অক্লেশে পর্য্যবেক্ষণ করা যাইতে পারে, এরূপ রাস্তাকি পথের সুবিধা রাখিবেন * তাহা না থাকিলে অনেক সময় ইচ্ছা সত্ত্বেও যাতায়তের প্রতিবন্ধক ঘটে। এমন ভাবে স্থান নির্ব্বাচন করিবেন এবং কৃষি পর্য্যায় স্থির করিবেন যে, বার মাসের কোন সময়েও কুলি মজুর কি পশ্বাদির নিরর্থক বসিয়া থাকিতে না হয়, কতক স্থান এমন ভাবে পর্য্যায়ক্রমে পতিত রাখিবেন যে, তাহাতে পালিত পশ্বাদির খাদের ব্যবস্থা সুন্দর রূপ হইতে পারে, স্থানীয় অবস্থানুসারে কৃষি করিবেন। অর্থাৎ যে স্থানে

* বর্ত্তমান সময়ে চা-করেরা এদেশেও এইরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন।

যে পরিমাণ যে কৃষি উৎপাদন করিলে তাহার মূল্য কমিয়া যাইবে না, কি দুই এক মাস ঘায থাকিলে নষ্ট হইবে না। মনে করুন সামান্য এক পল্লীগ্রামের নিকটবর্ত্তী অরণ্য মধ্যে ক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়া সেখানে যদি ২৫/ বিঘা জমিতে বেগুনের কৃষি করেন, কি ৫/ বিঘা জমিতে কফির ক্ষেত্র করেন, তবে তাহা হইলে বেগুনের দর এত সস্তা হইয়া পড়িবে যে, তাহাতে আপনার লাভ দূরে যাউক চাসের খরচই উঠিবে না, কফি তো কেহ ক্রয় করিবে কি না সেই সন্দেহ, অথচ এসকল এমন জিনিষ না যে তাহা আপনে এক মাস দুই মাস ঘরে রাখিতে পারেন।

আমরা ইহার প্রত্যক্ষ ফল লাভ করিয়াছি, উত্তম কফি জন্মাইয়া একটা কফি এক পয়সা বিক্রী করিতে পারি নাই। শেষ বিনামূল্যে বিতরণ করিলাম, যে তবু একবার স্বাদ বোধ হইলে ভবিষ্যতের উপকার হইতে পারে, তাহাও হইল না।

কৃষকের বাসস্থানের ও কৃষিক্ষেত্রের নিকটে নদী কি খাল থাকা আবশ্যক। একমাত্র জলের উপর উদ্ভিদের উন্নতির এবং জীবনের অনেক নির্ভর করে। কখনও অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইলে কোন প্রকার যন্ত্রাদি যোগে জল দিয়া কথঞ্চিত পরিমাণে ক্ষেত্রস্থ কৃষি রক্ষা করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ কৃষিজাত দ্রব্যাদি কি কৃষিক্ষেত্রের উপকরণাদি ক্রয় বিক্রয়ের সুবিধা হয়। যদি নিতান্তপক্ষেও সুবিধা না ঘটে, তবে কৃষিক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে নালা কি খাল কাটিয়া জল আবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করিতে হয়, কি মধ্যে মধ্যে কূপ খনন করিয়া রাখিতে হয়। যেখানে নদী কি খাল পাইবার সম্ভব নাই, সেখানে অন্ততঃ ব্যবসায়ী লোকের যাতায়তের সুবিধা-জনক প্রশস্ত রাস্তা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। রাস্তা থাকিলে দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয়ের অনেক অসুবিধা নিবারিত হয়।

প্রাচীন নীতি-শাস্ত্রকারকেরা বৃহৎ নদীতীরে কৃষিক্ষেত্র করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, আমরাও তাঁহাদের মতের সহিত যোগ দিতেছি। বস্তুতঃ বৃহৎ নদীতীরে কৃষিক্ষেত্র থাকিলে সর্ব্বদা কৃষককে সশঙ্কিতচিত্তে এবং অশান্তিতে বাস করিতে হয়।

কৃষিক্ষেত্রের মধ্যস্থানে দক্ষিণ দ্বারি ঘর কৃষকের বাস করিবার জন্য

নির্ব্বাচন করিবে। কতক ব্যবধানে পশ্চিমাংশে পূর্ব্বদ্বারি ঘর পশুশালা করিবে; পশুশালার নিকটেই কৃষি যন্ত্রাদি রাখিবার ঘর করিবে। পূর্ব্বাংশে ব্যবধানিত স্থানে বীজ রক্ষা করিবার এবং কৃষিজাত দ্রব্যাদি রাখিবার ঘর করিবে। যাহারা পশুপালন কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, তাহাদিগকে পশুশালার দিকে বাস করিতে দিবে। যাহারা অন্যান্য কার্য্য করে, তাহাদিগকে কৃষিজাত দ্রব্যাদি রাখিবার গৃহের নিকটে বাস করিতে দিবে। গৃহ সকল এমন পরিমাণ ব্যবধান হওয়া উচিত যে, দৈবাৎ এক গৃহে অগ্নি লাগিলে অন্য গৃহ স্পর্শ করিতে না পারে। নির্ব্বাচিত গৃহ সকলের নিকটে কেহকেই রন্ধনশালা করিতে দেওয়া উচিত না; ব্যবধানিত স্থানে রন্ধনশালা করা বিধেয়। বাসস্থানের নিকটে (ক্ষুদ্র হউক কি বৃহৎ হউক) একটী জলাশয় থাকা আবশ্যক; তাহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে থাকা উচিত।

দেশ কাল স্থান ভেদে কৃষি উৎপন্ন করিতে হয়; সর্ব্বদা এইরূপ চেষ্টা এবং মনোযোগ রাখিতে হয় যে, সাধারণতঃ যে সময়ে যে কৃষি হইয়া থাকে, তদপেক্ষা যেন অগ্রে ফসল হইতে পারে তাহাই উত্তম কৃষকের পরিচয় এবং লভ্যকর।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কৃষি-সূত্র।

কৃষি—বহুবিধ প্রকৃতি বিশিষ্ট, (তাহা উদ্ভিদ প্রকৃতি অধ্যায়েই প্রকাশ করা হইয়াছে) কোনটী বহু দিনে ফলে।* কোনটী তদপেক্ষা অল্পে ফলে, কোনটী বৎসরে ফলে, কোনটী বৎসরে দুইবার ফলে, এবং কোনটী বার মাস ফলে, আবার ইহার মধ্যেও কৃষির প্রকৃতি অনুসারে

* ফলে—এই শব্দের অর্থ স্থান বিশেষে করিতে হইবে। কোন স্থানে কৃষির ফল, কোন স্থানে কৃষি-কর্ত্তার ফল। যে সকল উদ্ভিদে ফল ধরে না, তাহারও মূলে, পাতায় ফুলে, গাছে। কৃষি-কর্ত্তার ফল হয়, সুতরাং স্থল বিশেষে অর্থ করিতে হইবে।

এক একটী নির্দ্দিষ্ট ঋতুতে ফলে। যে কৃষি বৎসরে একবার ফলে, তাহা যে ঋতুতে ইচ্ছা সেই ঋতুতেই ফলান যায় তাহা নয়, কালানুসারে ভিন্ন ফলিবে না। যথা—আমন ধান্য শরৎ ঋতু ভিন্ন ফল প্রসব করে না ইত্যাদি। কিন্তু বহুদিনে ফলে কি অল্প দিনে ফলে অথবা ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ফলে এই সমস্ত গুণ কি প্রকৃতি সত্বেও কৃষিশাস্ত্রবিদ পণ্ডিতগণ সমুদয় কৃষিকে হৈমন্তিক এবং বর্ষপ্রধানত এই দুইটী শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন।

সমুদয় দেশের নীতি শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরাই বলিয়া গিয়াছেন যে, "দেশ, কাল, পাত্র" এই তিনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আলোচনা এবং কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। এই নীতিসূত্র অবলম্বন করিলে আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়া উদ্যান সুসজ্জিতের উপযোগী শাখা, প্রশাখা পত্র পুষ্প ফল বিশিষ্ট উদ্ভিদ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া প্রথমতঃ উচিত নয়। সে সকল বিলাসের উপকরণ। যে দেশে অন্ন বস্ত্রের অভাব-জনিত চীৎকারে কর্ণ বধির হইয়া যায়, সেই দেশে গোলাপ পুষ্পের মাধুর্য্য, উপকারিতা উৎকর্ষতা, সম্বন্ধে বর্ণনায় কি আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া কেবল কগ্ন ব্যক্তির প্রলাপ বাক্যের ন্যায়। অন্নাভাবে শীর্ণ ব্যক্তি গোলাপ বাগে শয়ন করিয়া কি সুষুপ্তি লাভ করিতে সক্ষম হইবে? তর্কের স্থলে অনেকে বলিতে পারেন, কি মনে করিতে পারেন যে, পুষ্পাদি বিক্রয়ের দ্বারাও কৃষকের লাভ হইতে পারে। কিন্তু সকল স্থানের কৃষকের ভাগ্যে তাহা ঘটে না সুতরাং নীতিশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতদিগের সূত্রানুসারে প্রথমতঃ এ সম্বন্ধে আলোচনা নিতান্তই অযৌক্তিক বলিয়া মনে করি-তেছি। তবে কেহ মনে করিতে পারেন মানব কি মাত্র অর্থলোলুপ হইয়া আজীবন অতীত করিবে, সুখ সৌভাগ্য ভোগের ইচ্ছা কি একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে? তাহা বলিতেছি না। প্রথমত সাধারণ ব্যব-হারীয় এবং লাভাকর বিষয়ের আলোচনা করিয়া পরে সময় এবং সুযোগ হইলে ঐ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

যে সকল কৃষি অত্যন্ত লাভজনক; কিন্তু বহুব্যয়সাধ্য অথবা বিলম্বে ফল লাভ হয় (দেশের অবস্থানুসারে) তাহাও প্রথম আলোচ্য বলিয়া

আমরা মনে করি না। দেশের কৃষিকার্য্য যাহাদের প্রতি ন্যস্ত রহিয়াছে তাঁহারা অধিকাংশই এত নিস্ব যে, ক্ষেত্রে শস্য জন্মিবার পূর্ব্বেই মহাজন হইতে ঋণ করিয়া উদর পূর্ণ করিয়া থাকে। তাহাদের পক্ষে বিলম্বে ফল লাভের কি বহু ব্যয়সাধ্য কৃষির আলোচনা উপন্যাসের ন্যায় হইয়া পড়িবে। তবে আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন তাহাতেও বরং ধনাভাব সম্বন্ধে অল্প আশঙ্কা থাকিতে পারে, কিন্তু দেশের লোক এখনও বিলম্বে ফল লাভের উপযোগী ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়-শীল হইয়াছেন কি না তৎপক্ষে গুরুতর সন্দেহ।* সুতরাং ইহাকেও আমরা প্রথম আলোচ্যস্থানীয় করিতে ইচ্ছা করি না।

আমাদের দেশের সাধারণ ব্যবহারীয় কৃষিই এস্থলে প্রথম আলোচ্য। তন্মধ্যে কৃষকের অধিক লভ্যজনক বিষয়ই অধিক লক্ষ্য। লতা গুল্ম ওষধি এই কয়েক প্রকার কৃষিকে প্রথম স্থানীয়, এবং বৃক্ষ জাতির (যাহা বিলম্বে ফলে) তাহা দ্বিতীয় স্থানীয়। যাহা ব্যয়সাধ্য এবং অধিকাংশ বিদেশীয় বণিকদিগের উপযোগী তাহা তৃতীয় স্থানীয়। উদ্যান সুসজ্জিত করণ উপযোগী শাখা পল্লব পুষ্পাদি বিশিষ্ট উদ্ভিদ আলোচনা চতুর্থ স্থানীয়। এই শ্রেণী চতুষ্টয়ের ক্রমিক আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য।

কৃষি নানা জাতীয় এবং সকল ঋতুতেই কোন না কোন কৃষি ফলিত হইয়া থাকে; তথাচ ইহাকে হৈমন্তিক এবং বর্ষা এই দুই প্রধান শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে। এই উভয় শ্রেণীর মধ্যেও একফসলা দোফসলা এবং বারমেসে কৃষি আছে। হেমন্ত ঋতুর অব্যবহিত পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইয়া অব্যবহিত পর পর্য্যন্ত যাহার কর্ষণ,বপন,রোপণ ইত্যাদি কার্য্য করিতে হয় জলবৃষ্টির আধিক্যে যাহা জন্মে না তাহারই নাম হৈমন্তিক কৃষি। যথা কলাই, মসুর,যব, গম, সরিষা,মরিচ, বেগুণ; আলু, মূলা,লাউ, কুমড়া, তরমুজ বাঙ্গি, ক্ষিরা, উচ্ছে ইত্যাদি। ঐ রূপ যাহা বর্ষা ঋতুর পূর্ব্ব হইতে কর্ষণাদি কার্য্য করিতে হয় এবং জল বৃষ্টি যাহাদের অধিক আবশ্যক, যথা ধান,তিল,পাট,

---

* আমরা এবিষয়ে ভুক্তভোগী।

শশা, ঝিঙ্গে, পটল, কাকরোল, কচু, করলা ইত্যাদিকে বর্ষাকৃষি বলা প্রচলিত আছে।*

মাঘ মাসকে কৃষিবৎসরের প্রথম বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। মাঘ মাস হইতে কৃষিকার্য্যের সূত্র আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ মাসেরই কৃষি কার্য্যের প্রণালী একটি একটি করিয়া আলোচনা করিব। এই সূত্রানুসারে বর্ষা কৃষি আমাদের সম্মুখবর্ত্তী হইতেছে। সুতরাং বর্ষাকালীয় কৃষি সম্বন্ধে আলোচনায় প্রথমে প্রবৃত্ত হইব।

ভারতবর্ষীয়দিগের পক্ষে ধান্যই অধিক উপযোগী এবং শ্রেষ্ঠ কৃষি। তুলনা করিলে এক মাত্র ধান্যকে ভারতবর্ষীয়দিগের জীবন ধারণের অবলম্বন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীন ঋষিগণও এই সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন।† সেই ধান্যই আমাদের সম্মুখবর্ত্তী বর্ষাকালীয় কৃষি। সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বপ্রকার ধান্যের বিষয়ই আলোচনা করা যাইতেছে, তৎপর বর্ষাকালীয় অপরাপর কৃষির প্রণালী ক্রমান্বয়ে বলা যাইবে।

কোন কোন দেশের কৃষকদিগের মাত্র কৃষি উৎপন্ন করিতে হয়। কৃষি জাত দ্রব্যকে রূপান্তর করিয়া (ইংরেজিতে ইহাকে Manufacture বলে) ব্যবহার উপযোগী করিতে হয় না। তজ্জন্য ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় আছে, তাহারা মাত্র কৃষকের নিকট হইতে কৃষিজাত দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়া শেষ নিজের কারখানায় আনিয়া তাহা ব্যবহার উপযোগী করিয়া বণিকদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহাতে শ্রম এবং ব্যয় তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া পরস্পর সকলেরই সুবিধা হয়। এইরূপ সম্প্রদায়গত কার্য্যবিভাগ থাকিলে একজনকে অধিক কর্ম্মশ্রান্তও হইতে হয় না। মনে করুন একজন কৃষক তাহার ক্ষেত্রে উত্তম নীল জন্মাইয়াছে, কিন্তু যতক্ষণ দস্তুরমত নীল প্রস্তুত করিতে না পারিবে ততক্ষণ তাহার কোন মূল্যই নাই,

---

* হৈমন্তিক এবং বর্ষা কৃষির সূত্র অনুযায়ী লক্ষণের দ্বারা সকল স্থানে ঐক্য হয় না।

† পরাশর কৃষিসংহিতায় বলিয়াছেন, "অন্নং প্রাণা বলঞ্চান্নমন্নং সর্ব্বার্থ সাধকং। দেবাসুরমনুষ্যাশ্চ সর্ব্বে চান্নোপজীবিনঃ। অন্নন্ত ধান্যসম্ভূতং ধান্যং কৃষিং বিনা নচ" ইত্যাদি।

হয় তো তাহার প্রস্তুতপ্রণালীর ত্রুটিতে নষ্ট হইলে, সমুদয় শ্রমই বিফল হইয়া গেল। যদি তাহাকে প্রস্তুত করিতে না হইত তবে এই উভয় প্রকার পরিশ্রম এবং ব্যয়ের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত না। আবার প্রস্তুত লইবে এসকল স্থানে তাহার বণিক নাই, হয় ত বণিকব্যবসা অবলম্বন করিয়া স্থানান্তরে যাইতে হইল, দৈবাযত্ত তাহার নৌকা ডুবিয়া সর্ব্বনাশ হইল। ত্রিবিধপ্রকারের ব্যয় এবং পরিশ্রম বৃথা হইল। আমাদের দেশে যেরূপ সকল গৃহস্থই অল্পাধিক ধানের চাষ করে, চীনেও প্রায় সকল কৃষকই নীল, চা ইত্যাদির চাস করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা কাঁচা পাতা কাঁচা গাছই বিক্রী করে। মরিচ দ্বীপে ইক্ষুর চাস অধিক। সেখানকার সকল কৃষককে ইক্ষু ভাঙ্গিয়া মাড়িয়া রস লওয়ার গুড় চিনি করার কারখানা করিতে হয় না। অনেক কৃষক ইক্ষু জন্মাইয়া (ক্ষেত সহ অথবা কাটিয়া নিয়া) বড় বড় কারখানায় বিক্রী করে। শেষ তাহারা মাড়িয়া রস লয়, চিনি গুড় প্রস্তুত করে। আমাদের দেশের কার্য্যের এরূপ সাম্প্রদায়িক বিভাগ সত্বর ঘটিবে বলিয়া কখনই আশা করা যাইতে পারে না। আমাদের দেশের কৃষকদিগকে কৃষিই শিখিতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজাতদ্রব্যের ব্যবহারোপযোগী (Manufacture) কার্য্যও শিখিতে হয়। নচেৎ তাহা কোন ব্যবহারেই আসে না। যথা, নীল, চা, ইক্ষু, এরারুট ইত্যাদি। কাজেই কৃষিপ্রণালীর সঙ্গে সঙ্গে তাহাও যৎসাধ্য আলোচনা করা আবশ্যক হইয়াছে।

কৃষিকার্য্যের, প্রত্যেক কৃষি, আয় ব্যয়, ক্ষতিলাভের হিসাব দেখাইয়া দেওয়া তত আবশ্যক বলিয়া বোধ করিলাম না, বিশেষতঃ অধিক সময়ের আবশ্যক। যাহা হউক, আমরা মোটের উপর এক কথা বলিতেছি, কৃষি-কার্য্য-উৎসাহি-মহোদয়গণ স্মরণ রাখিবেন, এমন কোন কৃষি নাই যে, কৃষকের ব্যয়িত মূলধনের দেড়া পরিমাণ উৎপন্ন না হয় অর্থাৎ মূল ধনের ½ লাভ না হয়। কৃষিবিশেষে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ পর্য্যন্তও লাভ হয়। অনেক গুলির স্থায়ি কৃষিতে ব্যয়িত মূলধনের ½ প্রতি বৎসর লাভ হইয়া থাকে যথা, চা। বোধ হয় নারিকেল সুপারিতেও বড় কম হয় না।

বাঙ্গলাভাষায় কৃষিসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অথবা উত্তম গ্রন্থ নাই বলিলে

অত্যুক্তি হয় না। যে দুই চারিখানি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার গ্রন্থকার কি লেখকদিগের মধ্যে অতি অল্প লোকেই নিজে কৃষিকার্য্য করিয়া নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। অধিকাংশ স্থলেই অনভিজ্ঞ কৃষকদিগের মত সংগ্রহ করিয়া (সংগৃহীত মতগুলির সামঞ্জস্য করিয়া প্রকাশ করিলেও এক রকম হয়) তাহার মধ্যে আবার নিজের কল্পনা শক্তি যোগ দিয়া একটী মত গঠিত করা হয়। সেই সকল মত, সকল স্থানে কার্য্যে পরিণত করা কষ্টকর, ব্যয়সাধ্য, তাহা করিলে কৃষকের কি লাভ হয় তৎপ্রতি চিন্তা অতি অল্পলোকেই করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ অনেক স্থলে সে সকল মতের অনুসরণ করিয়া উপযুক্ত ফল লাভও হয় না। একজন পরামর্শ দিলেন, গামলায় করিয়া কপির চারা দিয়া প্রতিদিন রাত্রে বাহিরে রাখ (বৃষ্টি হইলে তুলিতে হবে) দিনে ঘরে তুলিয়া রাখ অথচ বাতাস লাগিতে পারে। তার পর বড় হইলে তুলিয়া ক্ষেত্রে লাগাও।* মনে করুন এক বিঘা জমি কপি লাগাইতে হইলে কত গামলা (সেই গামলাও সকল স্থানে পাওয়া যায় না) আবশ্যক, প্রতিদিন তোলা এবং নামান কতজন লোকের কার্য্য? ইত্যাদি। আবার কৃষির আয়ব্যয় এবং লাভের যেসকল হিসাব দেখাইয়া থাকেন তাহাও অধিকাংশ স্থলেই অসম্পূর্ণ। যেমন নানাস্থানীয় মত সংগ্রহ করা চাই, তেমন কার্য্যে পরিণত করিয়া ফলাফল পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা প্রণয়ন করিলেই সুসঙ্গত হয়; তৎসঙ্গে নানাস্থানীয় মতও থাকে।

কতকগুলি কৃষি স্বভাবতঃই স্থানীয় জলবায়ু মৃত্তিকাদির প্রাকৃতিক শক্তিতেই ভাল জন্মে, অন্য স্থানে তাহা করিতে হইলেই অস্বাভাবিক চেষ্টার দ্বারা প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটাইতে হয়। বহু যত্ন চেষ্টা করিতে হয়।† যথা লবণাক্ত জলবায়ু প্রবাহিত স্থলে নারিকেল সুপারি ভাল

* ক্ষেত্রে সার দেওয়ার ব্যবস্থাদি অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে রহিয়াছে।

† তত্রাচ স্থানীয়শক্তির অযত্নকৃত কৃষিতে যে ফল লাভ করা যায়, অস্বাভাবিক স্থানের বহুযত্নে বহুচেষ্টায়ও সেরূপ ফল লাভ করা কষ্ট। ইহার শত শত দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। তবে চেষ্টায় না হইতে পারে তাহা নয় কিন্তু এত ব্যয় এত যত্ন আবশ্যক যে, সে বড়লোকের বাগান সাজান বই কৃষকের পক্ষে সম্ভবে না।

জন্মে,উষ্ণবায়ু প্রবাহিত স্থানে কার্পাস ভাল জন্মে, অপেক্ষাকৃত শীতপ্রধান স্থানে তামাকু ভাল জন্মে, উষ্ণ অথচ আর্দ্র (যে বায়ুতে জলীয়ভাগ অধিক থাকে) তদ্রূপ বায়ুবিশিষ্ট পার্ব্বতীয় স্থান ভিন্ন চা জন্মে না। ইত্যাদি। এই সূত্রানুসারে পাঠক একবার স্থানবিশেষের কৃষিপর্য্যালোচনা করিলেই দৃষ্টান্ত পাইতে পারিবেন। অস্বাভাবিক যত্ন চেষ্টা করিতে হইলেই তাহাতে কৃষকের লাভ থাকে না।

ধান্য।

ধান বহু প্রকার এবং প্রায় মাসেই ধান্য ফলিতে পারে এবং ফলিয়া থাকে।* কিন্তু বার মাস ফলিলেও ইহা বর্ষাকৃষি বলিয়াই প্রসিদ্ধ। ধান্য বহু প্রকার হইলেও প্রধান কএকটি জাতিতে বিভক্ত। জাতিবিভাগ সম্বন্ধে নানাবিধ মত দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক আমরা যে পর্য্যন্ত অনুসন্ধানে পাইয়াছি তাহাতে ছয়টি জাতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আবার তাহাদের একএক জাতির মধ্যেও বহু প্রকার ভেদ। প্রথমতঃ প্রধানতঃ আউস, আমন, বোরো, দিঘা, চেঙ্গরি, (কোন দেশে ইহাকে বাইটা বলে) এবং রাএন্দা। এই সকল ধানের জাতীয় লক্ষণ এবং প্রকৃতির দ্বারা ইহাদের পরিচয় করিতে হয়। রাএন্দা ধান ক্ষেত্রে বীজ বপন করার সময় হইতে নবম মাসের ন্যূনে প্রায় ফল প্রসব করে না। মাঘ মাসে কি ফাল্গুন মাসের প্রথমে এই ধান বাইন করিতে হয়। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে পাকে। যে দেশের মাঠ সকল জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে বর্ষার জল আসিয়া প্লাবিত করে, সেই সকল স্থান ভিন্ন প্রায় এই ধান্যের আবাদ দেখিতে পাওয়া যায় না। ফরিদপুর, যশোহরের পূর্ব্ব উত্তরাংশ এবং ঢাকার দক্ষিণ পশ্চিমাংশে এই ধানের আবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। চেঙ্গরি অথবা বাইটা প্রায় দুই মাসে আড়াই মাসে ফলে। এই জন্য বাইট দিনে ফলে বলিয়া বাইটা এবং আড়াই মাসে ফলে বলিয়া আড়াইয়া উহার খ্যাতি। এই ধান প্রায় সকল দেশেই ফলে। যে সকল দেশের মাঠ জলে ডুবিয়া

---

* অনেকে শুনিয়া থাকিবেন, উড়িষ্যার জগন্নাথের ভোগ নিত্য নূতন ক্ষেত্রস্থ ধান্যের তণ্ডুলের দ্বারা হইয়া থাকে।

যায় সে সকল স্থানের কৃষকেরা ভিটা অথবা বাস্ত মকম জমিতে এই ধান বুনিয়া থাকে। এই ধান বারমাসই ফলান যায়। দিঘা, ইহা জলপ্লাবিত দেশের উপযোগী ধান। জলের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় জলে ইহাকে মারিতে পারে না। চৈত্র বৈশাখ মাসে ইহার বাউন করে, আশ্বিন মাসের শেষ এবং কার্ত্তিকের প্রথমেই ইহা পাকে। অন্যান্য ধান অপেক্ষা এই ধানের তুষাংশ অতি কম। অন্যান্য কোনপ্রকার ধানেই প্রায় পাঁচভাগের তিনভাগের অধিক চাউল হয় না কিন্তু দিঘা ধানে প্রায় চারি ভাগের তিন ভাগ চাউল হয়। এই জন্য তদুপযোগী প্রদেশের কৃষকেরা আগ্রহের সহিত এই ধানের আবাদ অধিক করে। পূর্ব্বোক্ত চেঙ্গারি ও রাঙ্গা ধানে অর্দ্ধাংশেরও কম চাউল হয়।

বোরো ধান—ইহা দুই প্রকার। এক প্রকার চৈত্র মাসে পাকে; তাহাকে চৈত্রাবোরো বলে। অন্য প্রকার জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে, কাঁচিচর এবং বিল ভিন্ন এই ধান হয় না অর্থাৎ জলা কর্দ্দমিত স্থানে হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ধান অপেক্ষা এই ধানের ফলন বেশী, ধান অত্যন্ত মোটা। এই ধানের চাউলের ন্যায় কাবরা অর্থাৎ অপরিস্কার চাউল কোন ধানেই হয় না। আমন—বহুপ্রকার; অনূ্যন তিন শত প্রকারের নাম শুনাগিয়াছে। এক এক স্থানে এক এক আকৃতি এবং নামের বিভিন্নতা। বাথর গঞ্জের ধান দেখিয়া রঙ্গপুরের একজন বহুদর্শী কৃষক চিনিতে পারিবে না; রঙ্গপুরের ধান দেখিয়া শ্রীহট্টের কৃষকেরা চিনিতে পারিবে না। * বহু প্রকারের মধ্যে প্রধানত এবং প্রসিদ্ধ কয়েক প্রকারের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে। ১বেনাফুল, ২মানকচু, ৩বাঁশমতি, ৪বেথুলি, ৫রামশালি, ৬চামরমনি, ৭লেপা, ৮পারিজাত ৯পেশোয়ারী, ১০পানকাইচ, ১১ সীতাভোগ, ১২ পাটনাইছড়া, ১৩ পাথর কুচি, ১৪ ডহরনাগরা ১৫ বর্ব্বরি, ১৬ সোনা, ১৭ নিনামা, ১৮ বাসিরাজ, ১৯ করিমশাইল, ২০ মাগুর ২১ শাইল, ২২ ঝিঙ্গাশাইল, ২৩ কুকড়িশাইল ২৪ কার্ত্তিকশাইল, ২৫ মুগাশাইল, ২৬ কেউটেশাইল, ২৭ ময়ূরশালি,

---

* আমন জাতীয় ধানের মধ্যে কি ধান তাহাই চিনেতে পারিবে না নতুবা আউশ কি বোরো কিম্বা চেঙ্গরী অথবা দিঘা তাহা কৃষকেরা চিনিতে পারিবে।

২৮ চাপশাষ, ২৯ বনগোটা, ৩০ কৈজোড়, ৩১ কেলে, ৩২ উড়কি, ৩৩ বাচা, ৩৪ লুঞ্জবাইন, ৩৫ কনকচুর ৩৬ হিলেট, ৩৭ পরমান্নভোগ, ৩৮ কলাভোগ, ৩৯ রাজভোগ বা বাদসাভোগ, ৪০ বাঁশকাটা, ৪১ ডাঁষা-পাতি, ৪২ মধুমালক, ৪৩ মেথি, ৪৪ মেনকি, ৪৫ ঘিকলা, ৪৬ হরিনারায়ণ, ৪৭ কালিজিরা, ৪৮ মাট চাল, ৪৯ পুদিনি, ৫০ পানত্রাস, ৫১ কলহানা ৫২ মুক্তাহার, ৫৩ মুগি, ৫৪ শাকর খে'রা, ৫৫ পুরবি, ৫৬ বাঙ্গমোগা, ৫৭ বৌনা গয়া, ৫৮ কৃষ্ণচূড়া, ৫৯ ওড়কচু, ৬০ শালকেলে, ৬১ আধারমানিক, ৬২ কালামানিক, ৬৩ শফেদকলমা, ৬৪ পক্ষিরাজ, ৬৫ চিনিরোওয়া ৬৬ শৌলপনা, ৬৭ কলম, ৬৮ কাইখে, ৬৯ বেতী, ৭০ ফুলবেতী, ৭১ ডুরে লেটা, ৭২ বনছেওচ, ৭৩ কালকলসি, ৭৪ বয়রা, ৭৫ রাজামণ্ডল, ৭৬ মাল ভোগ, ৭৭ পুটেরাজবল, ৭৮ পিস্তিরাজ, ৭৯ কানাইবাঁশি, ৮০ চিত্রা, ৮১ ওকরঝুল, ৮২ বাগরঝুল, ৮৩ রাইমুখি, ৮৪ গোকুলশাইল, ৮৫ দুধসর, ৮৬ চিনিশর্কর, ৮৭ গোবিন্দভোগ। রঙ্গপুর, দিনাজপুর, মুরসিদাবাদ, হুগলি, বর্দ্ধমান বীরভুম, মেদিনীপুর, নদিয়া যশোহর, বাখরগঞ্জ, নওয়াখালী, ত্রিপুরা, ফরিদপুর, ঢাকা, পাবনা, রাজসাহি, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, প্রভৃতি জিলায় প্রসিদ্ধনামা কয়েকপ্রকার ধানের উল্লেখ করা গেল। ঐসকল স্থানের কৃষকদিগের নিকট হইতে কতকগুলি ধানের লক্ষণ আমরা লিখিয়া রাখিয়াছি বাহুল্য নিবন্ধন তাহার আর অধিক পরিচয়ে ক্ষান্ত থাকিলাম। আমন ধান রোয়া এবং বাইন উভয়বিধ প্রকারেই হইয়া থাকে। বর্ষার জলে যে সকল প্রদেশ কি স্থান প্লাবিত হইয়া যায় সেই সকল স্থানেই বাইন করিতে দেখা যায়। তদ্ভিন্ন সমুদয় স্থানেই প্রায় রোয়ার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল স্থানে বাইন হইয়া থাকে তাহারা ফাল্গুন হইতে বৈশাখের প্রথম অর্দ্ধ মধ্যেই বাইন শেষ করে। যে সকল স্থানে রোয়ার প্রচলন, কৃষকেরা বৈশাখ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত বীজ প্রস্তুত করে। রোয়া বাইন উভয়বিধ ধানই অগ্রহায়ণ মাস হইতে পৌষ মাসের মধ্যে পাকিয়া থাকে। কোন কোন অভিধান কারক আমন ধানকে শরৎপক্ক ধান বলিয়া মীমাংসা করিয়াছেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। ভাদ্র আশ্বিনকে শরৎ ঋতু বলিলে তাহার সহিত ঐকমত্য থাকিতে

পারে না, তিথি দ্বারাও মাস গণনার একটী প্রথা আছে। তদনুসারে যদি আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষ কি কৃষ্ণ পক্ষের কতক কার্ত্তিকেও পড়ে তত্রাচও অর্থ বলবৎ থাকে না) কোন কোন কৃষিতত্ত্ববিৎ বাইন ধানকে আমন সংখ্যা গণনা করেন নাই। আর একটী জাতি বিভাগ করিয়া "বাওরা" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, সেটী ভ্রম। বাইনেতে আমন ধান জন্মে। বাওরা বলিয়া ধানের একটী জাতি নাই। দুইটী শস্য একত্রে বাইন করিলে, যথা তিলের সঙ্গে ধান কি আশু আমন একত্রে বাইন করিলে তাহাকেই কৃষকেরা বাওরা বলিয়া থাকে। আমন ধানকে হেমন্ত-পক্ক ধান উপাধি প্রদান করিলে সুসঙ্গত অর্থ হয়। অন্যান্য জাতীয় ধানের সহিত আমনের আরও একটী বৈষম্য আছে, অন্য সকল প্রকার ধানই সকল সময়ে ফল প্রসব করে। কিন্তু আমন ধান শরৎ ঋতু ভিন্ন প্রসবিত হয় না মনে করুন যদি পৌষ মাসে কোন ক্ষেত্রে আমন ধানের বীজ বপন করিয়া তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী পরিচর্য্যা করা যায়, অর্থাৎ তাহার প্রকৃতি অনুসারে যেরূপ জল, বায়ু, ও তাপদ্বারা জীবিত থাকে এবং পরিবর্দ্ধিত হয়, অস্বাভাবিক যত্নের দ্বারায় সেই ক্রিয়া সম্পাদন করিলেও জীবিত থাকিয়া পরিবর্দ্ধিত হইবে কিন্তু সেই শরৎ ঋতু ভিন্ন ফল প্রসব করিবে না এবং হেমন্ত ঋতু ভিন্ন পরিপক্ক হইবে না; হয়তো সাধারণতঃ যে সময় প্রসব করিত কি পাকিত তাহার কিছু অগ্রে পাকিবে। কিন্তু অন্যান্য জাতীয় ধান এরূপ অস্বাভাবিক যত্ন করিলে তাহার ফল প্রসব করিবার কোন কালাকাল ভেদ থাকে না, সকল ঋতুতেই ফল হয় এবং পাকে। কেহ এ কথা মনে করিবেন না যে ইহারা পরস্পর ভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ। বহুদিনের ক্রমিক পরিবর্ত্তনে এবং চেষ্টায় হয়ত পূর্ব্বেই ফলিবে এবং পাকিবে। দিঘা, রাএন্দাও বোধ হয় ইহারই ক্রমিক পরি-বর্ত্তনের ফল। যেসকল ধান অন্য ঋতুতে প্রসবিত এবং পরিপক্ক হয় তাহাই আশু শ্রেণীতে পরিগণিত, সেই সকল ধানের তণ্ডুলই হিন্দু সমাজের দৈব কার্য্যে কি শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে ব্যবহৃত হয় না। আউস ধানও বহুবিধ প্রকার, তন্মধ্যে প্রধান কএক প্রকারের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে, সূর্য্যমণি ১, চন্দ্রমণি ২, রটে ৩, মাকবাউব ৪, খুকনি ৫, মধুমালতি ৬,

সন্ধ্যামণি ৭, আগুনবাণ ৮, সরৈল ৯, মুচাকানি ১০, টেপুণাইল ১১, কেবরি ১২, লোহাগাড়া ১৩, কাজলা ১৪, জুড়ে ১৫, পিপড়াসার ১৬, খেজুরছড়ি ১৭, সকমণি ১৮, ডুবাইল ১৯, ঘোষা ২০, কটকি ২১, কালাবকরি ২২, কালামইলকা ২৩, পেঁচেমইলকা ২৪, চোরালিয়া ২৫, কচড়ামুড়ি ২৬, তুলাগাদন ২৭, ক্ষুদাব্বন ২৮, নরই ২৯, বওলা ৩০, চাপড়ি ৩১, চেচেটে-বোয়ালিয়া ৩২, আশওড়িজল ৩৩, খাদ্দি ৩৪, ইত্যাদি।

আউষ ধান, বাইন এবং রোয়া উভয় প্রকারই হইয়া থাকে, কিন্তু সাধারণত প্রায় সকল স্থানেই বপন করিয়া থাকে। কোন কোন স্থানে মাত্র রোয়ার প্রথাও আছে। ফাল্গুন হইতে আরম্ভ হইয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমার্দ্ধ মধ্যে বাইন (রোওয়ার বীজ বাইন) সমাধা হইয়া থাকে। কোন প্রকার আউষ ধানই ভাদ্রমাস পর্য্যন্তের মধ্যে আর পরিপক হইতে বাকি থাকে না অর্থাৎ বাইনের অগ্রপশ্চাদনুসারে আষাঢ় হইতে পাকিতে আরম্ভ হইয়া ভাদ্রমাসে একবারে শেষ হয়।

যে সকল স্থান জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ কি আষাঢ়ের প্রথমেই বর্ষার জলে প্লাবিত হয় এবং কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত জলপূর্ণ থাকে, সেই সকল স্থানের কৃষকেরা মাঘমাসে বৃষ্টি হইলে ক্ষেত্র কর্ষণে প্রবৃত্ত হয়, ফাল্গুন মাসে বাইন করিতে আরম্ভ করে। যে বৎসর মাঘ ফাল্গুন মাসে বৃষ্টি না হয় কি কম হয়, সেই বৎসরই সে সকল স্থানে ধান্যাদি উত্তম হয় না। বাইন লামি হইয়া পড়াতে ধান বড় হইতে পারে না। ইতিমধ্যে বর্ষার জল আসিয়া ডুবাইয়া ফেলে। আমন, দিঘা প্রভৃতির ন্যায় আউষ ধান জলের সঙ্গে সঙ্গে তত বৃদ্ধি পাইতে পারে না। এই জন্যই আউষধান অগ্রেই বাইন করিতে হয়। যে সকল স্থানে ঐরূপ জলের আশঙ্কা নাই সেই সকল স্থানের কৃষকেরা বৈশাখ মাসে এবং জ্যৈষ্ঠমাসের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্তও বাইন করিয়া থাকে। কিন্তু বৈশাখ মাসে বাইন শেষ করাই উত্তম। যে সকল স্থানে আউষেরও রোয়া হইয়া থাকে সে সকল স্থানে, জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ করিয়া আষাঢ় মাসে ক্ষেত্রে রোপণ করাই প্রশস্ত। কেহ কেহ শ্রাবণের প্রথমেও রোপণ করিয়া থাকে কিন্তু তাহা ভাল হয় না। কিন্তু যে বৎসর আষাঢ় মধ্যে বৃষ্টি কম হয়, সে বৎসর কাজেই শ্রাবণ মাসে রোপণ করিতে হয়।

যে সকল ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে তাহার চতুর্দ্দিকের আইলের মধ্যে জল বদ্ধ হইয়া চাষেতে ক্ষেত্র অত্যন্ত কর্দ্দমিত না হইলে রোপণ করা যাইতে পারে না। বাইন অপেক্ষা রোপণের ক্ষেত্রে ফসল অধিক হয়। সকল স্থানে রোপণের সুবিধা হয় না, সময় পাওয়া যায় না এবং পরিশ্রমের আধিক্য হেতুক অধিকাংশ স্থলেই আউশের বাইন প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। যেসকল স্থানে জোয়ার ভাটা আছে সেই সকল স্থানেই রোয়ার প্রথা অধিক প্রচলিত এবং সুবিধাও অধিক।

আমনের প্রায় এইরূপই প্রণালী। আমনের রোয়া ভাদ্র মাস পর্য্যন্তও হইয়া থাকে কিন্তু শ্রাবণ মাসের মধ্যে রোপণ করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অম্বুবাচীর পরে বীজ প্রস্তুত করা এবং শ্রাবণ মাস অন্তে রোপণ করা নিকৃষ্ট কৃষিপ্রণালী। যে সকল স্থান বর্ষার জলে প্লাবিত হইয়া যায় কি জোয়ারের জল ক্ষেত্রে উঠে, সেই সকল স্থানে ক্ষেত্রে সার ব্যবহার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায় না। মাত্র জলপ্লাবিত প্রদেশের কৃষকেরা ক্ষেত্রের জল শুষ্ক হইয়া গেলে, ক্ষেত্রস্থিত নাড়া (ধান কাটিয়া নিলে যে ভাগ নীচে থাকে তাহাকে নাড়া বলে,কোন কোন স্থানে বিচালি বলে) পুড়িয়া দেয়, তৎপর ক্ষেত্র কর্ষণ করে। তখন নাড়ার ভস্ম ক্ষেত্রে মিশ্রিত হইয়া সারের কার্য্য করে। বস্তুত এইরূপ প্রদেশের ধান্যক্ষেত্রে সার ব্যবহারের আবশ্যক করে না। ক্ষেত্রে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পলি পড়িয়া উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করিয়া দেয়। যে সকল স্থানে পলি পড়ার সুবিধা না থাকে সে সকল স্থানে সার ব্যবহার না করিলে ক্ষেত্র সকল ক্রমে হীনবল এবং অনুর্ব্বরা হইতে থাকে। ধান্য ক্ষেত্রের জন্য পশুর মলমূত্র আর ভস্ম উত্তম সার। যে সকল স্থানে বাইনের দ্বারা আমন ধান জন্মে সে সকল ক্ষেত্র সাত আট বার চাষ না দিলে ক্ষেত্র কর্ষিত হয় না। রোয়া প্রদেশে প্রায় দুই চাষের অধিক আবশ্যক করে না। জোয়ার ভাটা প্রদেশে ক্ষেত্রবিশেষে চারি বারেও কর্ষিত হয়। রোয়া জমীতে প্রতি বিঘায় দশ সেরের অধিক বীজের আবশ্যক হয় না। ক্ষেত্রের উর্ব্বরতানুসারে ইহা অপেক্ষা কমও লাগিয়া থাকে অর্থাৎ ক্ষেত্র উর্ব্বরা হইলে গুছি অল্প এবং পাতলা করিয়া দিতে হয়। রোয়ার জমী অপেক্ষা বাইন

জমীতে বীজ অধিক লাগে। বাইনা জমির প্রতি বিঘায় অন্যূন বার সের অনধিক পোনের সের বীজ লাগিয়া থাকে। ধান প্রতিবিঘায় দশ মণ হইতে ত্রিশ মণ পর্য্যন্ত ফসল হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে কএকটী জিলার উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরবন বিভাগে ধান অধিক জন্মে। জোয়ার ভাটাই তাহার প্রধান কারণ, ক্ষেত্রে জোয়ারের জল উঠিয়া অপর্য্যাপ্ত পলি পড়ে, জলের অভাব এবং আধিক্য নিবন্ধন শস্যের হানির সম্ভব প্রায় ঘটে না। তবে কোন বৎসর বন্যা হইলে একেবারে অনিষ্ট হইয়া যায়। এবং ঐ সকল স্থানেই পোকার অত্যাচার অধিক দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। আমন অপেক্ষা আউষের বীজ একচতুর্থাংশ অধিক লাগে (যথা আটশেরের স্থলে দশ শের লাগে)।

যে সকল স্থানে বাইন ধান জন্মে সেই সকল স্থানে ক্ষেত্রে (কৃষি যন্ত্রের অধ্যায়ের আচরা যন্ত্র) আচরা ব্যবহারের আবশ্যক হয়। বৃষ্টির পর কয়েক দিন ক্রমাগত রৌদ্র হইলে ক্ষেত্রে চটা বান্ধিয়া যায়, তাহাতে ক্ষেত্রস্থ কৃষিকে বৃদ্ধি হইতে দেয় না। আচরা দিলে সেই সকল চটা ভাঙ্গিয়া যায় এবং ঘাস জঙ্গলও পরিষ্কার হয়। কোন ক্ষেত্রে ঘাস জঙ্গল এত অধিক হইয়া পড়ে যে আচরাতে তাহা একেবারে পরিষ্কার হয় না। সেই সকল ক্ষেত্রে প্রথমত আচরা, পরে কাঁচি দ্বারা নিরানি করিতে হয়। (ঘাস জঙ্গল বাছিয়া দেওয়াকে নিরানি বলে)। ক্ষেত্রে জল আসিবার পূর্ব্বে যাহারা নিরাইয়া শেষ করিতে না পারে, সেই সকল কৃষকদিগের শেষে অধিক কষ্ট করিতে হয়, ক্ষেত্রে জল উঠিয়া সাঁতার হইয়া পড়িলে দুইহাত পরিমাণ কএক খানি কলাগাছের খণ্ডের উপর চড়িয়া, অথবা কলসের মুখের দিকে সওয়া হাত দেড় হাত পরিমাণ একখানি বাঁশ অথবা কাঠ বান্ধিয়া কলস উপুড় করিয়া তাহার উপর চড়িয়া (মুখের দিকে যে কাঠ বান্ধা হইয়াছে তাহাতে পা রাখিয়া) জলে ভাসিয়া ভাসিয়া ক্ষেত্রের জঙ্গল কাঁচি দ্বারা কাটিয়া ফেলিতে হয়। এই প্রকার জঙ্গল পরিষ্কার করাকে 'ডোগান' বলে। কৃষকের পক্ষে ইহা গুরুতর শ্রমসাধ্য। যে সকল কৃষক ক্ষেত্র কর্ষণ কালে ঘাস জঙ্গলাদি উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া না ফেলে তাহাদিগকেই এই সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। ফরিদপুরেতেই

এই সকলের প্রচলন অধিক। তথাকার কৃষিকার্য্যে ভারি অসুবিধা। যদি "বাওরা" অর্থাৎ আউষ আমন একত্রে বাইন করিয়া আউষ ধান পাকিলে আমন ধানের গাছের অগ্রভাগসহ কাটিয়া আনা যায় তাহাতে আমনের কোন ক্ষতি হয় না। বাইন জমিতে শুষ্ক ধান্যই ছড়াইয়া দিতে হয়, বাইন করিতে একটুকু পারগতার আবশ্যক করে, নচেৎ বীজধান একস্থানে ঘন একস্থানে পাতলা হইয়া পড়ে। রোয়ার জন্য যখন বীজ প্রস্তুত করিতে হয়, তখন সেই পূর্ব্ব কথিত সময়ে পরিমাণ মত কতকটা স্থানে জল আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া (বৃষ্টি না হইলে জল সেচিয়া উঠাইয়া দিতে হয়) উহা উত্তমরূপে কর্ষণ করিতে হয়। আট নয় চাষের কমে হয় না। এইরূপে স্থান প্রস্তুত হইলে পরিমাণ মত ধান বাঁশের সাজিতে করিয়া সন্ধ্যার সময় জলে ভিজাইয়া প্রাতে তুলিতে হয়, পরে কলার পাতা কি কচুর পাতা দিয়া ঢাকিয়া দুদিন রাখিতে হয় (তিন দিবসের অধিক হইলে বীজ নষ্ট হইয়া যায়)। ইহাকে ওম দেওয়া বলে। তখন ধানের অঙ্কুর বাহির হয়। তৎপর উপরিস্থ পাতা ফেলিয়া দিয়া জলে ডুবাইয়াই তুলিয়া আনা যাউক কি কলসিতে এক কলসি জলই সাজিতে ঢালিয়া দেওয়া যাউক (ইহাকে ওমভাঙ্গা বলে) জল গুলি ঝরিয়া গেলে, ধান গুলিক ঢালিয়া হাতদিয়া নাড়িয়া দিতে হয়; নচেৎ অঙ্কুরে অঙ্কুরে জড়িত থাকে, তাহাতে বাইন করিবার এক এক স্থানে অধিক ঘন হইয়া পড়িয়া যায়। এইরূপে যে ধানের চারা উঠে তাহাকেই রোয়া ধানের বীজ বলে, বীজ এক ফুট পরিমাণ উচ্চ হইলেই তাহা রোপণের উত্তম সময়। বীজ ইহা অপেক্ষা ছোট হইলে ক্ষেত্রে জলে বীজ ডুবিয়া গিয়া অনিষ্ট হয় এবং অত্যন্ত লম্বা হইলেও জোড় কমিয়া যায় এবং বাতাসে বিচ্ছিন্নভাবে হেলাইয়া ফেলে। জোয়াড়ে কি বৃষ্টিতে ক্ষেত্রে জল অধিক হইয়া যদি ক্ষেত্রে শেওলা পড়ে তবে তাহা ফেলিয়া দিতে হয়। যে সকল জমি বসন্ত ঋতুতে ফাটিয়া যায় তাহা ধান্য চাষের জন্য উত্তম জমী।

"বোরোধান"—ইহা কৃষকের পক্ষে অত্যন্ত লাভের কৃষি। কিন্তু সকল স্থানে বোরোধানের উপযোগী ক্ষেত্র ঘটেনা। বিল অথবা চর ইহার উপযোগী। যে সকল বিল জায়গা কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে ভালরূপ শুখায় না,

সেই সমস্ত স্থানে এবং কাঁচি চরে ইহার আবাদ করিতে হয়। বোরো ধান রোয়া ভিন্ন বাহির হয় না। সকল স্থানে বোরোর ক্ষেত্র লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ করিবার আবশ্যক হয় না। বিল প্রদেশের কৃষকেরা অবস্থা বিশেষে আশ্বিন মাসের শেষ ভাগে কি কার্ত্তিক মাসে ক্ষেত্রের অল্প জল থাকিতে ক্ষেত্রের উপরে ধাপদল জঙ্গলাদি কোটা দ্বারা টানিয়া কিনারে আলির মতন বান্ধে। ক্ষেত্র পরিষ্কৃত এবং জল শুষ্ক হইলে, কর্দ্দমিত অবস্থায়ই, পা দিয়া হাত দিয়া কর্দ্দম বিলোড়িত করে। তৎপর হাত (যে ভাবে ঘর লেপে) দিয়া ক্ষেত্র সমান করিয়া বীজ ধান ছড়াইয়া দিতে হয়, পুনরায় অতি সাবধানে ঐরূপ হাত দিয়া লেপিয়া দিতে হয় নচেৎ বীজ ধানসকল পক্ষীতে খাইয়া যায়। এই প্রকার চারা দেওয়াকে লেপি দেওয়া বলে। বোধ হয় লেপিয়া দেয় বলিয়াই লেপি দেওয়া নাম হইয়াছে। যে স্থানে চারা দেওয়া হইল সেই স্থানের মৃত্তিকা শুষ্ক হইবার পূর্ব্বেই তাহার পার্শ্বস্থ (যে স্থান তদপেক্ষা নিম্ন) সেই স্থান পরিষ্কার করিয়া, পূর্ব্ব স্থানের বীজ সকল তুলিয়া পাঁচগুণা সাতগুণা ধানের গাছ একত্রে সেই নিম্ন স্থানে রোপণ করে। আবার তথাকার কর্দ্দম শুষ্ক হইবার পূর্ব্বেই পূর্ব্বোক্ত প্রকারের ন্যায় পরিষ্কৃত ক্ষেত্রে ঐ বীজ তুলিয়া রোপণ করে।* কিন্তু পূর্ব্ববারে যে পরিমাণে এক এক গুছি দেওয়া হইয়াছিল, তাহার এক তৃতীয়াংশ কম করিয়া দ্বিতীয় বারে এক এক গুছি দিতে হয়। স্থানের অবস্থানুসারে চারি পাঁচ বার এইরূপ স্থানান্তর করিতে হয়। কিন্তু প্রত্যেক বারেই গুছির পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু২ কম করিতে হয়, অবশেষ জল এবং কর্দ্দম বিশিষ্ট স্থানে রোপণ করিতে হয়। মাঘ মাসের প্রথম সময়ের মধ্যেই শেষ রোপণ সমাধা হইয়া থাকে। চৈত্র মাসে এই ধান পাকে। কাঁচি চরের বোরো ধানের প্রণালী প্রায় এইরূপ। যে সকল চড়ে বোরো ধান রোপণ হইয়া থাকে, রোপণ কালে কৃষকেরা ক্ষেত্রের উপর দিয়া হাটিয়া যাইতে পারে না। হামাগুড়ি দিয়া এবং কলাগাছের এক এক খানি খণ্ড বুকের নীচে দিয়া

* এইরূপ পুনঃ পুনঃ স্থানান্তরে রোপণ করাকে পাতো দেওয়া বলে।

বীজ রোপণ করে। জ্যৈষ্ঠাবোরোরও প্রণালী এইরূপ; কেবল স্থানীয় অবস্থানুসারে কালভেদে রোপণ বপন করিতে হয়। তাহাতেই ফল অগ্র পশ্চাৎ হয়। চৈত্রাবোরোর ক্ষেত্রের ধান কাটিয়া নিয়া পুনরায় আমন ধান বাইন করাইতে পারে কিন্তু জ্যৈষ্ঠাবোরোর ক্ষেত্রে আর তদ্রূপ সুবিধার সময় থাকে না।

শ্রীহট্ট জিলায় কোন কোন স্থানের বোরো ধানের আবাদ প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখা গিয়াছে। শ্রীহট্টের কোন স্থানের কৃষকেরা বিলা জমিতে কর্দ্দমিতাবস্থায় চাষ দিয়া এবং জল সেচিয়া অধিক কর্দ্দম করিয়া তাহার মধ্যে ধান ছড়াইয়া দিয়া বীজ প্রস্তুত করে। তারপরেও তদপেক্ষা নিম্নতর ক্ষেত্র ঐরূপে চাষ দিয়া জল সেচিয়া কর্দ্দম করিয়া (রোপণের উপযুক্ত হইলে) বীজ রোপণ করে। ইহারা পাতো দেয় না, চাষ অতি অল্প দিয়া থাকে, তিন চারি চাষের অধিক দিতে হয় না। কোন কোন কৃষিতত্ত্ববিদ্ লিখিয়াছেন "আঠাল মাটির বাটুলের সহিত ধান সংযোগ করিয়া নলের চুঙ্গির মধ্যে দিয়া বোরো ধান রোপণ করা হয়।" আমরা এপর্য্যন্ত ইহার কোন অনুসন্ধান পাইতে পারি নাই এবং কতকটা কারণের দ্বারা তাহা অযৌক্তিক বলিয়াও বোধ হয়। পর্ব্বতের নিকটস্থ ঝিলে যাহারা বোরোর আবাদ করে, তাহাদের পক্ষে একটা সুবিধা আছে। পর্ব্বতের ঝর্ণা বহিয়া ক্ষেত্র জলপ্লাবিত করিয়া রাখে। বোরো ধান জল ভিন্ন হয় না এই জন্য কোন কোন স্থানে ইহাকে জলি ধান বলে বোরোরপ্রতিবিঘায় আট লোপের অধিক বীজ লাগে না। অন্যান্য ধানের তুলনায় বোরোর ফলন অধিক।

"দীঘা, রাএন্দা"—এ দুই জাতীয় ধানেরই কৃষি প্রণালী একরূপ। ইহা জল প্লাবিত দেশের উপযোগী ধান। যে সকল স্থানের মাঠে বর্ষার জল অধিক না হয়, সেসকল স্থানে এ ধান হয় না। ইহার আবাদ প্রণালী তদ্বিধ স্থানের আউব আমন প্রভৃতি বাইনা ধানের ন্যায়। রাএন্দা ধানের নামান্তর ও রূপান্তর এপর্য্যন্ত অনুসন্ধানে পাওয়া যায় নাই। কিন্তু দীঘার মধ্যেও দশ পনর রকম নাম আছে, যথা—পুরাদিঘা১ ভাওয়ালিয়া দিঘা২ সোণাদিঘা৩ কালাদিঘা৪ মানিকদিঘা৫ ইত্যাদি।

রাএন্দা অপেক্ষা দিঘার ফলন অধিক। এই ধানের আর একটী ভিন্ন প্রকৃতি দেখা গিয়াছে। ক্ষেত্রে অধিক জল হইয়া অনেক দিন থাকাতে ইহার মূল পচিয়া যায়, শেষে ক্ষেত্রের মৃত্তিকার সহিত আর কোন সংশ্রব থাকেনা ;* এমন কি (পার্শ্বস্থ ক্ষেত্র পতিতাবস্থায় থাকিলে) যদি অধিক বাতাস হয় তবে ক্ষেত্রস্থ সমুদয় ধানসহ পার্শ্বস্থ ক্ষেত্রে চলিয়া যায়। †

'চেঙ্গরি' অথবা 'ষাইটা' ধান—ইহা প্রায় বার মাস ফলে। যে সকল ক্ষেত্রে বর্ষার জল কি জোয়ারের জল উঠে, তদ্রূপ ক্ষেত্রে এই ধান জন্মে না ; টান ভূমিতেই এই ধানের চাষ হইয়া থাকে। এই ধান বাইন ভিন্ন রোয়ার প্রথা কোন স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় নাই। বোরো ভিন্ন অন্যান্য ধানের চাষ অপেক্ষা চেঙ্গরিতে চাষ কম লাগে। পাঁচ চাষের অধিক দিতে হয় না। চেঙ্গরি ধান পাঁকিও ধুলিয়া ‡ উভয় প্রকারেই বাইন করা যায়। প্রতিবিঘায় বিশ সের বীজ লাগে। ক্ষেত্রের উর্ব্বরতানুসারে দুই একসের কমও লাগিয়া থাকে। কোন জাতি ধানেরই এত বীজের আবশ্যক হয় না। ইহার ফলন ও অনেক কম। ইহা কৃষকের লাভ্যজনক কৃষি নয়। তবে একটা সুবিধা এই যে, অল্পদিনে ফসল হয় এবং একটি কৃষি ফলাইয়া অন্য আর একটি কৃষি ফলাইবার উপযুক্ত সময় আসিবার মধ্যে একবার চেঙ্গরি বাইন করিয়া লওয়া যায়।

ধান মাড়িবার প্রথা—ইহা স্থান বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী। কোন কোন স্থানের কৃষকেরা, ধান কাটিয়া একেবারে বাড়ীতে আনে ; কোন স্থানের কৃষকেরা ক্ষেত্রের নিকটে, কোন এক স্থানে খোলা করিয়া রাখিয়া

---

* ধান্যের প্রসবিত অবস্থায় এইরূপ দেখা গিয়াছে।

† পার্শ্বস্থ ক্ষেত্রের মালিক ঐ ধান খুঁটা ইত্যাদির দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখাতে উভয় কৃষকে বিবাদ হইয়া মোকদ্দমা পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে।

‡ বৃষ্টির জলে কি জল সেঁচিয়া ক্ষেত্রের কর্দ্দমিত অবস্থায় যে বাইন করে তাহাকে পাঁকি বলে। শুষ্ক ক্ষেত্রের ধূলিবৎ অবস্থায় বাইন করাকে ধূলিয়া বলে।

ধান মাড়িয়া থাকে। গাছ হইতে ধান বিভিন্ন করিয়া লওয়াকে কোন দেশে মলিয়া লওয়া, কোন স্থানে নাড়িয়া লওয়া বলে। গাছ হইতে ধানকে বিভিন্ন করিবার প্রণালীও ভিন্ন২ রূপ। কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলে, ধান মাড়িবার নিয়ম ধোবারা যেরূপ একখানি তক্তার উপর কাপড় কাচে, সেইরূপ একখানি তক্তার উপর (সম্ভব মত) ধানের এক একটী গোছা লইয়া সেইরূপ আছাড়িতে থাকে তাহাতেই সমস্ত ধান পড়িয়া যায়। পূর্ব্ববাঙ্গলায় সমুদয় স্থানের কৃষকেরাই ধানের গাছসকল একস্থানে ছড়াইয়া জমা করিয়া তাহার উপরে পাঁচ সাতটি গরু একত্র জুড়িয়া ঘুরাইতে থাকে এবং পুনঃ পুনঃ ঐ ধানের গাছ সকল ঝাড়িয়া উল্টাইয়া দিতে হয়; তাহাতে সমস্ত ধান পড়িয়া যায়। অল্প ধান হইলে কৃষকেরা আপনারাই পা দ্বারা মাড়িয়া লয়। ইহাকে কোন স্থানে মলন, কোন স্থানে মাড়া দেওয়া বলে। পশ্চিমবাঙ্গলার ধান মাড়িবার প্রণালীতে কৃষকের পরিশ্রম অধিক হয় বটে, কিন্তু একটু সুবিধা আছে, বিচালি (খড়) ভাল থাকে, অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। তথাকার কৃষকেরা এক বিঘা জমির বিচালি আট দশ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিতে পারে, এবং সামান্যাবস্থার লোকেরা বিচালি দ্বারা ঘরও ছাইয়া থাকে। অন্য দেশের পক্ষে এরূপ প্রণালীতে ধান মাড়িলে সে সকল সুবিধা ঘটেনা; কারণ অন্য দেশে বিচালির ওরূপ ব্যবহার নাই এবং অত অধিক মূল্যেও বিক্রীত হয় না।

কুচবেহার অঞ্চলে একরকম ধান আছে। তাহার এক একটি ধানের মধ্যে দুটি তিনটি করিয়া চাউল হয়; সে দেশে তাহার অন্যনাম থাকিলেও আমরা তাহাকে 'যমজ প্রসবি' নাম করিয়াছি। আমেরিকা হইতে আর এক প্রকার ধান অল্প দিন যাবৎ ভারতবর্ষে আগত হইয়াছে, তাহার নাম "নিউ গ্রাণেডা"।* এই ধান একবার বুনিলে সেই এক গাছ হইতেই তিনবার ফসল কাটিয়া লওয়া যায়। প্রথমবার কাটিয়া লইলে পর অনধিক একমাসের মধ্যেই পুনরায় ধান হয়। এইরূপে তৃতীয় বারও অনধিক এক মাসের মধ্যেই পুনরায় ধান হয়, পার্ব্বতীয় প্রদেশের টাম

* এই ধান ওষধি জাতীয় উদ্ভিদের লক্ষণের সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় প্রমাণ করিয়াছে।

জমিই এই ধান চাসের উপযোগী এই ধান্যে অধিক জল দিতে হয় না; ইহার কর্ষণ প্রণালী ভিন্নরূপ। যে ক্ষেত্রে এই ধান জন্মাইতে হইবে, প্রথমত সেই ক্ষেত্রের উপরিস্থ ঘাস জঙ্গলাদি অগ্নিবারা পুড়িয়া কি কোদাল দ্বারা চাছিয়া পরিষ্কার করিতে হয়। মুঠুম হাত অন্তর দুই কি আড়াই ইঞ্চি পরিমাণ এক একটি গর্ত্ত করিয়া তাহাতে চারি পাঁচটি করিয়া ধান বপন করিতে হয়। এক খানি কাঠির মাথা চোখা করিয়া মাটির মধ্যে পুতিয়া দিলেই ঐরূপ গর্ত্ত হয়। ইহা আবাদে কোন পরিশ্রম নাই কৃষকের পক্ষে ইহা অত্যন্ত সুবিধা জনক, আমরা এপর্য্যন্ত বহুচেষ্টায়ও বীজসংগ্রহ করিতে না পারায় ইহার চাষ করিতে পারি নাই। (ভারতশ্রমজীবী হইতে সংগ্রহ)।

ফরিদপুর ও পাবনা জেলার মধ্যে নদিয়া জিলার বনগ্রাম প্রভৃতি স্থানে জলি ধান্য নামে এক প্রকার ধান্য জন্মে। পদ্মানদীর এবং যমুনা নদীর তীরস্থ ভূমিতে ইহার চাষ আবাদ হইয়া থাকে। জলি ধান্যের ভূমিতে বৎসরের মধ্যে তিনরকম ফসল পাওয়া যায়। মাঘ ফাল্গুন মাসে ভূমিতে চাষ দিয়া ভূমি প্রস্তুত করিবে, ফাল্গুনের শেষে কিম্বা চৈত্র মাসের প্রথম পক্ষের মধ্যে ভূমিতে বীজ বপন করিতে হইবে।

এক বিঘা জমিতে ৯ সের জলিধান্যের বীজ এবং ৩ সের আমন ধানের বীজ এক সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া বাইন করিবে। কিছু দিন পরে যখন দেখিবে ধানের গাছ সকল ৩। ৪ অঙ্গুলি পরিমাণ হইয়াছে তখন ঘাস ইত্যাদি জঙ্গল একবার বিদা অর্থাৎ আচরা এবং মই দিয়া ক্ষেত্রস্থ মৃত্তিকাকে আলগা করিয়া দিতে হয় তাহাতে জঙ্গলাদিও পরিষ্কার হইয়া যায়। বৈশাখ মাসে জলি ধান্য পাকে, জলি ধান কাটা হইলে বৃষ্টির জলে যখন দেখিবে ভূমি উত্তম রূপে সিক্ত হইয়াছে, তখন একবার মাত্র মই দিয়া পূর্ব্ব ফসলের গাছ সকল ভাঙ্গিয়া দিতে হয়, এইরূপ মই দিয়া দিলে আমন ধানের বিশেষ উপকার হয়; আমন ধান কাটিয়া ঐ জমিতে খেসারি মটর বাইন করা যায়। ইহাতে কোন প্রকার পাইট আবশ্যক করে না। বর্ষার জলে যে জমি ডুবিয়া যায় এবং যে পলি পড়ে তাহাতে উত্তম ফসল হইয়া থাকে।

তিল।

মাঘ ফাল্গুন মাসে বৃষ্টি হইলেই ক্ষেত্রে দুই তিন খানি চাষ দিয়া রাখিতে হয়, পুনরায় চৈত্র মাসে বৃষ্টি হইলে তখন আর দুই তিন খানি চাষ দিয়া তিল বাইন করিতে হয়। তিলের চাষে ছয় চাষের অধিক দিতে হয় না, অথবা ক্ষেত্র অধিক গভীর খনন করিতে হয় না, ছয় ইঞ্চি পরিমাণ খনিত হইলেই যথেষ্ট হয়। তিল প্রায় সাধারণতঃ সকল মৃত্তিকায়ই জন্মে, যে সকল ক্ষেত্র জ্যৈষ্ঠ মাসেই বর্ষার জলে ডুবিয়া যায় তাহাতে তিল বাইন করা বিধেয় নহে। সাধারণতঃ কৃষকেরা তিল ক্ষেত্রে সার ব্যবহার করে না; কিন্তু সার দিলে যে উপকার হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিল ক্ষেত্রে গোবর আর ভস্ম উত্তম সার। প্রতি বিঘায় তিন মণ গোবর এক মণ ভস্ম দেওয়াই ব্যবস্থা। এই পরিমাণে ক্ষেত্রে সার দিলে ও বিধিমত যত্ন চেষ্টা করিলে প্রতিবিঘায় ১৭ সতর আঠার মণ তিল জন্মিয়া থাকে; সাধারণত কৃষকেরা ১২ মণের অধিক তিল প্রতি বিঘায় জন্মাইতে পারে না।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সার প্রয়োগ এবং ক্ষেত্রকর্ষণ হইলে ক্ষেত্রের মৃত্তিকা রসযুক্ত থাকিতে বীজ ছড়াইতে হয়, প্রতি বিঘায় ২ দুই সেরের অধিক বীজ আবশ্যক করে না, বীজ, ক্ষেত্রে বুনিবার ২ দুই দিন পূর্ব্বে কোন একটা পাত্রে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখিতে হয়, একদিন এইরূপে ভিজিলে জল ছাকিয়া ঘুটিয়ার ছাই রাখিয়া ছায়াতে একটা চাটাইর উপর ছড়াইয়া রাখিতে হয়, পরদিন সকালে ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিতে হয়।

চাড়া একটু বড় অর্থাৎ পাঁচ ছয় অঙ্গুলি পরিমাণ হইলে আচরা দিয়া ক্ষেত্রের মাটি আলগা করিয়া দিতে হয় তাহাতে ঘাস জঙ্গল ও পরিষ্কার হইয়া যায়, আচরার দ্বারা যদি ক্ষেত্রের জঙ্গল ভালরূপ পরিষ্কার না হয় এবং তিলের গাছ সকলের ঘনতা দূর না হয়, তবে নিয়ানির দ্বারা ঐ সকল কার্য্য করিতে হয়, তিলের গাছ ঘন হইলে তাহাতে ফসল ভাল হয় না, তিলের গাছ সকল একটি হইতে অপরটি পরস্পর ছয় হইতে আট ইঞ্চি পরিমাণ ব্যবধান থাকা উচিত।

কোন কোন স্থানের কৃষকেরা আউষধান আর তিল একত্রে বাইন করিয়া থাকে, এই প্রকার কৃষি প্রণালীকে আমরা উত্তম ব্যবস্থা বলিয়া

স্বীকার করি না। ইহাতে তিল কি ধান উভয়ের একটিও ভাল হয় না। এই দুই কৃষির মোট সমষ্টিতে কৃষকের যে লাভ হয়, একমাত্র তিল জন্মাইলেও তদপেক্ষা অধিক হইতে পারে।

সাধারণতঃ তিল জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে, তবে বাইনের অগ্রপশ্চাদনুসারে কিছু অগ্রে বা পরেতেও পাকিতে পারে। তিল পাকিলে গাছের গোড়া সমেত কাটিয়া লইয়া, একস্থানে পালাদিতে (কোন কোন স্থানে জাক দেওয়া বলে) হয়। জাক দেওয়ার সময় কৃষকের সতর্কতার আবশ্যক করে। গাছের অগ্রভাগ সমুদয় এক স্থানে রাখিয়া গোড়া গুলি বাহিরের দিকে রাখিতে হয়, পরে উপরিভাগে একটা চাটাই দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয় যে ফল সকলের মধ্যে অধিক বাতাস প্রবেশ করিতে না পারে। পাঁচ কি ছয় দিন এইভাবে রাখিয়া, শেষ পালা ভাঙ্গিয়া গাছ গুলি একটু রৌদ্রে দিয়া একখানি লাঠি দ্বারা বাড়ি দিতে হয় এবং ক্রমে উলটাইয়া দিতে হয়, তাহাতেই তিল সকল মাটিতে পড়িয়া যায়। তিল জাক দিবার সময় কৃষকের অসতর্কতা এবং ত্রুটীতে অনেক তিলের মধ্যে শস্য বিহীন তুষ হইয়া যায়। তিল দুই প্রকার; কালতিল এবং পাণ্ডু তিল। পাণ্ডুতিল অপেক্ষা কাল তিলে শস্য অধিক হয়, পাণ্ডু তিল অপেক্ষা কাল তিলে তৈলও অধিক হয়। ঢাকা, ফরিদপুর এবং যশোহরের পূর্ব্ব উত্তরাংশে তিলের চাষ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল ক্ষেত্রে বর্ষার জল উঠিয়া পলিপড়ে কিন্তু একেবারে জ্যৈষ্ঠ মাসেই ডুবিয়া যায় না সেই সকল স্থানে তিল সাধারণতঃ ভাল জন্মে।

পাট।

"পাট"—অধুনা বিদেশীয় বাণিজ্যের দ্বারা পাটের অত্যন্ত আদর বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং কৃষকের পক্ষে ইহা একটী অতিশয় লাভাকর বস্তু হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্ব উত্তর বাঙ্গলাতেই পাটের আবাদ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। পাট সাধারণতঃ দোয়াশ মৃত্তিকায় ভাল হয়, তবে সমপরিমাণে বালির ভাগ না থাকিয়া আঠালের ভাগ অধিক থাকিলেও ক্ষতি হয় না,

কিন্তু বালির ভাগ অধিক হইলে পাট ভাল জন্মে না। যে সকল স্থান বর্ষার জলে ডুবিয়া পলি না পড়ে কি বৃষ্টির জলে চতুর্দ্দিকের মাটী ধুইয়া আনিয়া যে ক্ষেত্রে জল দাঁড়াইতে না পারে, তদ্রূপ স্থান কি ক্ষেত্র পাটের জন্য উত্তম ব্যবস্থা নয়। পাটেরক্ষেত্রে কৃষকেরা সার ব্যবহার করে না। উক্ত বিধ ক্ষেত্রে সার ব্যবহার ভিন্নও যে পাট উত্তম জন্মে পলিই তাহার একমাত্র প্রধান কারণ, উক্তরূপ ক্ষেত্র ভিন্ন পাট জন্মাইতে হইলে ক্ষেত্রে সার ভিন্ন পাট ভাল জন্মে না, ক্ষেত্রের অবস্থানুসারে প্রতি বিঘায় চারি হইতে আট মণ গোবরের সার ব্যবহার করিতে হয়। লবণাক্ত মাটীতে পাট উত্তম জন্মে না। অনেকের এইরূপ ভ্রান্তি আছে যে, পাটের ক্ষেত্র জলে ডুবিয়া অল্লাধিক পরিমাণে জল গাছের গোড়ায় না পাইলে পাট জন্মে না, তাহা নয় বস্তুতঃ পাট কিছু জলপ্রিয় উদ্ভিদ বর্ষায় হউক বৃষ্টিতে হউক জলের আবশ্যক, পাটক্ষেত্র জলে ডুবিলেও গাছ মরে না * এবং টান জমিতেও পাট জন্মে। † ক্ষেত্রের মৃত্তিকা সিক্ত থাকা আবশ্যক, কেবল সার দিতে হয় বলিয়াই সাধারণতঃ টান জমিতে পাটের আবাদ কেহ করে না। পাটের ক্ষেত্রে সার দিতে গেলে লাভও কমিয়া যায়।

পাট বর্ষাকালীয় কৃষি, মাঘ ফাল্গুন মাসে বৃষ্টি হইয়া ক্ষেত্রের মৃত্তিকা সজল হইলেই পাটের চাষ আরম্ভ করিতে হয়। সাত আট চাষের কম উত্তম কর্ষিত হয় না, সমপরিমাণে দোয়াশ মৃত্তিকায় ক্ষেত্রে সাত চাষই হয়, আঠাল ভাগ অধিক থাকিলে আট চাষের কমে হয় না, পাটের প্রতি বিঘায় তিন সেরের অধিক বীজ লাগে না, চৈত্র মাসে বৃষ্টি হইয়া ক্ষেত্রের মৃত্তিকা সিক্ত হইলেই ক্ষেত্রে বীজ বুনিতে হয় বর্ষা বৃষ্টির অবস্থানুসারে বৈশাখ মাসের মধ্যে বীজ বুনন কার্য্য সমাধা হয়।

পাটের গাছ সকল অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণ কি কিঞ্চিৎ ন্যূনাতিরেক হইলে আচড়া দিয়া পরে নিরানি দিতে হয়। আচড়া দিয়া নিরানি দেওয়াতে নিরানির অনেক সাহায্য হয়। নিরানি ভিন্ন পাট ভাল হয় না।

---

* একেবারে গাছের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত ডুবিয়া গেলে নষ্ট হয় এবং পাটক্ষেত্রে অনেক দিন পর্য্যন্ত জল থাকিলে আগ নরম হইয়া যায়।

† পাটকে উভচর উদ্ভিদ নাম দেওয়া অসঙ্গত মনে করি না।

নিরানিতে যেমন ঘাস জঙ্গল পরিষ্কার করিতে হয় তেমন পাটের গাছও পাতলা করিয়া দিতে হয়। চারি অঙ্গুলি হইতে ছয় অঙ্গুলি পরিমাণ একটী হইতে অপরটী ব্যবধান থাকা উচিত। অত্যন্ত ঘন হইলে গাছ মোটা হইতে পারে না, আবার অত্যন্ত পাতলা হইলেও গাছে ডাল পালা হইয়া খারাপ হয়। ডাল পালা বিশিষ্ট গাছের পাট লওয়াতে (১) অসুবিধা হয়। আষাঢ়ের শেষ হইতে পাট কাটা আরম্ভ হইয়া ভাদ্রমাস পর্য্যন্ত পাট কাটা হইয়া থাকে, কিন্তু শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত পাট কাটাই প্রশস্ত। শ্রাবণ মাসান্তে যে পাট কাটা হয়, তাহা ভাল পরিষ্কার হয় না, গাছ পাকিয়া শক্ত হইয়া যায়। কোন কোন স্থানের কৃষকেরা পাটের গোড়া কাটিয়া আনে—কোন স্থানের কৃষকেরা গাছের গোড়া সহিত তুলিয়া আনে, গোড়া সহিত তোলা পাটে ওজন কিছু বেশী হয় বটে কিন্তু দামে তেমন কম হয়, বিশেষতঃ লইবার অসুবিধা হয়। গোড়া কাটিয়া আনাই ভাল।

পাট কাটিয়া আনিয়া ছোট ছোট আটি বান্ধিতে হয়, পরে তাহার কতক গুলি করিয়া আটি একত্রে জড় করিয়া জলের মধ্যে রাখিয়া উপরে কতক গুলি ঘাস-জঙ্গল দিয়া কোন ভার পদার্থের (গাছের মোটা খণ্ড) দ্বারা চাপ দিয়া রাখিতে হয় (২)। স্রোতোবিহীন বদ্ধ জলে দশ বার দিনে পাটের যাক আসে (৩)। স্রোতোপূর্ণ জলে কিছু কালগৌণ হয়, কারণ ময়লা জমিয়া সত্বর সত্বর পচাইতে পারে না, স্রোতে ভাসাইয়া লয়। স্থান বিশেষে পোনের বিশ দিনও লাগে; পাট কম পচিলে ভাল পরিষ্কার হয় না। অধিক পচিলে আঁশ নরম হইয়া খসিয়া যায়।

পাট যাক হইতে তুলিয়া, একএকটি গাছের গোড়ারদিক হাত দিয়া ছাড়াইয়া বাঁ হাতের মধ্যে গাছটি রাখিয়া ডান হাত দ্বারা পাট টান দিলেই ছাড়িয়া আসে। এইরূপে ছাড়ান হইলে ছোট ছোট মুঠা বান্ধিয়া এক দিন কি দুই প্রহর কাল জলে ফেলিয়া রাখিয়া শেষে জলের

(১) গাছ হইতে পাট ছাড়ানকে পাট লওয়া বলে।
(২) এই প্রকার রাখাকে যাক দেওয়া বলে।
(৩) পাটের গাছ পচানকে যাক আসা বলে।

উপর আছাড়িয়া পরিষ্কার করিতে হয় এইটিই সাধারণ প্রচলিত প্রথা। এই প্রকার পাট লওয়াতে যে সময় লাগে তদপেক্ষা অল্প সময়ে এবং সহজে লওয়া যাইতে পারে। থাক হইতে পাটের আটি বাহির করিয়া জলের মধ্যে রাখিয়াই হাতের দ্বারা গোড়ার পাট গুলি ছাড়াইয়া, নৌকার বৈঠার ন্যায় একখান কাঠের ছোট বৈঠার দ্বারা গোড়ার বাড়ি দিতে হয়। আটির নিচে বাঁ হাত রাখিয়া উল্‌টাইয়া দিতে হয়, যেন সমুদয় গাছের গোড়া গুলি ভাঙ্গিয়া যায়। পরে ঐ গোড়ার আলগা পাট ধরিয়া জলের মধ্যে ঝাঁকি দিলে গোড়া গুলি বাহির হইয়া যায়। এবং গাছের মাথার দিগেও ঐরূপে ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। শেষে গোড়ার দিকের পাট ধরিয়া জলে ঝাঁকিলেই গাছ সকল আলগা হইয়া বাহির হইয়া যায় এবং পাট ধোয়ার কার্য্যও সমাধা হয়। দেখা গিয়াছে, পূর্ব্বোক্ত প্রকার তিন জনে যে কাজ করিতে পারিত, এই প্রকারে এক জনে সেই কার্য্য করিতে পারে।

উত্তরপূর্ব্ব বাঙ্গলা পাটের জন্য বিখ্যাত কিন্তু উত্তরবাঙ্গলা অপেক্ষা পূর্ব্ববাঙ্গালায় পাট অধিক জন্মে। রঙ্গপুর, ঢাকা, এবং ময়মনসিংহের কোন কোন অংশে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম পাট জন্মে, ফরিদপুরেও পাট অত্যন্ত জন্মে বটে কিন্তু সে পাট উত্তম নয়।

সাধারণতঃ পাটের প্রতিবিঘায় বার হইতে পনর মণ পর্য্যন্ত পাট হইয়া থাকে, কিন্তু ভালরূপ যত্ন চেষ্টা করিলে বিশ মণ পর্য্যন্তও হইতে দেখা গিয়াছে। পাট চারি পাঁচ জাতি আছে তন্মধ্যে বগি পাটই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম।

আদা, হরিদ্রা, এরারুট।

আদা, হরিদ্রা, এরারুট, এই তিনই প্রায় একইরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট উদ্ভিদ। ইহার চাষ বপনাদি প্রণালীও একরূপ। যে সকল স্থানে বর্ষার জল উঠিয়া ডুবিয়া যায় কি বৃষ্টির জল বদ্ধ হইয়া থাকে, সে স্থানে এসকল কৃষি হইতে পারে না। সমপরিমাণ দোয়াশ মৃত্তিকাই ইহার সম্পূর্ণ উপযোগী, বরং আঠালর ভাগ অল্প থাকিয়া বালির ভাগ কিঞ্চিৎ অধিক

থাকিলেও ক্ষতি করে না। আদা হরিদ্রার ক্ষেত্রে কৃষকেরা সার ব্যবহার করে না। এরারুটের চাস পূর্ব্ববাঙ্গলায় কি উত্তরবাঙ্গলায় প্রায় দেখা যায় নাই। বীরভূম, বর্দ্ধমান, হুগলি, মুরশিদাবাদ, নদিয়া এবং ২৪ পরগণার কোন কোন স্থানে* ইহার চাষ দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুত সকল ক্ষেত্রে সার ব্যবহার করা উচিত। চৈত্র মাসে বৃষ্টি পড়িলেই ক্ষেত্রে চাষ দেওয়া আরম্ভ করিতে হয়। প্রথমতঃ প্রতিবিঘায় অর্দ্ধমণ পরিমাণ চুণা ছড়াইয়া দিতে হয়। তৎপর ক্ষেত্র কর্ষণ প্রণালীর নিয়মানুসারে চাষ দিতে হয়। (বীজ বপন করিবার দেড়মাস দুইমাস পূর্ব্বে চুণা দেওয়া উচিত) চুণাতে ক্ষেত্রের ঘাস জঙ্গলাদিকে জীর্ণ করিয়া মৃত্তিকাকে শিথিল করিয়া দেয়, প্রতি বিঘায় তিন মণ করিয়া চুণা দিয়া পরে একমণ ভস্ম দেওয়া আবশ্যক। ক্ষেত্রে দশ বারখান চাষ দিতে হয়। ছয় সাত ইঞ্চির অধিক খনন না হইলে ক্ষতি হয় না কিন্তু মৃত্তিকা অত্যন্ত চূর্ণ হওয়া আবশ্যক। সাধারণতঃ কৃষকেরা প্রতিবিঘায় যে পরিমাণ আদা হলুদ জন্মায়, এইরূপ সার দিলে তদপেক্ষা অনেক বেশী হয়। আদা অপেক্ষা হলুদ বেশী হয়, এবং হলুদ অপেক্ষা এরারুট বেশী হয়। হলুদ আদার ক্ষেত্রে সারদিতে কাহার ইচ্ছা না হইলেও এরারুটের ক্ষেত্রে ঐরূপ সার দেওয়া নিতান্তই বিধি। ক্ষেত্র কর্ষণ এবং সার দেওয়া সমাধা হইলে বৈশাখ মাষের শেষ কি জ্যৈষ্ঠ মাসে মুষ্ঠুম হাত পরিমাণ ব্যবধানে সারি বাঁধিয়া অর্দ্ধহস্ত পরিমাণ ব্যবধানে বীজ বপন করিতে হয়। (বীজ ব্যবহার প্রণালী স্থলে হরিদ্রা বীজের উল্লেখ আছে) হরিদ্রার বীজ প্রণালীতে বপন করিতে হয়, এরারুটেরও সেইরূপ। আদার এমন পরিমাণ খণ্ড বপন করিতে হয়, যাহাতে সাত আটটি চোখ আছে। পূর্ব্বোক্ত পরিমাণানুসারে লাঙ্গল দ্বারা একএকটী সোজা টান দিয়া তন্মধ্যে পরিমাণানুসারে বীজ স্থাপন করিয়া লাঙ্গলের টানে যে মাটি দুদিকে সরিয়া গিয়াছিল, তাহা দুদিক হইতে টানিয়া বীজের উপর

---

* আলীপুরের জজ কোর্টের নিকটে একটি সাহেব ন্যূনাধিক ৫০/ বিঘা পরিমাণ একখানি এরারুট ক্ষেত্র করিয়া সুখ সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছেন।

ঢাকিয়া দিতে হয়। বীজ অনেক মাটির নীচে দেওয়া উচিত নয়। এই সকল ক্ষেত্রে জল দেওয়া আবশ্যক করে না। কালানুযায়ী যে বৃষ্টি হয় তাহাতেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণ হইয়া থাকে। বৃষ্টি অধিক হইলে সারির মধ্যে মধ্যে জুলি কাটিয়া দিতে হয়। অনাবৃষ্টি হইলে মধ্যে দুই একবার অল্প পরিমাণ জল সেচিয়া দিতে হয়।* বীজ সকল অঙ্কুরিত হইয়া গাছ চারি ছয় অঙ্গুলি পরিমাণ হইলে সারির মধ্যের যে ফাঁকা জায়গা থাকে তাহা হইতে মাটি তুলিয়া গাছের গোড়ায় দিতে হয়।

এইরূপে তিন চারিবার গাছের গোড়ায় মাটি আলগা করিয়া ঘাস জঙ্গল হইলে পরিষ্কার করিয়া মাটি দিয়া দিতে হয়, এইরূপে পুনঃ পুনঃ মাটি তুলিয়া দেওয়াতে গাছের গোড়া সকল অনধিক মুঠমহাত পরিমাণ ক্ষেত্র অপেক্ষা উচ্চ হইয়া থাকে। শীত ঋতুর প্রারম্ভ হইতে গাছ সকল মরিয়া যাইতে আরম্ভ হয়। তখন হইতেই আদা হরিদ্রা তুলিতে হয়। মাঘ মাসের শেষ কি ফাল্গুনের প্রথমে এরারুট তুলিতে হয়। এরারুট বিলম্বে তুলিলে লাভ আছে, তাহার মধ্যে সার পদার্থ অপেক্ষাকৃত অধিক হয়।

কিরূপে ইহাকে ব্যবহারোপযোগী করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে বলিতে হইতেছে। আদার আর কিছুই করিতে হয় না।* হরিদ্রা কোন কোন স্থানে বারমাসই কাঁচা ব্যবহার হইয়া থাকে।† অনেক স্থানেই শুষ্ক হরিদ্রা ব্যবহৃত হইত। গোবর জলে গুলিয়া সেই জলে কাঁচা হলুদ সিদ্ধ করিতে হয়; (গোবরের সহিত সিদ্ধ করায় পোকা ধরে না, হলুদের তীব্র গন্ধের হ্রাস হয় এবং বর্ণও উত্তম হয়) সিদ্ধ হইলে ঢালিয়া দাও কি বঁঠি দ্বারা দুই তিন খণ্ড করিয়া চিরিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়।

এরারুট তুলিয়া সাবিতে কি টুকরিতে করিয়া জলে নিয়া উত্তমরূপে

---

* বৃহৎ কৃষিক্ষেত্রে জল সেচিয়া দিয়া কৃষি জন্মান বড় কষ্ট, প্রাকৃতিক নিয়মে না হইলে সে কৃষি ভাল হয় না।

* পাটনা প্রভৃতি অঞ্চলে আদাও শুকাইয়া রাখে। তাহাকে পাটনাই শুঁঠ বলে। কিন্তু সে আদার সহিত ইহার কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে।

† শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে বারমাস কাঁচা হলুদ ব্যবহৃত হয়; শুক্না হরিদ্রা পাওয়াই যায় না।

পরিষ্কার করিয়া ধৌত করিতে হয়, পরে ঢেঁকিদিয়া কুটিতে হয়। অত্যন্ত চূর্ণবিচূর্ণ হইলে বড় বড় মেটে গামলাতে (চাড়িতে) জল দিয়া ভিজাইয়া তাহার মধ্যে কচলাইতে হয়। পরে আরও কিছু বেশী জলদিয়া ভালরূপ মিশাইয়া কাপড় দিয়াছাকিতে হয়। ছাকা গুলি দ্বিতীয় এক গামলায় এই রূপ জল দিয়া ভিজাইতে হয়। (অনেকে একবার মাত্র ছাকিয়াই ছাকা গুলি ফেলিয়া দিয়া থাকেন, তাহা উচিত নয়, একবারে সমুদায় সার নির্গত হয় না) এইরূপ ছাকিলে যে জল নির্গত হয় ক্ষণকালের মধ্যেই সেই জলের নিম্নভাগে ধবল সার সমস্ত জমিয়া যায় তখন উপরিস্থ জল অতি সাবধানের সহিত আস্তে আস্তে ফেলিয়া দিয়া ফিল্টার করা অতি উত্তম পরিষ্কার জল * গামলায় দিয়া নিম্নস্থ সার সমস্ত ঐ জলের সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে। আবারও সার নীচে পড়িলে পূর্ব্বোক্তরূপে জল ছাকিয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপে পুনঃপুনঃ ধৌত করিতে করিতে উত্তম পরিষ্কৃত হইবে। অন্যূন ছয় সাতবার ধৌত না করিলে পরিষ্কার হয় না। এইরূপে ধৌতকরণ কার্য্য সমাধা হইলে রৌদ্রে শুকাইতে হয়। মাটি হইতে উচ্চস্থানে দিয়া না শুকাইলে বাতাসে বালি ইত্যাদি উড়াইয়া ফেলে; উপরে দিলেও একখানি পাতলা কাপড় ঢাকা দিয়া দেওয়া উচিত।

এতদিন এরারূট কেবল পথ্যাদির জন্যই ব্যবহৃত ছিল, এখন ইহার আরও একটী ব্যবহার দেখা গিয়াছে। এরারূটের দ্বারা সিন্দূর প্রস্তুত হইয়া থাকে। কতকপরিমাণ এরারূট মেজেণ্টা মিশ্রিত জলের দ্বারা পাটায় অথবা বড় বড় খলে করিয়া মাড়িতে হয়, একএক বার মাড়িতে মাড়িতে জল শুষ্ক হয় পুনরায় জল দিতে হয়,অনেকবার এইরূপ করিয়া শেষে অতি অল্প পরিমাণ উত্তম সিন্দূর মিশ্রিত করিয়া জল দিয়া মাড়িয়া রৌদ্রে শুষ্ক করে। ইহা সিন্দূর বলিয়া বাজারে বিক্রীত হয় এবং বণিকের পক্ষে তাহা চিনিয়া লওয়া কষ্টকর।

* ফিল্টারের জল ভিন্ন এরারূট উত্তম পরিষ্কার হয় না, এবং জলের সঙ্গে মিশ্রিত বালি ইত্যাদি থাকিয়া যায়। অপরিষ্কার এরারূটের মূল্য কম। যাহাদের ফিল্টার না থাকে তাহারা কলসে কয়লা বালি দিয়া যেরূপ জল পরিষ্কার করা হয়, সেইরূপে করিয়া লইবেন।

ইক্ষু।

ন্যূনাতিরেক রূপে প্রায় সকল জিলায় সকল স্থানেই ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে। ইহার কর্ষণপ্রণালী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইলেও কতক গুলি মূল নিয়মের সহিত সকল স্থানেরই প্রায় একমত দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা অনেকগুলি প্রণালীর বিভিন্নতার কারণ এবং গুণাগুণের অনুসন্ধান করিয়া শেষ যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছি তাহাই এস্থলে প্রকাশ করা যাইতেছে।

ইক্ষুবীজ বৈশাখ মাসে রোপণ করিতে হয়। কিন্তু যে বৈশাখে ইক্ষু ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে তাহার পূর্ব্ব বৎসর ক্ষেত্র পতিত রাখা উত্তম ব্যবস্থা হইলেও প্রায় কৃষকেরাই তাহা করে না, কিন্তু আশ্বিন মাস হইতে বাধ্য হইয়াই পতিত রাখিতে হয়। কার্ত্তিক মাস হইতে ক্ষেত্রে চাষ দিতে হয়। কার্ত্তিক হইতে মাঘ পর্য্যন্ত প্রতি মাসেই দুই তিনবার করিয়া চাষ দিয়া আসিতে হয়। ফাল্‌গুন মাসে প্রতিবিঘায় ২০মণ করিয়া গোবর দিয়া ক্ষেত্র উত্তমরূপ কর্ষণ করিয়া মইদিয়া মাটি সমান করিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রতিবিঘায় ৪ মণ করিয়া খৈলের গুঁড়া ক্ষেত্রে দিতে হয়। (অস্থি চূর্ণ এবং রেড়ির খৈল ইক্ষুক্ষেত্রের উত্তম সার কিন্তু সকল স্থানে পাওয়া কষ্ট বলিয়া তৎপরিবর্ত্তে সরিষার খৈলই ব্যবহার্য্য। সরিষার খৈল ও অনুপ-যোগী অথবা নিকৃষ্ট নহে। পরে অল্প চাষ এবং মই দিতে হয়। এমন পরিমাণে চাষ দিতে হয় যে, খৈল অনেক মাটীর নীচে না যায়। বৈশাখ মাসের প্রথমে তরল সার (সার প্রস্তুত প্রণালীতে যাহা বলা হইয়াছে) দিয়া অল্প চাষ এবং মই দিয়া ইক্ষুর বীজ রোপণ করিতে হয়।

বীজপ্রণালীতে ইক্ষুবীজের উত্তম প্রকরণ যাহা সিদ্ধান্ত করা হই-য়াছে, তদনুরূপ বীজ দেড় হাত অন্তর সারি করিয়া অর্দ্ধহাত অন্তর ব্যবধানে রোপণ করিতে হয়। সারি করিবার সময় লাঙ্গল দিয়া এক একটী টান দিয়া সেই টানের মধ্যে বীজ বপন করিয়া দুই দিকের মাটী তুলিয়া বীজের গোড়া ঢাকিয়া দিতে হয়। বীজ রোপণের পর দুই চারি দিনের মধ্যে যদি বৃষ্টি না হয় তবে ক্ষেত্রে জল সেচিয়া দিতে হয়।* অতি-

---

* জল তুলিবার সহজ উপায়ের কোন যন্ত্র যখন ব্যবহৃত হয় নাই,

বৃষ্টির অনিষ্ট নিবারণের জন্য ক্ষেত্রস্থ সারির মধ্যে নালা রাখিয়া দিতে হয়। নালাতে ক্ষেত্রে জল দিবার পক্ষেও সুবিধা হয়। এক স্থানে জল তুলিয়া দিলে নালা দিয়া সমুদায় ক্ষেত্রে জল যাইতে পারে। চারা সকল লাগিয়া গেলে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমার্দ্ধ গতে প্রতিবিঘায় দুইমণ পরিমাণ খৈলের তরল সার মাটী আলগা করিয়া প্রত্যেক গাছের গোড়ায় দিয়া দুই দিকের সারির মধ্যের মাটী অল্প পরিমাণ তুলিয়া আলি বান্ধিয়া দিতে হয়। যদি এই সময়ে পূর্ব্বক্ষেত্রে ঘাসজঙ্গল হইয়া পড়ে তবে পূর্ব্বেই তাহা চাছিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। আষাঢ় মাসের প্রথমার্দ্ধ গতে তিন মণ পরিমাণ শুষ্ক খৈলের চূর্ণ গাছের গোড়ায় দিয়া পূর্ব্ববৎ মাটী দিয়া দিতে হয়। পুনরায় শ্রাবণ মাসের প্রথমার্দ্ধ গতে চারি মণ খৈলের চূর্ণ উক্তবিধ রূপে দিয়া মাটী দিতে হয়। এই হইলে সার দেওয়া মাটী খোঁড়ার কার্য্য সমাধা হইয়া যায়। এক একটা ইক্ষু গাছের গোড়া হইতে অনেকগুলি চারা বাহির হয়। বড় করিবার ইচ্ছা থাকিলে তিনটা অধিকন্তু চারিটা গাছ রাখিয়া অন্যগুলি কাটিয়া ফেলিতে হয়। কাটিয়া ফেলাতে কৃষকের ক্ষতি। অবশিষ্ট গাছ সকলেই সে ক্ষতি পূরণ করিয়া থাকে।

ইক্ষু গাছ সকল বড় হইতে থাকে ক্রমে তাহার নিম্ন দিকের শুষ্কপাতা সকল কতক ছিঁড়িয়া ফেলিতে হয়। কতক পাতাদিয়া গাছ জড়াইয়া দিতে হয়। জড়াইয়া না দিলে উপরিভাগ শক্তহইয়া মাড়িবার সময় বেশী পরিশ্রম লাগে এবং বিলম্ব হয়। দ্বিতীয়তঃ রসও কতক টানিয়া যায়। তৃতীয়তঃ পোকা ধরে। ইক্ষুগাছ জড়াইয়া না দিলে কৃষকের অনেক অনিষ্ট হয়। বাতাসে ইক্ষু গাছ সকল হেলিয়া ক্ষেত্রে পড়িয়া না যায়, এজন্য কোন কোন স্থানে চারি পাঁচটি গাছের অগ্রভাগ একত্র করিয়া বান্ধিয়া দেয়, কোন স্থানে বাঁশের কঞ্চী (কোন স্থানে ইহাকে জিঙ্গলা বলে, কোন স্থানে টুনি বলে) অথবা স্থান বিশেষের সুবিধানুসারে চিকণ মুলিবাঁশ সারি দিয়া পুঁতিয়া তাহার উপর ও ঐ বাঁশ বান্ধিয়া দেয়। স্থান বিশেষের কৃষ-

---

তখন জল তুলিয়া কৃষি ফলাইতে অধিক ব্যয় হইয়া পড়ে। সাধারণ কৃষকেরা নিজের পরিশ্রমের কোন মূল্য ধরে না কিন্তু অন্যের পক্ষে সে সামান্য ব্যয় নহে। সুতরাং সকল স্থানে আমরা ওরূপ পরামর্শ দেই না।

কের সুবিধানুসারে যে উপায়ই অবলম্বন করা যাউক তাহাতে ক্ষতি নাই। আমরা চারি পাঁচটি গাছ একত্রে বান্ধিয়া দেওয়াই প্রশস্ত মনে করি। মূলকথা ইক্ষুগাছ হেলিয়া ক্ষেত্রে পড়িয়া না যায়। পড়িয়া গেলে তাহাতে গুড় কম হয়। চিবিয়া খাইতেও মিষ্ট লাগে না।

ইক্ষু একজাতীয় অথবা এক প্রকৃতিবিশিষ্ট নয়। এপর্য্যন্ত আমরা এই কএক প্রকার ইক্ষুর জাতি, লক্ষণ এবং গুণের পরিচয় পাইয়াছি। কাজলা, ধলি, বোম্বাই, চিনে, সমসা, ওটাহিটি, খাগরা। ইহার মধ্যে চিনে এবং সমসা উভয়ই একরূপ লক্ষণ এবং এক প্রকৃতিবিশিষ্ট; একটু প্রভেদ এই, সমসা অপেক্ষা চিনেতে অধিক তাপ সহ্য করিতে পারে অর্থাৎ রৌদ্র অধিক হইলেও মরে না। উভয়ই কাল এবং সাত আট হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। উভয়ের মধ্যে গুণের প্রভেদ আছে। সমসা অপেক্ষা চিনের রসে সার ভাগ অধিক, গুড় অধিক হয়। এবং গুড়ের ওজন বেসি হয়। সমসায় যত বড় এক কলসী গুড়ে বিশ সের হইবে, চিনের তত বড় এক কলসী গুড় ওজনে অন্যূন একুশ বাইশ সের হইবে। সর্ব্ব প্রকার ইক্ষু অপেক্ষাই চিনের গুড় অধিক হয় এবং ওজন বেশী হয়। বোম্বাই এবং ওটাহিটি এ উভয়েরও প্রকৃতিগত অনেক সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। উভয়ই ধলা এবং ইহারাও সাত আট হাত পরিমাণে লম্বা হয়।* চিনে সমসা হইতে অপেক্ষাকৃত মোটা হয়, ইহাদের মধ্যে আর কোন প্রভেদ দেখা যায় না। মাত্র বোম্বাই অপেক্ষা ওটাহিটির গুড় অধিক হয়। সমসা এবং চিনের আর একটী গুণ আছে। সময় মত ক্ষেত্রস্থ ইক্ষু কাটিয়া নিলে, তাহার গোড়া হইতে পুনরায় গাছ বাহির হয়। তাহাতে প্রথম বৎসর অপেক্ষাও অধিক এবং উত্তম ইক্ষু জন্মে। দ্বিতীয় বৎসরে কৃষকের চাষের ব্যয় লাগে না এবং সারও পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা কম দিতে হয়। এইরূপে ঐ ক্ষেত্রে তৃতীয় বৎসর ও ইক্ষু জন্মে কিন্তু প্রথম দ্বিতীয় বৎসর অপেক্ষা কম এবং কিছু নিকৃষ্ট হয়। (এই সময়ের বীজ রাখিয়া নূতন ক্ষেত্রে

---

* যাহারা দুই একখানা বাড়ীতে কি বাগানে জন্মায়, তাহারা অধিক যত্ন করাতে অধিক সার দেওয়াতে ইহা অপেক্ষাও অধিক লম্বা জন্মাইয়া থাকে।

রোপণ করা উচিত নয়) ইক্ষু চাষের যে প্রণালী পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সে কেবল দেশী ইক্ষুর সম্বন্ধে। এই চতুর্বিধ ইক্ষু চাষের প্রণালীর সহিত তাহার অন্য কোন প্রভেদ নাই; মাত্র অতিরিক্ত দুই মণ সার পূর্ব্বোক্ত রীতি অনুসারে অধিক দিতে হয়। ধলি এবং কাজলা ইহা দেশীয় প্রচলিত ইক্ষু; ইহা বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত জাতীয়ের অপভ্রংশ মাত্র। কৃষি প্রণালীর ত্রুটীতে ক্রমে আকৃতি প্রকৃতি এবং গুণগত বৈষম্য ঘটিয়াছে।* কাজলা ও আকৃতিতে চিনে এবং সমসার ন্যায় কাল কিন্তু তত লম্বা হয় না। গুণগতও বৈষম্য আছে। ধলি ও বোম্বাই এবং ওটাহিটির ন্যায় ধলা কিন্তু মোটা লম্বা তত হয় না; গুণগত বৈষম্য ও আছে। সকল স্থানে প্রথমোক্ত প্রকারের ইক্ষু বীজ ঘটে না এবং উৎ-কর্ষতার জন্য বিশেষ চেষ্টা ও করে না। নতুবা চিনে এবং সমসা ইক্ষুর চাষের ন্যায় কৃষকের সুবিধা এবং লভ্যজনক আর কিছুই নহে। বোম্বাই এবং ওটাহিটি দ্বিতীয় স্থানীয়। দেশী ধলি কাজলা তৃতীয় স্থানীয়। আর এক জাতীয় ইক্ষু খাগরা। ইহা ইক্ষু জাতির একেবারে নিকৃষ্ট। ইহা আড়াই হাত তিন হাতের অধিক লম্বা হয় না। মোটা প্রায় অঙ্গুলিবৎ অত্যন্ত শক্ত এবং রস কম। কিন্তু দেশী ধলি কাজলা হইতে খাগরার রসে গুড় অধিক হয় অর্থাৎ এক কলসী ধলি কি কাজলার রসে যে পরিমাণ গুড় হবে, খাগরার এক কলসী রসে তদপেক্ষা অধিক গুড় হয়। ইহা মাড়িবার সময় পরিশ্রম অধিক হয় এবং সময় বেশী লাগে। এই গেল দোষের ভাগ। গুণের মধ্যে এই, প্রথম রসে গুড় অধিক আছে; দ্বিতীয়ত চাষে ব্যয় কম। পূর্ব্বকথিতরূপ সার দিতে সর্ব্বশুদ্ধ দুই মণ খৈল দিলেই প্রচুর হয়। তৃতীয়তঃ ইহাও কাটিয়া নিলে গোড়া হইতে গাছ উঠিয়া দ্বিতীয় বৎসর ইক্ষু জন্মে। চতুর্থতঃ শূকর ইত্যাদি পশুতে খায় না, অথবা মানুষে যাচ্ঞা অথবা চুরি করে না। স্থান বিশেষে সময় বিশেষে চারা জন্মানেরও আবশ্যক হয় এবং লাভ আছে।

* চিনে, সমসার তৃতীয় বারের বীজ রোপণ করিলে তাহা সেই জাতীয় ইক্ষুর ন্যায় লম্বা হয় না এবং উহাতে তত পরিমাণ গুড় হয় না। বোধ হয় না এইরূপ দশায়ই নিকৃষ্ট হইয়াছে।

ইক্ষু মাড়িবার জন্য দুই প্রকার গাছের ব্যবহার আছে। এক প্রকারের নাম রূপগাছা; দ্বিতীয় প্রকারের নাম কেরথি। উভয়ের মধ্যেও কার্য্যগত পার্থক্য আছে। ইক্ষু মাড়িবার সময় তাহার উপরিভাগের ছোলা কতক পরিমাণে চাঁছিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। সমলা এবং চিনেতে তাহা আবশ্যক করে না। তৎপর কেরথির গাছে আস্ত ইক্ষু দিয়াই গাছ ঘুরাইয়া রস বাহির করে। রূপগাছাতে ইক্ষু সকল ছোট ছোট টুকরা করিয়া গাছের মধ্যে দিতে হয়। রূপগাছার গাছ কলুর ঘানি গাছের ন্যায়। উভয় প্রকার গাছই গরু অথবা মহিষ দ্বারা ঘুরাইতে হয়।* গুড় করিবার প্রণালী প্রায় সকল স্থানেই একরূপ। তবে কোন স্থানে কেহ বা পাতলা রাখে কেহ বা সানি করে। বাখরগঞ্জে কিছু প্রভেদ দেখা গিয়াছে, তাহারা গুড়ে অধিক দানা এবং পরিস্কার হইবার জন্য প্রস্তিজালায় দেড়সের শুষ্ক চলার গুঁড়া দিয়া থাকে।

ইক্ষু চাষ, পাটনা, গাজিপুর, আরা, ছাপরা ইত্যাদি স্থানে অধিক হয় এবং তথায় উত্তম জন্মে। পূর্ব্বাঙ্গালার মধ্যে ফরিদপুরের উত্তর পশ্চিমাংশ এবং নদিয়া যশোহরের সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে ভাল জন্মে এবং গুড়ে দানা অধিক এবং পরিষ্কার হয়।

কলা।

কলা অধিক মূল্যবান জিনিষ না হইলেও আমাদের সাধারণ ব্যবহারীয় এবং নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু। ইহা কৃষকের পক্ষে অলভ্যকর পদার্থ নহে। একটা প্রবাদ আছে—'তিশক্ত যাইট ঝাড় কলা রূয়ে, থাক্‌গিয়া খাটে শুয়ে'। কলার পাত খোল থোড় মোচা কলা সকলই ব্যবহার্য্য এবং স্থান বিশেষে মূল্যবান। কলাগাছ প্রায় সাধারণতঃ সকল প্রকার মৃত্তিকাতেই হয় এবং ইহাতে কোনরূপ সারই দিতে হয় না। তবে নূতন মৃত্তিকাতে কিছু ভাল হয়। কলা নানা জাতীয়—সবরি, কবরি, (স্থান বিশেষে কাঠালি, বিচি, পাতরিষ বলে) মর্ত্তমান; চাঁপা, বোম্বাই, মদনমুরারি, ডিঙ্গা-

* পূর্ব্বেই প্রসঙ্গ ক্রমে বলা হইয়াছে যে, শ্রীহট্ট প্রভৃতি কতক স্থানে মানুষ দ্বারা গাছ ঘুরান হইয়া থাকে।

মানিক, কানাইবাঁশী, অগ্নীশ্বর, বিচা, আনাজি ইত্যাদি। আবার ইহার ও এক এক জাতির মধ্যে দুই তিন রকম আছে। কলা নানাজাতীয় হইলেও ইহাদের চাষের প্রণালীর বিভিন্নতা নাই।

যে ক্ষেত্রে কলা রোপণ করিতে হইবে প্রথমতঃ কোদাল দ্বারা হউক কি লাঙ্গল দ্বারা হউক ক্ষেত্রের মৃত্তিকা সাধারণ রকম খনন করিতে হইবে।* বৈশাখ মাস কলা লাগাইবার প্রশস্ত সময়। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় পর্য্যন্ত লাগান হইয়া থাকে। শ্রাবণমাসে কলা লাগান বিধি নয়। এসম্বন্ধে নানা রকম প্রবাদ আছে, মতান্তর ও আছে। প্রবাদ এইরূপ যে, শ্রাবণ মাসে শ্রবণা নক্ষত্রে কলা রোপণ করিয়া রাবণ সবংশে নিপাত গিয়াছিল। আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন, 'ডেকে বলে রাবণ, কলা রোপ আষাঢ় শ্রাবণ'। আমরা এসকল প্রবাদের কোন পক্ষই অবলম্বন করিতেছি না কিন্তু দেখা গিয়াছে শ্রাবণ মাসে কলাগাছ রোপণ করিলে তাহার খোলার পাটির মধ্যে মধ্যে অনেক কেঁচুয়ার (স্থান বিশেষে জির বলে) বাসা হইয়া গাছের মাজ পর্য্যন্ত ধরে; তাহাতে গাছ মোটা হয় না এবং বড় হয় না। কলা হইলেও নিতান্ত বিশ্রী দশপনরটি কলা হয়। আমরা যতদূরদেখিয়াছি তাহাতে শ্রাবণ মাসে কলা রোপণ করা আমাদের মতে সঙ্গত নয়। ক্ষেত্র কর্ষিত হইলে অন্যূন দেড় হাত অনধিক আড়াই হাত পরিমাণ লম্বা কলার চারা তুলিয়া এক দিন কি দুইদিন ছায়া জায়গাতে ফেলিয়া রাখিতে হয়। যখন তোলা যায় তখনই রোপণ করার একটু দোষ আছে। স্থানান্তরিত করাতেই নূতন স্থানে না লাগা পর্য্যন্ত প্রথম কএকদিন গাছের রস টানিয়া কিছু শুষ্ক হয়, তাহাতে গোড়ার মাটি ফাঁক হইয়া বৃষ্টির জল ইত্যাদি গাছের গোড়ায় বসিয়া গাছের পুষ্টির হানি করে। কর্ষিত ক্ষেত্রে আট হাত অন্তর অনধিক একহাত অন্যূন মুঠ্‌মহাত গর্ত্ত করিতে হয়। (১) কলাগাছ অল্পপরিমাণ গর্ত্ত করিয়া রোপণ করিলে ঝড়

---

* যাঁহারা পুকুর পাড়ে বা কাচার উপর কি বাড়ীর কোণে কলাগাছ লাগান তাঁহাদের সম্বন্ধে ভিন্ন কথা।

(১) প্রবাদ আছে, আট হাত অন্তর একহাত খাই, কলা রোপ চাষা ভাই। কলা রুইয়া না কাইট পাত তাইতে কাপড়, তাইতে ভাত।

বাতাসে নাড়িয়া গোড়া আলগা এবং ফাঁক করিয়া দেওয়াতে পূর্ব্বোক্ত দোষ ঘটে। কলাগাছ অধিক দূরস্থিত মাটীর রস আকর্ষণ করে, সুতরাং নিকট নিকট রোপণ করিলে উপযুক্তরূপ রস না পাওয়ায় পুষ্টি-বর্দ্ধন হইতে পারে না। কলার চারা সকলের যেদিকে মুখির মত (কনুইর মত) অর্থাৎ মূলের অগ্রভাগটা বর্দ্ধিত থাকে সেইদিক দক্ষিণাভিমুখে রাখিয়া রোপণ করিতে হয়। এইভাবে রোপণ করিলে ক্ষেত্রস্থ সমুদয় গাছেরই গোড়া উত্তর দিকে পড়িবে। কলার চারা সকল রোপণ করার পর ক্ষেত্রে যখন গাছ লাগিয়া যায়, তখন সমুদায় গাছের অগ্রভাগ সমপরিমাণে কাটিয়া দিতে হয়। তাহা হইতে নূতন মাইজ নির্গত হইয়া আবার গাছ হইয়া উঠে। এবং সমুদয় ক্ষেত্রে একেবারে একত্রে কলা ধরে। কলার জাতিবিশেষে বিলম্বে পাকে। কলাগাছের গোড়াদিয়া যে সকল চারা উঠে তাহার সমুদয়ই স্থানান্তরে রোপণ করিতে হয় অথবা কাটিয়া ফেলিতে হয়, নচেৎ গাছের ফল বড় হয় না। কলার ক্ষেত্র দুইবার কোদালি দিয়া মাটি খুঁড়িয়া এবং জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়, নচেৎ গাছ সতেজ হয় না।

কলাগাছের সম্বন্ধে আরও কতক প্রবাদ আমরা শুনিয়াছি, তাহার কোন সুসঙ্গত যুক্তি পাওয়া যায় না অথবা সত্যাসত্যের প্রমাণ করিবার সুবিধা পাই নাই। একটা প্রবাদ আছে যে, যে কলায় বিচি হয় সেই জাতীয় কলাই অভুক্ত থাকিয়া দুইপ্রহর অন্তে রোপণ করিলে তাহাতে বিচি হয় না। আর একটা প্রবাদ এইরূপ, সবরি কলাগাছে প্রদীপের রশ্মি লাগিলে কলা উত্তম হয়, আমরা ইহার কোন যুক্তি পাই নাই।

কার্পাস।

কার্পাসের চাষ এবং চাষের সময় সম্বন্ধে স্থানবিশেষে মত বিভিন্ন। অনেক স্থানে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে কার্পাসের বীজ বপন করে, আবার জাহানাবাদ অঞ্চলে কার্ত্তিক মাসে বীজ বপন করে। বাখরগঞ্জেও কার্ত্তিক মাসে বীজ বপন করিবার প্রথা। হিন্দুস্থানে তুলার চাষ অধিক; পূর্ব্ব-

বাঙ্গলায় কার্পাসের চাষ নাই বলিলেই হয়। পূর্ব্ববাঙ্গলায় সুধারাম, ত্রিপুরা, নওয়াখালি, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, আসাম প্রভৃতি স্থানে যে তুলা জন্মে তাহা প্রায় সমুদয়ই পার্ব্বতীয় জাতিরা (ত্রিপুরা, নাগা, খসিয়া, মণিপুরি ইত্যাদি) জন্মাইয়া থাকে। তাহারা কোন কৃষি প্রণালী অনুসারে কার্পাসের চাষ করে না, স্থানান্তরে প্রসঙ্গ ক্রমে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। স্থানবিশেষে বিভিন্ন মত থাকিলেও, আমরা বৈশাখ মাসে কার্পাস চাষের নিয়ম বিবৃত করিতেছি। উষ্ণ বায়ু, সুতরাং পর্ব্বত সন্নিহিত স্থানে কার্পাস উত্তম জন্মে। বোধ হয় বায়ুপ্রবাহের গুণাগুণ অনুসারেই স্থানবিশেষে ভিন্ন রীতিতে ইহার চাষের ব্যবস্থা হইয়া থাকিবে।

যে স্থান বর্ষার জলে ডুবিয়া যায়, কি যে ক্ষেত্রে বৃষ্টির জল অনেক ক্ষণ স্থায়ী হয়, তদ্রূপ স্থানে কি ক্ষেত্রে কার্পাস জন্মিবে না। পলিপড়া অপ্রকৃত মৃত্তিকা প্রায় সর্ব্বপ্রকার উদ্ভিদের উপকারক, কিন্তু কার্পাস-ক্ষেত্রের জন্য সে মৃত্তিকা সম্পূর্ণ উপযোগী নয়। পলি মাটিতে কি দোয়াশ মাটিতে গাছ সতেজ এবং উত্তম জন্মে কিন্তু কার্পাস ফলে কম। সমপরিমাণে দোয়াশ না হইয়া যাহাতে আঠাল ভাগ কিঞ্চিৎ অধিক থাকে তাহা কার্পাস চাষের উপযোগী। চৈত্র মাসে বৃষ্টি পড়িয়া ক্ষেত্রের মৃত্তিকা কিঞ্চিৎ নরম হইলে চাষ আরম্ভ করিবে, কার্পাস অপ্রকৃত মূল বিশিষ্ট উদ্ভিদের ন্যায় না হইয়া মূল প্রায় এক হাত মাটির নীচে পর্য্যন্ত যায়। ততদূর খনন করা না হইলেও অন্ততঃ এক ফুট পরিমাণ খনিত হওয়া নিতান্তই উচিত। কার্পাস ক্ষেত্রে অস্থিচূর্ণ সার অত্যন্ত আবশ্যকীয়।* অস্থিচূর্ণ সকল স্থানে পাওয়া সুলভ নয়। এজন্য আমরা তাহার অধিক পরিমাণে ব্যবহার করার পরামর্শ দিতে ইচ্ছা করি না। অন্ততঃ

* যে সকল উদ্ভিদের মধ্যে কাষ্ঠ সংস্থিত হয় তাহাদের জন্যই অস্থিচূর্ণ সার অধিক উপকারক। অস্থিচূর্ণে চূণ এবং ফক্ষরিক অম্ল আছে তাহাতেই কাষ্ঠ সংস্থান করে। কেবল উদ্ভিদ কেন জীবাদির মধ্যেও এই দুই বস্তু দ্বারা অস্থির দৃঢ়তা হয়। যে সকল জীবাদির আহার্য্যে এই দুই পদার্থ না থাকে কি অল্প থাকে তাহাদেরই অস্থি থাকে না অথবা অতি কোমল থাকে।

প্রতিবিঘায় দশ সের দিলেও হয়। অভাবে অগত্যা মাত্র চারি মণ পরিমাণ কার্পাস বীজের খইল দিলেও অনিষ্ট হয় না। সাধারণতঃ তৎপরিবর্ত্তে সরিষার খইল ব্যবহার্য্য। খইল উত্তম রূপ চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত চারি মণ মৃত্তিকাচূর্ণ মিশাইয়া (অর্থাৎ খইল আর মৃত্তিকা সমপরিমাণ) একসপ্তাহ কাল ভালরূপ ঢাকা দিয়া রাখিতে হয়। যেন জল বাতাসাদি না লাগে; পরে তাহা হইতে একটা উষ্ণতা শক্তির উৎপত্তি হয় (গরম লাগে) তখন কর্ষিত ক্ষেত্রের উপর ছড়াইয়া দিতে হয়। এইরূপে ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে অনধিক এক সপ্তাহের মধ্যে ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতে হয়।

এপর্য্যন্ত আমরা এই কএক কার্পাসের পরিচয় পাইয়াছি, আমেরিকান, ভোটাঙ্গি, দেশী (১)। দেশী কার্পাসও দুই জাতি; হৈমন্তিক (কার্ত্তিক মাসে যে বীজ বপন করিতে হয়) ও বর্ষা (বৈশাখ মাসে যে বীজ বপন করিতে হয়)। হৈমন্তিক বীজ বৈশাখ মাসে বপন করিলে ভাল হয় না, এবং বর্ষা বীজও কার্ত্তিক মাসে বপন করিলে ভাল হয় না। আমেরিকান বীজ বৈশাখ মাসে বপন করিতে হয়। দেশী কার্পাসের গাছ একবৎসরের অধিক কার্পাস পাওয়া যায় না, গাছ মরিয়া যায়। আমেরিকান কার্পাস বীজের গাছ তিনবৎসর থাকে এবং কার্পাস হয়। ভোটাঙ্গি বীজের গাছ বড় হয় এবং অনেক দিন থাকে। ভোটাঙ্গি কার্পাস পরিস্কার হয় না। ইহার আঁশ অত্যন্ত মোটা। ভোটাঙ্গি কার্পাসের কৃষিক্ষেত্র এদেশে দেখা যায় না। কেবল গৃহস্থের বাড়ীতে দুই চারিটা কি দশটা মাত্র থাকে।

কার্পাসের বীজ প্রথমত জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। দুই প্রহর কাল পরিমাণ ভিজিলে তুলিয়া জল ঝাড়িয়া চালার উপর ঘষিতে হয়, (চালায় ঘষিলে গাত্রস্থ তুলা সকল বাহির হইয়া যায়। এবং বীজের উপরি ভাগের খোসা অপেক্ষাকৃত পাতলা ও নরম হয়; তাহাতে বীজ সত্বর ফাটিয়া অঙ্কুর উদ্গমের সহায়তা করে) ঘর্ষণের পর কতক পরিমাণ সোরা জলে মিশ্রিত করিয়া সেই জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। (সোরা

(১) সর্ব্বাপেক্ষা মিশরের কার্পাস উত্তম কিন্তু এপর্য্যন্ত এদেশে তাহার বীজের অনুসন্ধানে আমরা পাই নাই।

অভাবে ঘোড়ার মূত্র দ্বারা ভিজাইয়া রাখিতে হয়) অনধিক একদিন এইভাবে ভিজিলে, বীজ ক্ষেত্রে বপন করিতে হয়। প্রতিবিঘার আড়াই সেরের অধিক বীজের আবশ্যক করে না। কোন কোন স্থানে বীজ ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন ভাবে (তিল, কলাই, সরিষা ইত্যাদির ন্যায়) ছড়াইয়া ফেলে, কোন স্থানে আল বান্ধিয়া বপন করে। আমরা আল বান্ধিয়া বপন করাকেই প্রশস্ত মনে করি। এক হাত সওয়া হাত অন্তর সারি করিয়া একফিট অন্তর (উত্তম বীজ বাছিয়া লইয়া) একখানি কাটির দ্বারা অনধিক দুই ইঞ্চি পরিমাণ একএকটী গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে চার পাঁচটী করিয়া বীজ বপন করিতে হয়। এই রীতিতে বীজ বপন করিলে জল সেচিবার আবশ্যক প্রায় ঘটে না। তবে অবৃষ্টি হইলে যে পর্য্যন্ত গাছ একফিট পরিমাণ উচ্চ না হয় তাবৎ কাল, মধ্যে মধ্যে জল সেচিয়া দিতে হয়। চারা সকল বাহির হইলে দুইটী বা তিনটী চারা রাখিয়া দুর্ব্বল গুলিকে ফেলিয়া দিতে হয়, অথবা যে স্থানে চারা না উঠিয়াছে সেই স্থানে রোপণ করিতে হয়। ঘাস জঙ্গল পরিস্কার করিয়া গাছের গোড়ায় মাটি দিয়া দিতে হয়। অতিবৃষ্টির অনিষ্ট নিবারণ জন্ত ক্ষেত্রের মধ্যে ছোট ছোট নালা রাখিতে হয়। যে বৎসর ভাদ্র আশ্বিন মাসে বৃষ্টি অধিক হয় সে বৎসর এই কার্পাস ভাল হয় না। অত্যন্ত শীতলতা অথবা অত্যন্ত উষ্ণতা উভয়ই ইহার অনিষ্ট-কারক। আশ্বিন মাসে কার্পাস ফুটিতে আরম্ভ হইয়া সমুদয় কার্ত্তিক মাসই ফুটিতে থাকে। শীতের আধিক্য আরম্ভ হইলেই গাছ সকল নিস্তেজ হইয়া মরিয়া যাইতে থাকে।

যে সকল স্থান কার্ত্তিক মাসে কার্পাস বীজ বপন করা হয়, সে সকল স্থানের কর্ষণ প্রণালী ইত্যাদি সমুদায়ই এইরূপ কিন্তু প্রথম দুই তিন মাস পর্য্যন্ত পনর বিশ দিন অন্তর এক এক বার জল সেচিতে হয়। সে সমস্ত গাছে বৈশাখ মাস হইতে কার্পাস ফুটিতে আরম্ভ হয় আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত অল্প পরিমাণ থাকে। মৃত্তিকার সবলতানুসারে গাছ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইলে তীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা গাছের অগ্রভাগ কাটিয়া দিতে হয়, তাহাতে গাছের শাখা পল্লব অধিক হইয়া ফল ফলিতে থাকে। রীতিমত যত্নের

সহিত কার্পাস ক্ষেত্র করিলে প্রতি বিঘায় ৬॥ মণ পর্য্যন্ত কার্পাস জন্মান যায়।

দুদিন পরে একদিন ক্ষেত্র হইতে কার্পাস তুলিতে হয়, একত্রে অধিক ফুটিলে একদিনে তুলিব বলিয়া যাহারা বসিয়া থাকে তাহাদের অনিষ্ট হয়, কাপাস ফুটিয়া নীচে পড়িয়া নষ্ট হয়, বাতাসে উড়িয়া যায়, বিশেষতঃ বৃষ্টি হইলে একেবারেই অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়।

বর্ষা ঋতুর তরকারি ইত্যাদি।

বর্ষা ঋতুতে আমাদের দেশীয় কতক গুলি তরকারি ইত্যাদি, ভিন্ন দেশীয়ের পক্ষে অধিক আদরের বস্তু না হইলেও আমাদের দেশের সাধারণ ব্যবহার্য্য এবং উপকারক। আমাদের দেশে ইহার বিস্তারিত কৃষি ক্ষেত্র করিয়া উৎপাদনের রীতি প্রায় দেখা যায় না, ছোট বড় সকল গৃহস্থের বাড়ীতেই ন্যূনাধিকরূপে প্রায় জন্মান হইয়া থাকে। ইহার সাধারণ কর্ষণ, বপন, এবং যত্নাদির ব্যবহার প্রায় সকলেই অবগত আছেন; তৎসমুদায়ের বিস্তার আলোচনা অনাবশ্যক। তবে কতকটা বিশেষ নিয়ম এ স্থলের বক্তব্য।

কৃষি উৎপন্ন করিবার জন্য যে স্থান মনোনীত করা হয় তাহার মৃত্তিকা সমপরিমাণে দোচাষ হওয়া আবশ্যক, বোদ এবং পলিমাটি ইহার উত্তম ব্যবস্থা। বীজ বপন করিবার অন্যূন তিন সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে মাটি খুঁড়িয়া প্রস্তুত করিতে হইবে এবং ক্রমে দুদিন চারিদিন পরেই এক এক বার কোদাল দ্বারা মাটি আলগা করিয়া দিতে হইবে। মনুষ্য কি পশুর মল মূত্রাদি ইহার উত্তম সার। যে স্থানে বীজ বপন করিতে হইবে মাত্র সেই জায়গা টুকের মাটি খনন করিয়া সার মিশ্রিত করিলে হইবে না; অন্যূন চতুর্দ্দিকের দুইহাত পরিমাণ ব্যাপৃত স্থানের মাটি আলগা করিয়া সার দিতে হইবে, যাহারা বিস্তৃত ক্ষেত্র করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকেও সমুদায় ক্ষেত্রে সার দেওয়া আবশ্যক। সমুদায় ক্ষেত্রে তিন চার চাষ দিয়া মই দিয়া ঘাস জঙ্গল গুলি বাছিয়া ফেলিয়া চারি হাত অন্তর ব্যবধানে

পূর্ব্বোক্তরূপ খুপি (কোন স্থানে আইল বলে কোন স্থানে তাওয়া বলে) করিয়া সার দিলেই হয়। বীজ বপন করিবার তিন চারি দিন পূর্ব্বে প্রতি খুপিতে এক সের পরিমাণ খইলের তরল সার দিয়া মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে। তৎপর এক এক খুপিতে চারি পাঁচটি করিয়া বীজ বপন করিতে হইবে। ঝিঙ্গে রেখা (কোনস্থানে শ্রীচন্দন বলে, কোন স্থানে গোসিঙ্গা বলে) করলার বীজ চৈত্র মাস কি বৈশাখের প্রথমে বপন না করিলে ফল নামি হইয়া যায়। এই তিন প্রকার বীজই বপন করিবার পূর্ব্ব-দিন রাত্রে এক খান নেকড়ায় বান্ধিয়া চনার মধ্যে ভিজাইয়া রাখিতে হয় ; তৎপর বীজ বপন করিতে হয়। শশার বীজ (চৈত্র শশা আমেরিকান শশার সময় এবং নিয়ম ভিন্ন তাহা পরে বলা যাইতেছে) তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে জলে ভিজাইয়া শেষ ঘুটিয়ার ছাই মাখিয়া বপন করিতে হয়। ইহাতে এই সকল বীজ সত্বর অঙ্কুরিত হয়, এবং পোকা ধরে না। বীজ বপন করিয়া প্রথম দিন জল দিয়া চারা বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত আর জল দিতে হয় না। চারা বাহির হইলে মধ্যে২ জল দিতে হয় এবং গোড়ার মাটি আলগা করিয়া গোড়ায় নূতন মাটি দিয়া দিতে হয়। এক একটি খুপিতে দুইটির অধিক চারা রাখিতে হয় না বরং সবল দেখিয়া একটি রাখিলেও ক্ষতি নাই (ফলের আকৃতি বড় করিবার ইচ্ছা থাকিলে একটি রাখাই উচিত)। কাকরোল গাছের ও ক্ষেত্র প্রস্তুতের নিয়ম এইরূপ, কাকরোলের বিচিতে গাছ হয় কিন্তু সেই বৎসর তাহাতে ফল হয় না। দুই তিন বৎসর পরে ফলে, কাকরোল গাছ এক বৎসর জন্মাইলে প্রতি বৎসরই চৈত্র বৈশাখ মাসে বৃষ্টি হইলেই সেই মূল হইতে অঙ্কুর হইয়া গাছ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা উচিত নহে, তাহাতে ক্রমে ফলের আকৃতি ছোট হয় এবং ফলও কম ধরে। কাকরোলের মূল তুলিয়া তুষের আগুণে একটু সেক দিয়া পরে রোপণ করিতে হয়, তাহাতে সেই বৎসরই ফল অধিক ধরে। এই সকল গাছ ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকিলেই তাহাতে আঙ্গনা (বাতার উপর দিয়া বাহিয়া যায়, স্থান বিশেষে তাহার নানাবিধ নাম) এমন ভাবে দিতে হয় যে তাহার মত ইচ্ছা গতির বাধা প্রতিবন্ধক না ঘটে। ফুল হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গাছের যত আগা বাহির হয় সে গুলি একবার মুচড়িয়া ভাঙ্গিয়া

দিতে হয় কিন্তু একবার আগা ভাঙ্গিলে তাহা হইতে যে সকল আগা বাহির হয় তাহা ভাঙ্গিতে হয় না ইহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফল ধরে এবং আকৃতি বড় হয়। বীজ বিশেষের এরূপ যত্নকৃত ঝিঙ্গে একহাত সওয়া হাত এবং রেখাও দুহাত আড়াই হাত লম্বা হয়।

লাউ কুমড়া হেমন্ত বর্ষা সকল সময়েই জন্মে। কিন্তু একঋতু জাত ফলের বীজ অন্য ঋতুতে বপন করিলে গাছ হয় কিন্তু ফল হয় না, হইলেও ক্ষুদ্র এবং বিশ্রী হইয়া যায়। ইহার কর্ষণ প্রণালীতে আর প্রভেদ নাই, যে সময়ের বীজ সেই সময় বপন করিতে হয়। লাউয়ের বীজ বপন করিবার পূর্ব্বদিন হুকার জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয় এবং কুমড়ার বীজ ঘুটিয়ার ছাই মাখিয়া বপন করিতে হয়, হেমন্ত কালের কুমড়া গাছ জাঙ্গলা দিতে হয় না মাটিতেই বাহিয়া যায়, বর্ষা কালের কুমড়া অপেক্ষা হৈমন্তিক কুমড়া আকারে বড় হয়; বিশ পঁচিশ সের পর্য্যন্ত ওজন হইয়া থাকে।

চৈত্র শশা—ইহা বার মাসই হইতে পারে কিন্তু কার্ত্তিক মাসে বপনই ইহার প্রচলিত রীতি। ইহার কর্ষণ প্রণালীর বিভিন্নতা নাই। তার ও গাছে জাঙ্গলা দিতে হয় না, ক্ষেত্রের উপর বাহিয়া গিয়াই ফল ধরে, এজন্য ইহার অপর নাম খেতুয়া শশা। ইহা আকৃতিতে বড় হয় না।

আমেরিকান শশা (Cucumber) ফাল্গুন চৈত্র মাসে ইহার বীজ বপন করিতে হয়। যে মাটিতে বালির ভাগ অধিক তাহাই ইহার পক্ষে প্রশস্ত, উদ্ভিদ সার ইহার উত্তম ব্যবস্থা। পূর্ব্বকথিত রূপ ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া তাহার মধ্যে অন্যূন এক হাত পরিমাণ মৃত্তিকা খনন করিয়া তাহাতে মৃত্তিকার সহিত পূর্ব্ব কথিত সার অগত্যা রেড়ির খইলের সার দিতে হয় আর সমুদয় কার্য্যই শশার বীজ রোপণের পূর্ব্বকথিত প্রণালী অনুসারে করিতে হইবে। মাত্র সাধারণ শশার গাছ অপেক্ষা ইহাতে জল অধিক দিতে হইবে। এই গাছে অনেক পোকা ধরিয়া অনিষ্ট করে, এজন্য গাছের গোড়ায় ছাই দিবে এবং অধিক জলের সহিত অল্প পরিমাণ সাল্‌ফিউরিক এসিড (Sulphuric Acid) মিশ্রিত করিয়া পিচকারির দ্বারা গাছের পাতায় ছিটাইয়া দিতে হইবে, তাহা হইলে আর পোকা ধরিবে না। ইহার গাছেও জাঙ্গলা দিতে হয় না, বাঙ্গির ন্যায় ক্ষেতে ধরে; এবং

সাধারণ বাগি অপেক্ষা বড় হয়। নূতন বীজ অপেক্ষা ইহার পুরাতন বীজ উত্তম।

পানিকচু।

উপযুক্ত সময়ে কচু তুলিয়া লইলে তাহার গোড়ে যে ছোট চারা থাকে তাহা তুলিয়া স্থানান্তরে কর্দ্দমিত স্থানে রোপণ করিয়া রাখে, চৈত্র বৈশাখ মাসে সেই চারা রোপণ করিতে হয়। দলদলিয়া মাটি ভিন্ন পানিকচু হয় না, ইহাতে কোনরূপ সার দেওয়া কি কর্ষণ কিছুই আবশ্যক হয় না, কেবল মাত্র মাটির গুণে ইহা উত্তমাধম হয়। মাটি যত দলদলিয়া হয় ততই কচু উত্তম হইবে। বর্ষায় জল আসিয়া যখন গাছ ডুবাইয়া ফেলে তখন তুলিতে হয়। তুলিয়া ডিগা পাতা সুদ্ধ জলের উপর ভাসাইয়া রাখিতে হয় তখনও ইহা বৃদ্ধি হইতে থাকে। মাটীর নীচে থাকিতে যে কচু অর্দ্ধহাত হইয়াছিল তুলিয়া জলে রাখিলে আর ততখানি বৃদ্ধি হয়। এক একটী কচু আড়াই হাত পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। ইহাতে কৃষকের গুণাগুণের বিশেষ তারতম্য নাই। সকল কৃষকের পক্ষে পানিকচুর উপযোগী ক্ষেত্র ঘটে না। অস্বাভাবিক যত্ন চেষ্টা করিয়া ঐ ক্ষেত্র প্রস্তুত করা বড় কষ্ট। পানিকচু তিন চারি জাতি আছে; সুকচাব, পোলাকুলি, নারিকেলী, দেশী ইত্যাদি।

ভুট্টা।

স্থানবিশেষে ইহার নানাবিধ নাম যথা—ভুট্টা, মাথৈ, মগধান, দেধান, ইত্যাদি; বস্তুত ইহা একই পদার্থ। তবে স্থান বিশেষে কিছু আকারের বিভিন্নতা হইতে পারে। বৈশাখ হইতে আষাঢ়মাস পর্য্যন্ত ইহার বীজ বপনের সময়।* নিয়মানুসারে পূর্ব্ব হইতে ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে হয়, তিন চারি চাষের অধিক দিতে হয় না। প্রতি বিঘায় চারিমণ গোবর এবং দুই মণ খইলের অধিক দিতে হয় না। ক্ষেত্রে মৃত্তিকা সমপরিমাণে দোয়াশ

---

* চেষ্টা করিলে বারমাসও জন্মান যাইতে পারে।

না হইয়া বালির ভাগ কিঞ্চিৎ অধিক থাকিলেও ক্ষতি হয় না। গোবর সমুদয় ক্ষেত্রে দিয়া চাষ দিতে হয়, তারপর এক হাত অন্তর আলি করিয়া তাহাতে খইলের তরল সার দিয়া কোদালির দ্বারা আলির মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিয়া দিতে হয় আলির উপর মুঠুম হাত অন্তর দুই তিনটী করিয়া বীজ বপন করিতে হয়। প্রতিবিঘায় দেড় সেরের অধিক বীজের আবশ্যক হয় না। যেখানে তিনটী গাছই উঠে তথায় তাহার একটী নষ্ট করিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। অনাবৃষ্টি না হইলে ক্ষেত্রে জল সেচিবার প্রয়োজন হয় না। মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়ার মাটি খুঁড়িয়া জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া দিতে হয় এবং উভয় পার্শ্বের আলির মধ্যের মৃত্তিকা গাছের গোড়ায় তুলিয়া দিতে হয়। বীজ বপনের সময় হইতে অনধিক তিন মাসের মধ্যে ফল ধরে। যে স্থান বর্ষায় জলে ডুবিয়া যায় সেখানে ভুট্টা জন্মিতে পারে না। পার্ব্বতীয় প্রদেশেই ইহা ভাল জন্মে।

ওল।

স্থান বিশেষে ইহাকে বাঁক তরকারী বলে। যে ক্ষেত্রে বর্ষায় জল উঠে কি বৃষ্টির জল অধিককাল স্থায়ী হয় তদ্রূপ ক্ষেত্রে ওল ভাল হয়না, দোয়াশ মৃত্তিকা বিশিষ্ট ক্ষেত্র ইহার উপযোগী। ওলের গায়ের সঙ্গে গোটা গোটা কচুর মুখির মতন থাকে তাহাই বীজ স্বরূপে ব্যবহৃত হয়। ওলের বীজ বপন করিলে একবৎসরে অধিক বড় হয়না। আশ্বিন মাসে ওলের গাছ সকল মরিয়া যাইতে থাকে তখন তুলিয়া রাখিতে হয় এইরূপে ক্রমে তিন চারি বৎসর তুলিতে হয় এবং সময় অনুসারে রোপণ করিতে হয়। ওলের ক্ষেত্র অত্যন্ত কর্ষণ করিতে হয়। প্রথম হইতে দ্বিতীয় বৎসর অধিক খনিত হওয়া আবশ্যক। এইরূপে তৃতীয় বৎসর তদপেক্ষা অধিক। ফাল্গুন মাসে দুই তিন চাষ দিয়া বিঘাপ্রতি অর্দ্ধমণ চূণা দিয়া ক্রমে চাষ দিয়া ক্ষেত্রের মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিতে হয়। শেষ প্রতি বিঘায় তিন মণ গোবর এক মণ ছাই দিতে হয়। বীজবপনের অনধিক দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে দুই মণ পরিমাণ খইলের চূর্ণ মাটির সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্ষেত্রে দিয়া এক হাত

অন্তর আলি করিয়া অর্দ্ধ হাত অন্তর বীজ বপন করিতে হয়। গাছ হইলে মধ্যে মধ্যে দুদিকের মাটী আলির উপর তুলিয়া দিতে হয়। দ্বিতীয় বৎসর এই বীজ পুনরায় রোপণ কালে ক্ষেত্র পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা অধিক খনন করিতে হইবে খইল গোবর ও পূর্ব্ব বৎসরের একচতুর্থাংশ পরিমাণ বেশী দিতে হইবে এবং একচতুর্থাংশ পরিমাণ অতিরিক্ত ব্যবধানে রোপণ করিতে হইবে। তৃতীয় বৎসরেও এই সূত্রানুসারে কার্য্য করিতে হইবে। ইহাতে তৃতীয় বৎসরে ওল সকল অনূ্যন বার তের সের ওজন হইবে। কেহ চতুর্থ বৎসরেও রোপণ করে।

বাখরগঞ্জের অধীন ভবানীপুর নামক স্থানে ওলের চাষ অধিক; তাহারা রীতিমত সার ব্যবহার করে না অথবা নিয়মানুযায়ী কর্ষণ বপন করে না, কিন্তু চারি পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত এইরূপ পুনঃ পুনঃ রোপণ করে। পোনের ষোল সের ওজনের ওল দেখা গিয়াছে, নিয়মানুসারে করিলে তদপেক্ষা আকার আরও বৃহৎ হয়। চারি পাঁচ বৎসরের সময় তাহারা ১০০। ১২৫ টাকা প্রতি বিঘায় বিক্রী করে।

অড়হর এবং ভের্‌ণ্ডা।

অড়হর সর্ব্বত্র পরিচিত, ব্যবহারও কাহারও অজ্ঞাত নাই। ভের্‌ণ্ডা— ইহার অপর নাম রেড়ি, রেড়ির তৈল এবং খইল উভয়ই অধুনা সমধিক আদরের জিনিষ হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্ববাঙ্গলায় ইহার চাষ-আবাদ প্রায় দেখা যায় না, কোন কোন কৃষক ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকের কাঁচা কাটিয়া সেই নূতন মাটিতে, কি নূতন পুষ্করিণির পাড়ে অড়হর এবং রেড়ি লাগাইয়া থাকে। অড়হর, রেড়ি ও কৃষকের পক্ষে অতিশয় লাভের কৃষি, অধিক যত্ন চেষ্টা করিতে হয় না; অধিক সার দিতে হয় না এবং এক বৎসর লাগাইলে ক্রমে দুই তিন বৎসর ফল হইয়া থাকে। ইহা প্রায় সাধারণতঃ সকল মৃত্তিকায়ই জন্মে। বর্ষার জল উঠিবার উপযুক্ত স্থানে লাগান বিধি নয়, পতিত ভূমি কর্ষণ করিয়া বীজ বপন করিলে ভাল হয়। বিঘাপ্রতি চারি মণ গোবরের খইল দিয়া চৈত্র মাসে ক্ষেত্রে চারি পাঁচখান চাষ দিয়া

জঙ্গলাদি বাছিয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হয়। বৈশাখমাসের প্রথমে বৃষ্টি হইলেই ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতে হয়। অনেকে ক্ষেত্রে বীজ ছড়াইয়া দিয়া মই দিয়া থাকে। তাহাতে গাছ ঘন হইয়া সতেজ হয় না, ফসল কম হয় এবং দেখিতে বিশৃঙ্খল লাগে। আমরা তাহাকে প্রশস্তপ্রণালী মনে করি না। ক্ষেত্রে একহাত অন্তর সারি করিয়া লাঙ্গল দ্বারা এক একটা টান দিয়া লইতে হয়। অন্যূন অর্দ্ধহস্ত ব্যবধানে তিনটী করিয়া বীজ বপন করিয়া উভয়দিকের মাটির দ্বারা ভরিয়া দিতে হয়, যেন দেড় কি দুই ইঞ্চি পরিমাণের অধিক মাটি চাপা না পড়ে। প্রতিবিঘায় অড়হরের /২॥ সের এবং রেড়ির /৩ সেরের অধিক বীজ লাগে না। চারা বাহির হইলে গাছের গোড়ার মাটি খুঁড়িয়া জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিয়া দিতে হয় এবং যেখানে তিনটী চারা উঠে, সেখানকার একটী তুলিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। এইরূপে বীজ বপন করিলে গাছ সকল সতেজ হইয়া অধিক ফলশালী এবং দেখিতে সুন্দর হয়, বিশেষতঃ ফলাদি তুলিবার পক্ষে উভয় সারির মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতে সুবিধা হয়। একবার ফল ফলিয়া যাওয়ার পর ফাল্গুন মাসে কি চৈত্রের প্রথমে অড়হর গাছের সমুদায় শাখা পত্রাদির অগ্রভাগ কাটিয়া ফেলিয়া দিতে হয় এবং বৈশাখ মাসে বৃষ্টি হওয়ার পর গাছের গোড়া গুলি পরিষ্কার করিয়া মাটি খুঁড়িয়া দিতে হয়। এক এক স্থানে যে একত্রে দুইটী করিয়া গাছ থাকে তাহার এক একটীর গোড়াশুদ্ধ কাটিয়া ফেলিয়া দিতে হয়, নচেৎ ফল ছোট হইয়া যায়। তৃতীয় বৎসরেও এইরূপ কার্য্য করিতে হয়, তৃতীয় বৎসরের পরও গাছ রাখা যাইতে পারে কিন্তু তাহা উচিত নহে, তাহাতে ফল ছোট হইয়া যায়, এবং পোকা ধরে। রেড়ির সম্বন্ধেও একই নিয়ম, কেবল বিভিন্ন মাত্র এই যে রেড়ির গাছের আগা কাটিয়া দিতে হয় না। রেড়ি দেশী এবং বিলাতি। আবার দেশীর মধ্যেও দুই প্রকার; বড় ভের্‌গা এবং গেটি ভের্‌গা। যাহার গাছ খর্ব্বাকৃতি হয় তাহাকে গেটিভের্‌গা বলে, যাহার গাছ বড় হয় তাহাকে বড় ভের্‌গা বলে। বড় ভের্‌গা অপেক্ষা গেটি ভের্‌গার তৈল অধিক হয়।

ফুলের বাগিচার গাছ যেপর্য্যন্ত বড় না হয় তাবৎকাল বাগিচার মধ্যে

বীজ বপন করিলেও ফলের গাছের বিশেষ ক্ষতি হয় না, এ ভিন্ন যে সকল কৃষিক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে কাঁচা ফিরাইতে হয় কি ফিরান থাকে, তাহার কান্দির উপর অপেক্ষাকৃত ঘন করিয়া সারি বরাদ্দে লাগাইলে অধিকন্তু একটী ফসল লাভ হয় এবং ক্ষেত্রস্থ শস্যেরও কোন হানি করে না, বরং একটী উপকার হয় ক্ষেত্রে বেড়া না দিলে গরু ছাগলাদিতে যে শস্যের হানি করে তাহা নিবারণ হয়, অড়হর গাছের দ্বারাই বেড়ার কার্য্য হয়।

গোল আলু।

গোল আলুকে অনেক স্থানে বিলাতি আলু বলিয়া থাকে। অনেক স্থানের কৃষকদিগের সঙ্গে আলাপে জানা গিয়াছে, অদ্যাপিও তাহাদের বিশ্বাস যে, এই আলু এখনও বিলাত হইতে আসিয়া থাকে। ইহা এ দেশে জন্মিতে পারে না। পূর্ব্বে যে, এ দেশে এই আলুর চাষ-আবাদ ছিল ইহা বোধ হয় না. এই আলু দক্ষিণ আমেরিকার অরণ্যে স্বভাবতঃজন্মিত। অনধিক ২শত বৎসর হইল আবিষ্কার হইয়া সর্ব্বদেশময় হইয়াছে। ইতিহাসে জানা যায় যে, আয়র্লণ্ড হইতে প্রথমত ইহার বীজ এদেশে আনীত হয় * বিলাতের মধ্যেও আয়র্লণ্ডই এই আলুর জন্য বিখ্যাত, আয়র্লণ্ডবাসীদের মধ্যে এখনও অনেকে একমাত্র আলু খাইয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

এখন এই আলু আমাদের দেশের একটী শ্রেষ্ঠ কৃষি হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের দেশের সাধারণ ব্যবহার্য্য যতপ্রকার কৃষি আছে তন্মধ্যে আলু আর ইক্ষু এই দুইটী কৃষকের পক্ষে প্রায় সর্ব্বাপেক্ষা লাভের কৃষি। তন্মধ্যেও ইক্ষু অপেক্ষা আলুতে অধিক লাভ, অধিক সুবিধা; আলু ক্ষেত্র হইতে তুলিয়াই বিক্রয় করিতে পারা যায় অথবা একমাস দেড় মাস থাকিলেও নষ্ট হয় না। ইক্ষুতে সে সুবিধা নাই, তাহাতে (Manufacture) আবশ্যক করে †। এই সকল কারণে আলুর চাষে লোকের অধিক

---

* তজ্জন্যই ইহার নাম বিলাতি আলু।

† অনেক স্থানের কৃষকেরা এখনও এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

যত্নচেষ্টা বাড়িয়াছে। আলুর চাষ সম্বন্ধে আমরা বহু যত্নসহকারে নানা স্থানের কৃষকদিগের রীতি-নীতি ব্যবহারাদি সংগ্রহ করিয়াছি এবং কৃষিসংক্রান্ত গ্রন্থকারদিগেরও এ সম্বন্ধে যে সকল মতামত আছে তাহাও অনেক তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করিয়াছি। এতৎসমুদায় কার্য্যক্ষেত্রে পরিণত করিয়া তাহা হইতে যে পরিমাণ জ্ঞানলাভ করিতে পারিয়াছি কি সুবিধা বোধ করিয়াছি তাহাই এস্থলে প্রকাশ করা যাইতেছে।

প্রতি বৎসর এক ক্ষেত্রে আলু জন্মাইলে ভাল হয় না। আলুর ক্ষেত্র বারমেসে হওয়া আবশ্যক, কিন্তু সেই ক্ষেত্র বারমেসে রাখিলেও তাহাতে ভাল হয় না। তবে যে সকল ক্ষেত্রে স্বভাবতই অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বালি পড়ে, তাহাতে প্রতিবৎসর আলুর চাষ করিলে ক্ষতি হয় না। সকল স্থানের কৃষকের ভাগ্যে সে সুবিধা ঘটে না। আমাদের মতে যে যে ক্ষেত্রে আলুর চাষ করা হইল, পর বৎসর তাহাতে দেশী ইক্ষু অথবা অন্য কোন কৃষি উৎপন্ন করিয়া তৎপর বৎসর বারমেসে রাখিয়া রাখিয়া পুনরায় আলুর চাষ করাই উত্তম ব্যবস্থা। আলুর চাষে পলিমাটিই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম; জল যেমন ফিল্টারের দ্বারা পরিষ্কৃত এবং মনুষ্যাদির ব্যবহারের পক্ষে বিশুদ্ধ হয়, পলি ও মৃত্তিকার মধ্যে তদ্রূপ বিশুদ্ধ এবং পরিষ্কৃত। যে ক্ষেত্রে অনূন তিন ইঞ্চি পরিমাণ পলি পড়ে সে ক্ষেত্রে প্রায় কোন সারেরই আবশ্যক করে না, আলুর ক্ষেত্রের মাটি অত্যন্ত পরিষ্কৃত এবং সচ্ছিদ্র হওয়া আবশ্যক। পলিমাটিতে এই দুই গুণই আছে, অধিকন্তু নানাবিধ মিশ্রসার জড়িত। যে ক্ষেত্রে সাধারণতঃ পলি না পড়ে, সেখানে অন্য স্থান হইতে পলি তুলিয়া ক্ষেত্রে দেওয়ারও বিধি আছে; তাহাতে অন্য সার কম দিয়া পারা যায়। আমাদের দেশের অতি অল্প কৃষকেরাই রীতিমত সার ব্যবহার করিয়া কৃষি উৎপন্ন করিয়া থাকে, যেস্থানে ঐরূপ সুবিধামত ক্ষেত্র আছে সেইখানেই তাহার চাষ-আবাদ হয়, অন্য স্থানে করে না, করিলেও যদি এক বৎসর

মাত্র যেস্থানের কৃষকেরা রস পাইয়াছে সেই স্থানেই যত্ন চেষ্টা বাড়িয়াছে, আলুর জমির খাজানাও চতুর্গুণ হইয়াছে।

ফল ভাল না পায় তবেই তাহা ছাড়িয়া দেয় কেন যে হইল না তাহার কারণ অনুসন্ধান করে না এবং একজনের ভাল ফলে নাই বলিয়া অন্যেরাও নিশ্চেষ্ট নিরুৎসাহ হইয়া বসিয়া থাকে। যেস্থানে তদ্রূপ সুবিধা না থাকে সেই স্থানেই নানাবিধ অস্বাভাবিক চেষ্টা এবং বহুপরিমাণে সার ব্যবহার করিতে হয়।

দোয়াঁশ মৃত্তিকা বিশিষ্ট ক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়া তাহা পর্য্যায়ানুসারে বারমেসে রাখিতে হয়।* জমি বারমেসে রাখিতে প্রতি মাসে দুই তিন খানি চাষ দিয়া মই দিয়া মাটী আলগা এবং ঘাস জঙ্গলাদি পরিষ্কার রাখিতে হয়। শ্রাবণ মাসের শেষ কি ভাদ্র মাসের প্রথমে প্রতিবিঘায় এক মণ করিয়া চুণা দিয়া দুই এক খানি চাষ দিয়া ক্ষেত্রের সহিত মিশাইয়া দিতে হয়। তৎপর প্রতিবিঘায় অন্যূন ৩০/ ত্রিশ মণ গোবরের সার এবং ২০/ বিশ মণ খইল (রেড়ি হইলে ভাল হয় অগত্যা সরিষা) সার ব্যবহার প্রণালীর নিয়মানুসারে) তরল এবং শুষ্ক উভয় প্রকার, এতদ্ভিন্ন ৮/ মণ করিয়া ভস্ম দিতে হয়। আলুর ক্ষেত্রের মৃত্তিকা রসযুক্ত (সেঁত সেঁতে) হওয়া উচিত নহে। যদি কিছু রসযুক্ত হয় তবে আর কিছু অধিক পরিমাণে ভস্ম দিতে হয়। রসাল মৃত্তিকায় আলুর গাছ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পারে তাহাতে আলু বড় হয় না, অধিক হয় না এবং পোকা ধরে। ভস্ম দেওয়াতে পোকা নিবারণ হয় এবং মৃত্তিকার অবস্থান্তর ঘটে। ক্ষেত্রের মৃত্তিকা চাষের দ্বারা অন্যূন আধ হাত অনধিক তিন পোয়া হাত পরিমাণ খনিত হওয়া আবশ্যক এবং অত্যন্ত চূর্ণ করিয়া † ঘাস জঙ্গলাদি এরূপ ভাবে পরিষ্কার করিতে হয় যে, তাহাতে কিছু মাত্র না থাকে এবং একবারে ধুলিবৎ দেখা যায়। প্রতিমাসে যে চাষ দিতে হয়, তদ্ভিন্ন আশ্বিন মাসে জমি প্রস্তুতে ১৪। ১৫ খান চাষ লাগে ক্ষেত্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া একটী টাকা কাইত করিয়া ছাড়িয়া দিলে যেন প্রায় কর্ষিত স্থানের নিকটে

---

* ডেরাডুনের কৃষকেরা এক ক্ষেত্রে বৎসরে দুই বার আলু ফলায়। কার্ত্তিক মাসে এক বার, ফাল্গুন মাসে এক বার।

† কৃষকেরা বলে, ভরা কলসী ছাড়িয়া দিলে যখন না ভাঙ্গে তখন আলুর ক্ষেত্র চাষ হয়।

যায়। ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিগের আলি বহির্ভাগে রাখিয়া চতুর্দ্দিক ঘুরাইয়া মুঠুম হাত পরিসর নালা রাখিতে হয়, নালা করিবার জন্য আর মৃত্তিকা খনন করিতে হয় না। মাত্র ক্ষেত্রের খনিত মৃত্তিকা ক্ষেত্রের দিকে তুলিয়া দিতে হয়। সেই নালা হইতে চারি হাত ব্যবধানে উত্তর দক্ষিণ দিক করিয়া পরস্পর ঐ পরিমাণ ব্যবধানে সমুদায় ক্ষেত্রে নালা করিতে হয় * এই রূপ নালা থাকাতে ক্ষেত্রে জল দিবার সুবিধা হয়। দুই পার্শ্বের দুই নালা দিয়া জল আসিয়া উভয় নালার মধ্যস্থ স্থান ভিজিয়া যায়। উপরে জল ছিটাইয়া দেওয়া অপেক্ষা এই রূপে জল দেওয়ায় অধিক উপকার, দ্বিতীয়তঃ নালা থাকাতে তাপাধিক্য ও অপেক্ষাকৃত সহ্য করিতে পারে। উভয় নালার মধ্যভাগে যে জায়গা থাকে তাহাতে অনূ্যন সওয়া হাত অনধিক দেড় হাত ব্যবধান পূর্ব্ব পশ্চিম সারি করিয়া † আদ হাত অন্তর বীজ প্রণালীর নিয়মানুযায়ী নির্ব্বাচিত বীজ বপন করিতে হইবে। এক হাত ব্যবধান সারি করাই কৃষকদিগের সাধারণ মত কিন্তু আমরা দেখিয়াছি তাহাতে একটু অসুবিধা হয় শেষ আর আলির উপর মাটি তুলিয়া দেওয়া যায় না উভয় সারিতে মিশিয়া পড়ে, এটা সাধারণতঃ সকলেই বুঝিতে পারেন। উভয় সারি এক হাত ব্যবধান আছে প্রত্যেক সারিস্থিত বীজের গোড়ায় যে মাটি দিয়া আলি করিতে হয় তাহা ক্ষেত্র হইতে অনূ্যন পোনের যোল ইঞ্চি উচ্চ হওয়া আবশ্যক। তাহাতে কি সারির মধ্যে ফাঁক থাকিতে পারে? ফাঁক না থাকিলে জল যাওয়ার অসুবিধা হয় এবং তাপাধিক্য নিবারিত হয় না। মাটি দেওয়া যায় না।

---

* ক্ষেত্রের পরিমাণানুসারে এই রূপ ভাগের দ্বারা ভগ্নাংশ থাকিলে চারি হাত হইতে বেশী করিলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু পাঁচ হাতের অধিক হইলে অসুবিধা ঘটে।

† পূর্ব্ব পশ্চিমাভিমুখে সারি করিয়া বীজ বপনের কারণ এই যে, উভয় সারির মধ্যের মাটি বীজের গোড়ায় তুলিয়া দেওয়াতে প্রত্যেক সারির উভয় পার্শ্বে নালার মতন হইয়া পড়ে, এই নালা সকলে পূর্ব্ব পশ্চিম থাকাতে তাপ কম লাগে। যে সকল ক্ষেত্রে নালা করিতে হয় তাহা পূর্ব্ব পশ্চিম হওয়া প্রায় সমুদায় কৃষির জন্য উচিত, ইহা সাধারণ নিয়ম।

বীজ বপন কালে লাঙ্গল দ্বারায় এক একটি টান দিয়া সারি করিতে হয়। তাহার মধ্যে (বীজের যে দিকে অধিক অঙ্কুর অথবা চোখ দেখা যায় সেই দিক উপরে রাখিয়া) বীজ বপন করিতে হয়। লাঙ্গলের টানে যে মাটি দুই দিকে সরিয়া যায় সেই মাটি টানিয়া সমান করিয়া দিলেই হয় অর্থাৎ বীজের উপর অধিক মাটি চাপা না পড়ে। আমাদের নির্ব্বাচিত বীজ এক বিঘায় ২॥০ মণের অধিক লাগে না। বীজ বপনান্তে যত দিন অঙ্কুর বাহির হইয়া গাছের দুই তিনটি পাতা না হয় তত দিন প্রত্যহ শেষ বেলা ঐ সকল সারির উপর জল ছিটাইয়া দিতে হয়। জল এমন পরিমাণে দিতে হয় যে মাটিটা শীতল এবং অল্প রসযুক্ত থাকে, তখন অধিক পরিমাণ জল দিলে বীজ পচিয়া যায়, তাহাতে সকল গুলি অঙ্কুরে গাছ হয় না। গাছ একটু বড় হইলে সারির মধ্য হইতে কতক মাটি তুলিয়া গাছের গোড়ায় দিতে হয় প্রত্যেক বীজ হইতে যে সকল গাছ গুলি বাহির হয় তাহার দুর্ব্বল, নিস্তেজ গাছ ফেলিয়া দিতে হয়। মাটি দেওয়ার পর একবার জল সেচিয়া ঐ সকল নালার মধ্যে দিতে হয়, দুই তিন দিন পরে গাছ গুলি আলির উপর ঈষৎ বক্র করিয়া পুনরায় মাটি দিয়া দিতে হয়, একবার জল সেচার পর দুই সপ্তাহ পর পুনরায় এই রূপ জল এবং মাটি দিতে হয়, পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিতে হইবে। বীজ অগ্রে বপন করা হইলে অগ্রহায়ণ মাসের শেষতকই আলু খাইবার উপযুক্ত হয়। পৌষ মাসের প্রথমেই কৃষকেরা গাছের গোড়ার আলি ভাঙ্গিয়া উপযুক্ত রকম আলু তুলিয়া বিক্রয় করে কারণ তখন আলুর দর বেশী থাকে। আলি ভাঙ্গিবার সময় হাত দিয়া অথবা বাঁশের চটি দিয়া ভাঙ্গিতে হয় লোহার অস্ত্রাদির দ্বারা ভাঙ্গিয়া আলু তুলিলে গাছের শিকড়-আদি কাটিবার আশঙ্কা থাকে। একবার আলু তুলিয়া লওয়ার পর পুনরায় আলি বান্ধিয়া দিতে হয় এবং তৎকালে কতক পরিমাণ ভস্ম গাছের গোড়ায় দিয়া মাটি দিলে ভাল হয়। মাটী দিয়াই পূর্ব্ববৎ ক্ষেত্রে জল সেচিয়া দিতে হয়, তখন গাছ সকল পূর্ব্ব হইতে তেজাল হইতে থাকে এই সময় গাছের আগাগুলি মুচড়িয়া দিতে হয়। একেবারে বিচ্ছিন্ন না করিলেও হয়, তখন সপ্তাহ অন্তর এক এক বার জল সেচিয়া দিতে হয়।

এবং গাছের গোড়ার মাটি তুলিয়া দিতে হয়, কেহ মাঘ মাসের প্রথমে, আর একবার তুলিয়া লয়; আমরা তাহা সঙ্গত মনে করি না, কারণ তাহাতে আলু বড় হয় না। ফাল্গুন মাসের প্রথমেই গাছ সকল মরিয়া যাইতে থাকে, তখন তুলিলেই ভাল হয়। গাছ একবার মরিয়া গেলে আর আলু তুলিতে বিলম্ব করা বিধেয় নয়; তাহাতে বীজ ভাল হয় না। গাছের আলু যাহাদের অধিক বড় করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহাদের অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমার্দ্ধ অন্তেই গাছের গোড়ার আইল ভাঙ্গিয়া এক এক গাছে চারি পাঁচটি মাত্র আলু রাখিয়া আর ছোট ছোট আলু গুলি ফেলিয়া দিতে হয় এবং তখনই গাছের আগা সকল মুচড়িয়া দিতে হয় এবং পূর্ব্বোক্ত নিয়মে অন্যান্য কার্য্যাদি সম্পাদন করিয়া আসিতে হয়। কিন্তু অনধিক তিন সপ্তাহ অন্তে এক একবার গাছের গোড়ায় ছোট ছোট যে সকল আলু জন্মিতে থাকে তাহা ফেলিয়া দিতে হয়; তাহা হইলে এক সের সওয়া সের ওজনের এক একটী আলু হইয়া থাকে। দুই তিন বৎসর পর আলুর বীজ পরিবর্ত্তন করিতে হয়, অর্থাৎ ক্ষেত্র হইতে যে বীজ রাখা যায় তাহা না লাগাইয়া, ভিন্নদেশীয় বীজ লাগান উচিত, আমাদের দেশে যত প্রকার আলুর বীজ ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে নাইনি-তালের বীজ উত্তম। যে কএক প্রকারের আলুর পরিচয় এপর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে হাঙ্গরমুখা আলু সর্ব্বাপেক্ষা বড় হইতে দেখা গিয়াছে।

আলুর চাষ সম্বন্ধে যাঁহারা কিছু পর্য্যালোচনা কি অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারাই নাইট সাহেবের আলু ক্ষেত্রের পরিচয় অবগত থাকা সম্ভব। নাইট সাহেব এক বিঘা জমিতে ৩১৪/ মণ আলু জন্মাইয়াছিলেন এবং তাঁহার ক্ষেত্রের আলু এক একটি /৭ সাত সের পর্য্যন্ত ওজনের হইয়াছিল। আমাদের দেশি কৃষক-মণ্ডলী একথা শুনিয়া বিস্মিত এবং চমৎকৃত হইয়া উঠে। দৈববল ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে পারে না। নাইট সাহেবের ন্যায় যে আর কেহ আলু জন্মাইতে পারিয়াছেন এপর্য্যন্ত এমন দ্বিতীয় কৃষকের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। আমাদের দেশে যে যে স্থানে আলুর চাষ অধিক হয় এবং উত্তম জন্মে, তৎসমুদয় স্থানের প্রায় অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি ৮০/

মণের অধিক কোন কৃষক আলু জন্মাইতে পারে না। আমরা এপর্য্যন্ত নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া কোন উপায়েও ১০০ শত মণের অধিক আলু জন্মাইতে পারি নাই এবং /১॥ সেরের অধিক আলুর ওজনও হয় নাই *। নাইট সাহেবের মতও অবলম্বন করা হইয়াছে (একমাত্র তাঁহার নিয়মানুযায়ী অস্থিচূর্ণ ব্যবহার করিতে অক্ষম হইয়াছি।) তাহাতেও তদ্রূপ কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় নাই। সর্ব্ব লক্ষণাক্রান্ত ক্ষেত্রে চাষ করা হয় নাই। উত্তম কৃষি প্রণালীর দ্বারা যে আকৃতি অবয়বের এবং স্বদেশের উৎকর্ষতা হয়, অধিক ফল লাভ করা যায় তাহা অবশ্য বিশ্বাস করি। নাইট সাহেবের মতে সমুদয় ক্ষেত্র, বিস্তৃত হইয়া চারি ইঞ্চি পরিমাণ সার পড়া উচিত।

তামাক।

এপর্য্যন্ত তামাকের কৃষি প্রণালী সম্বন্ধে যে কিছু পাঠ করিয়াছি এবং নানা স্থানের কার্য্য প্রণালীর অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে মতের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কেহ বলিয়াছেন, কালবর্ণ মৃত্তিকায় তামাক উত্তম জন্মে, আদৌ মৃত্তিকার বর্ণমাত্র দেখিয়াই সকল স্থলে

* এক কাঠা কি অর্দ্ধ কাঠা জমিতে চাষ করিয়া তাহারই পরিমাণ অনুসারে বিঘার হিসাব ধরা গেল কিন্তু ইহাকে আমরা ঠিক হিসাব মনে করি না। বিস্তার ক্ষেত্রের প্রতি তদ্রূপ সমভাবে দৃষ্টি রাখা যত্ন করা কৃষকের পক্ষে বড় সহজ নয়, সুতরাং তাহাতে ফসল কিছু কম হইবার কথা। আমাদের বোধ হয়, নাইট সাহেবও সেইরূপই বিঘার হিসাব দেখাইয়া দিয়াছেন। মনে করিতে পারেন যে এক কাঠায় হইতে পারিলে এক বিঘায়ও হইতে পারে এক শত বিঘায়ও হইতে পারে তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। একগাছে পাঁচটী আলুর মধ্যে একটী এক সের, একটী আদ সের, একটী এক পোয়া ইত্যাদি যখন অনুমান হয়, অথচ তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া কার্য্য করাও সহজ নয় ; সুতরাং এক কাঠার হিসাবে এক বিঘার পরিমাণ করা আমরা ঠিক মনে করি না। তবে এই পর্য্যন্ত যে তাহা হইতে একটা অনুমান করা যায় একটা ভাব পাওয়া যায়।

গুণ নির্ণয় করা যায় না, বিশেষতঃ মৃত্তিকায় মাত্র একটা বর্ণের উল্লেখ করিলেই অন্যকে ক্ষেত্রের মৃত্তিকা চিনাইয়া কি বুঝাইয়া দেওয়া কষ্টকর। অনেক স্থলে মৃত্তিকার এমন বর্ণ আছে যে অন্য কোন বস্তুর সহিত তাহার সাদৃশ্য দ্বারা তুলনা করিয়া কি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝান যায় না (কোন সুচিত্রকরও সে বর্ণ ফলাইতে পারেন কিনা সন্দেহ)। কাল বর্ণ মৃত্তিকা তামাকের ক্ষেত্রের জন্য বাস্তবিক উপযোগী কিন্তু সে কালবর্ণ জটিল মৃত্তিকা নয়। ঘাস পাতা জঙ্গলাদি পচিয়া যে মৃত্তিকা একরূপ কালবর্ণ ধারণ করে, সেই মৃত্তিকা; পূর্ব্বে দলদলিয়া মৃত্তিকার যে লক্ষণ বলা হইয়াছে সেইরূপ মৃত্তিকা বটে কিন্তু ক্ষেত্র তদ্রূপ নয়। সাধারণত দলদলিয়া মৃত্তিকা যেরূপ রসযুক্ত থাকে, তৎপরিমাণ রসযুক্ত ক্ষেত্রে তামাক ভাল জন্মে না। তদ্রূপ ক্ষেত্র যদি তামাকের উপযোগী নীরস ঘটে তবে তাহাতে কোন সার না দিলেও উত্তম তামাক জন্মে। কিন্তু সকল স্থানে তদ্রূপ ক্ষেত্র ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। সাধারণতঃ দোয়াশ মৃত্তিকায়ই তামাক জন্মিতে পারে। তন্মধ্যে তামাকের জাতিবিশেষে ভাগের ন্যূনাতিরেক (কোন ক্ষেত্রে আঠালের ভাগ অধিক কোন ক্ষেত্রে বালির ভাগ অধিক) দেখিয়া নির্ব্বাচন করিতে হয়। তামাকের অনেক গুলি জাতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। যথা—পানমুটী ১, হবিনপারি ২, সিন্দুরঘটুয়া ৩, চামা ৪, ডেলেঙ্গি৫, নায়োখোল৬, শীরজাই৭, কালীজিবে৮, কৃষ্ণকলী৯, মাঝতা১০, হাতিকাণি১১, শকুনকাণি১২, ছোটনা১৩, হিঙ্গলি১৪, কোপি১৫। ইহার মধ্যে চামা, সিন্দুরঘটুয়া, ডেলেঙ্গি, নায়োখোল, হিঙ্গলি, এই পাঁচটি প্রধান। ইহার অনেক গুলি নামের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে, কালীজিবে, ঠিক কালীর জিবের ন্যায়, শিবের জটা ঐরূপ জটার ন্যায়, হাতিকাণি হাতির কাণের ন্যায় ইত্যাদি। ইহার মধ্যেও আবার চামা তিন জাতি; যথা—চামা, শকুনিচামা, নাওশাল চামা। আবার সিন্দুরঘটুয়াও তিন জাতি; যথা—সিন্দুরঘটুয়া, চামাসিন্দুরঘটুয়া শকুনি, সিন্দুরঘটুয়া। যে ক্ষেত্রের উপরে মাটি এবং কিছু নীচেই চালি থাকে তাহাতে সিন্দুরঘটুয়া জাতি ভাল জন্মে। একটু আঠাল মাটির ভাগ বেশি থাকিলে শকুনি চামা ভাল হয়, নাওশাল চামাতে বালির ভাগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক থাকা

আবশ্যক। এ ভিন্ন সমুদয় তামাকই দোয়াশ মৃত্তিকায় ভাল জন্মিতে পারে।

তামাকের জমি ও প্রায় বার মাস রাখা আবশ্যক। অন্ততঃ বৈশাখ হইতেই প্রতিমাসে দুই তিন খান চাষ দিয়া জঙ্গলাদি উঠা নিবারণ করিয়া রাখিতে হয়। স্থানীয় অবস্থানুসারে ভাদ্র কি আশ্বিন মাসে চাষ দেওয়া সার দেওয়া আরম্ভ করিতে হয়। নীলের পাতা পচা, তামাক ক্ষেত্রের উত্তম সার। সকল স্থানে তাহা পাইবার সম্ভব নাই। রঙ্গপুর অঞ্চলের কৃষকেরা তামাকের উপকারিতার জন্য তামাক ক্ষেত্রে নীলের চাষ করিয়া লয়, তাহাতে তামাকের পক্ষে বিশেষ উপকার হয় এবং নীলেও কিছু লাভ পায়। গোবর আর সরিষার খইলেও তামাকের উপকার হয়। প্রতি বিঘায় অন্যূন ৩০/মণ গোবর ১০/মণ খইল দেওয়া আবশ্যক। ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার সময় আট দশ খান চাষ ও মই দিয়া ঘাসজঙ্গলাদি পরিষ্কার করিতে হয়। কেহ কেহ লবণ এবং সোরাকে তামাকের পক্ষে উত্তম সার বলিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন।* এ সকল অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য, লবণ সোরাতে তামাকের উপকার হইলেও এত মূল্যবান সার অধিক ব্যবহারে আমরা পরামর্শ দেই না। এসকল পদার্থ ভিন্নও তামাক উত্তম জন্মে।

ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে কেহ কেহ একবারেই তাহাতে তামাকের বীজ বপন করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন; আমরা তাহা সুসঙ্গত মনে করি না। অন্য স্থান হইতে চারা করিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করাতে যত সুবিধা একবার ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে তত সুবিধা হয় না; তাহাতে পরিশ্রম এবং ব্যয় অধিক হয়। একটি শিশু পালনে যত যত্নের আবশ্যক, একটি বয়োধিক বালক প্রতিপালন করিতে তত যত্নের আবশ্যক হয় না। তবে মনে করিতে পারেন যে, যেখানে চারা করিতে হয়, সেখানের জন্য ব্যয় এবং পরিশ্রমের আবশ্যক হয় না কি? তাহা হয় বটে কিন্তু দশ হাত দীর্ঘ প্রস্থ জায়গায় জল দেওয়া কি তত পরিমাণ জায়গা উত্তম কর্ষণাদি করা যত সহজ সমুদায় একখানি ক্ষেত্রকে তদুপযোগী করা তত সহজ নয়। কিন্তু

* রেঙ্গুন হইতে একজন সাহেব এগ্রিকলচার সোসাইটিতে এইরূপ রিপোর্ট দিয়াছিলেন।

বীজ পুতিবার গুণ এবং সুবিধাও কতক আছে, একবার ক্ষেত্রে বীজ রোপিলে যে চারা উঠে তাহা অধ্বংস হয় এবং কিছু অগ্রে ফল পাওয়া যায়। অন্য স্থানের চারা আনিয়া লাগাইলে, স্থানান্তরিত হওয়াতে প্রথমতঃ কতক দিন (যে পর্য্যন্ত ক্ষেত্রে লাগিয়া না যায়) নিতান্ত নিস্তেজ এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, সেই কাল পর্য্যন্ত আর তাহার বৃদ্ধি বা উন্নতি হয় না। রীতি মত স্থানান্তরিত করিলে তাহা পাতখোলা দিয়া কতকদিন ঢাকিয়া রাখিতে হয় এবং তাহার অনেক চারা মরিয়াও যায়। এসম্বন্ধে যিনি যেরূপ ভাল বোধ করেন তাহাতে আপত্তি নাই, আমরা চারা লাগানই ভাল ব্যবস্থা মনে করি।

ভাদ্র মাসের শেষ কি আশ্বিন মাসের প্রথমে, চারা করিবার জন্য ক্ষেত্রের পরিমাণানুসারে কতক স্থানের মৃত্তিকা উত্তমরূপ চূর্ণ বিচূর্ণ এবং পরিষ্কৃত করিতে হয়, এবং সকল স্থান অপেক্ষা উচ্চ করিতে হয়, যেন বৃষ্টির জল তাহাতে গড়াইয়া না আইসে উপরের বৃষ্টির জলও শীঘ্র নামিয়া যায়। বীজ বুনিবার পাঁচ ছয় ঘণ্টা পূর্ব্বে বীজ গুলি এক খানা কানিতে বান্ধিয়া কতক সোরা মিশ্রিত জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরে বুনিয়া ফেলিতে হয়। তাহাতে বীজ সকল সত্বর অঙ্কুরিত হয়। যে স্থানে বীজ বুনিয়া ফেলিতে হয় তাহার উপরে এক দেড় হাত উচ্চ করিয়া পাতলা পাতলা করিয়া ছন কি তদ্রূপ অন্য কোন পদার্থ দ্বারা ছাওনি বাঁধিয়া দিলে ভাল হয়। তাহাতে বৃষ্টির আধিক্য কি তাপের আধিক্য কিছুতেই ক্ষতি করিতে পারে না। বীজের অঙ্কুর বাহির হইয়া চারা সকল একটু বড় হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিদিন অল্প অল্প জল দিতে হয়। জল ছাওনির উপর দিলে তাহা হইতে আস্তে আস্তে বীজের উপর পড়ে * তাহাতে বীজের অঙ্কুরে আঘাত লাগে না এবং বীজ সকল একত্রে জড়সড় হইতে পারে না। রাত্রে ছাওনি গুলি তুলিয়া ফেলিতে হয়। আবার সকালে দিতে হয়। দুই দিবসান্তে এক এক দিন অল্প পরিমাণ সোরা

* যে বীজের চারা করিতে হয় তাহাই এইরূপে ছাওনি দিয়া জল দেওয়া সুবিধা এবং তাপাধিক্য ও বৃষ্টি আধিক্য প্রযুক্ত অনিষ্টও নিবারিত হয়।

জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিলে চারার পক্ষে অধিক উপকার হয়। চারার তিন চারিটী পাতা হইলেই ক্ষেত্রে রোপণ করা উচিত। চারা অধিক বড় করিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করিলে তাহা সতেজ হইতে অনেক বিলম্ব হয় এবং অনেক চারা একেবারে সতেজ হয় না। ক্ষেত্রে সারি করিয়া, (তামাকের জাতিবিশেষে ব্যবধানের ন্যূনাতিরেক করিয়া) লাগাইতে হয়। ডেলেঙ্গি—একটি হইতে অপরটি অন্যূন চারি ফিট পরিমাণ ব্যবধান থাকা উচিত। ইহার এক এক পাতা দুই হাত পরিমাণ লম্বা হইয়া থাকে। চামাও অন্যূন দুই হাত ব্যবধান থাকা উচিত। ইহার পাতা দেড় হাত লম্বা, দেড় হাত পরিসর হয়। ইহার মধ্যে নাওশাল চামা জাতীয়ের পাতা পাকিলে দুদিক হইতে বটিয়া (মুড়িয়া) আসে, সিন্দুরঘটুয়াও ঐরূপ ব্যবধান থাকা উচিত। ইহারও পাতা দেড় হাত লম্বা পোনে এক হাত পরিসর হয়। ইহার গাছ পাতা সকলই লাল বর্ণ এবং সুগন্ধি যুক্ত। এতদ্ভিন্ন আর সমুদয় জাতি তামাকের গাছ দেড় হাত অন্তর ব্যবধান লাগান যাইতে পারে। বরং কোপি তামাক এক হাত ব্যবধান লাগাইলেও ক্ষতি হয় না। ইহার পাতা সকল কোপির পাতা অপেক্ষা বড় হয় না। পাতা গুলিন অপেক্ষাকৃত অধিক দল হয়। দুইখানি শক্ত কলাপাতা একত্রিত করিলে যত পুরু হয় ইহার পাতা ততখানি হইয়া থাকে। চারা সকল ক্ষেত্রে লাগাইলে কলার পাত অথবা খোল দ্বারা ঢাকিয়া দিতে হয়। প্রতিদিন শেষ বেলায় অল্প অল্প জল দিতে হয়। চারা লাগিয়া গেলে আর জল দিতে হয় না।

চারা সকল ক্ষেত্রে লাগিয়া গেলে গোড়ার মাটি খুঁড়িয়া দিতে হয় এবং এই সময় প্রতিবিঘায় অন্যূন এক মণ খইলের চূর্ণ এবং এক মণ গোবরের চূর্ণ দুই মণ রসাল বালির সহিত মিশ্রিত করিয়া গাছের গোড়ায় দেওয়া আবশ্যক। উভয় গাছের মধ্যে ফাঁকা জায়গার মাটিও খুঁড়িয়া দেওয়া এবং জঙ্গলাদি পরিষ্কার করা আবশ্যক। তজ্জন্য নানারূপ উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। কেহ কোদালির দ্বারা ঐ কার্য্য করে; কেহ বা সারের মধ্য দিয়া লাঙ্গলও বাহিয়া থাকে। এতদপেক্ষা ইহার সহজ এবং সুন্দর উপায় আছে। পূর্ব্বে যে আচড়া (বিঁদা) যন্ত্রের উল্লেখ

করা হইয়াছে, সেই যন্ত্র এমন পরিমাণ লম্বা রাখিতে হয় যে সারের মধ্য দিয়া চালাইতে উভয় দিকের গাছের শিকড়ে না বাঝে, সেই আচড়া একটী গরুর সঙ্গে (যে ভাবে এক পশুর লাঙ্গল যুতিতে হয়) দুইটা বোমা দিয়া আচড়া যুতিয়া একজনে সেই আচড়া চাপিয়া ধরিয়া গরু চালাইলে জঙ্গল পরিষ্কার এবং মাটি আলগা হয়। একবার পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিম দিকে (সমুদয় ক্ষেত্র) চালাইয়া, পরে উত্তর দক্ষিণও ঐরূপ চালাইতে হয়। প্রতিসপ্তাহে এক একবার এইরূপ করা আবশ্যক। যখন গাছের পাতা সকল এমন বড় হইয়া পড়ে যে গরু চালাইতে পাতা ভাঙ্গিয়া যাইবার আশঙ্কা হয়, তখন গরু না চালাইয়া একজন মানুষে টানিতে হয়। ক্ষেত্রে অধিক রস থাকিলে দুই, তিন দিন পরেই এক বার আচড়া দিতে হয়।

একটী পাতার গোড়া দিয়া যে সকল কুঁড়ি (ডেম) উঠে, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। সর্ব্বদা ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। গাছে দশ বারটী পাতা হইলে গাছের অগ্রভাগ ভাঙ্গিয়া দিতে হয় এবং গোড়ায় দুই তিন পাতা ছিঁড়িয়া ফেলিতে হয়। তাহাকেই বিষপাত বলে। যে জাতির গাছের পাতা যত বড় হওয়া আবশ্যক কি সম্ভব তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ হইলে যদি বৃষ্টি না হয় তবে এই সময় একবার জল দিয়া সমুদয় ক্ষেত্র ভিজাইয়া দিতে হয় এবং পাতার উপরেও জল দিয়া দিতে হয়। জল দিবার জন্য ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে এবং মধ্যে নালা রাখিলে তাহাতে জল দিবার সুবিধা হয়। যে পর্য্যন্ত পাতার রঙ্গ কাল না হয় এবং পাতার গাড় রহিত না হয়, তাবৎ কাল জল ছিটাইতে হয়। গাছের পাতা সকল পরিপক্ক হইলে (নিরানির দ্বারা অথবা পূর্ব্বোক্তরূপ আচড়ার দ্বারা) গাছের মূল শিকড় ভিন্ন সমুদয় শিকড় গুলিন ছিঁড়িয়া বা কাটিয়া দিতে হয়। তাহাতে পাতা সকল উত্তম হয়।

মাঘ মাসের শেষ তক পাতা কাটিবার উপযুক্ত সময়। তামাকের পাতা কাটিবার দুই প্রকার নিয়ম; একরকমের নাম মগাই কাট, দ্বিতীয় প্রকার কড়ে কাট। গাছের কিয়দংশ ছালসহ যে পাতা কাটা যায় তাহাকে কড়ে কাট বলে। শুষ্ক হইলে কড়ির ন্যায় দেখা যায়;

গাঁছের তিন চারি অঙ্গুলি পরিমাণ ছাল সহ কাটাকে মগাই কাট বলে। গাঁছের কিয়দংশ সহ পাতা কাটা নিতান্তই আবশ্যক। পাতা কাটিয়া ২।৩ দিবস ক্ষেত্রেই ফেলিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু শিলা বৃষ্টির সম্ভব দেখিলে তুলিয়া ঘরে রাখিতে হয়। বাঁশের সহিত দড়ির সহিত ঝুলাইয়া রৌদ্রে শুকাইতে হয়। রাত্রে শিশির লাগে দিনে রৌদ্র লাগে এমন ভাবে রাখিতে হয় পাতায় বৃষ্টির জল না লাগে, এজন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হয়। পাতা এই ভাবে শুষ্ক হইলে জাঁক দিতে হয়। এক খানা মইর উপর বোঁটা বাহিরের দিকে করিয়া উভয় দিক হইতে পাতা সাজাইতে হয়। এইরূপে সাজান হইলে, মইর নীচে উপরে দুইদিকে দুটা বাঁশ চাপা দিয়া রৌদ্রে ঝুলাইয়া রাখিতে হয়। এইরূপ তিন দিনের অধিক রাখিতে হয় না; রাখিলে তামাক নষ্ট হইয়া যায়। মই হইতে তামাক নামাইয়া প্রয়োজন মতে আটা বান্ধিতে হয়। এই কার্য্য রাত্রে সম্পন্ন করিতে পারিলেই ভাল হয়; তাহাতে তামাকের আটা ভাঙ্গিয়া যায় না। অথবা প্রাতে (রৌদ্রের উত্তাপ বেশি হইবার পূর্ব্বে) এই কার্য্য করিতে হয়। এইরূপে আটা বান্ধিয়া ঘরের মধ্যে এক মাচার উপর গোলাকার করিয়া সমুদয় তামাকের বোঁটা বাহিরের দিকে এবং পাতা মধ্যে রাখিয়া সাজাইতে হয়। এই ভাবে দশ বার দিন থাকিলে পুনরায় বাহির করিয়া অল্প পরিমাণ খড় বন দ্বারা জড়াইয়া পাতলা চট অথবা ছালার দ্বারা পেঁচাইয়া বান্ধিয়া রাখিতে হয়। প্রতি মাসেই এক একবার স্থানান্তরিত করিতে হয়; তাহা হইলে তামাক উত্তম হয়।

তামাক প্রায় ন্যূনাধিকরূপে সকল দেশেই জন্মে। রঙ্গপুর, দিনাজপুর, কুচবেহারে অধিক, রেঙ্গুনে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল জন্মে। নদিয়ার হিঙ্গলি তামাকও নিকৃষ্ট নয়। স্থানীয় অবস্থা যতদূর দেখা গিয়াছে তাহাতে বোধ হয় আসাম বিভাগেও উত্তম তামাক জন্মিতে পারে; কিন্তু তামাকের সঙ্গে সঙ্গে নীলের চাষ থাকিলে বড় সুবিধা। আসামে নীলও ভাল জন্মিতে পারে।

আমেরিকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট তামাকের পরিচয় বোধ হয় অনেকে অবগত আছেন, পরীক্ষার দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, আমেরিকার

তামাকও এদেশে জন্মিতে পারে, তাহা নিতান্ত নিকৃষ্ট হয় না। দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশীয় লোকেরা কোন বিষয়েও পূর্ব্বাগত প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম আচরণ করিতে হইলেই নানারূপ আশঙ্কা মনে করিতে থাকেন, কাজেই আর কোন বিষয়েরই উন্নতি হয় না।

গোধূম।

গম—ভারতবর্ষের প্রাচীন কৃষি। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে ইহার চাষ আবাদ হইয়া আসিতেছে, তাহার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। অধুনা ভারতবর্ষ অপেক্ষা অন্যান্য দেশে ইহা অধিক এবং উত্তম জন্মিতেছে তাহারও পরিচয় বিদ্যমান। * ভারতবর্ষের মধ্যে নাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলে গমের চাষ আবাদ অধিক। পশ্চিম বাঙ্গলায় এবং হিন্দুস্থানেও একরূপ আছে; পূর্ব্ব বাঙ্গলায় ইহার চাষ আবাদ প্রায়ই দেখা যায় না। এপর্য্যন্ত আমরা এই কয়েক প্রকার গমের পরিচয় পাইয়াছি, জালালিয়া, কুষ্টিয়া, বঙ্গুলিয়া, পিসি, ডুবিয়া, গঙ্গাজলি, দেশি। প্রথমোক্ত চারি প্রকার নাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলে জন্মে, শেষোক্ত তিন প্রকারই পশ্চিম বাঙ্গলা প্রভৃতি স্থানে জন্মে। এতন্মধ্যে ডুবিয়াকে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বলিয়া সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

গম সাধারণতঃ প্রায় সকল স্থানেই জন্মিতে পারে। সাধারণ দোয়াশ মৃত্তিকা অপেক্ষা আঠালের ভাগ কিঞ্চিৎ অধিক থাকিলে ভাল জন্মে। যে মৃত্তিকা সর্ব্বদা অধিক পরিমাণে রসযুক্ত থাকে তাহাতে ভাল জন্মে না।

গমের জন্য গোবরই উত্তম সার। আশ্বিন কার্ত্তিক মাস হইতে ক্ষেত্রে ক্রমে চাষ মই এবং সার দিতে হয়, ক্ষেত্রের অবস্থানুসারে দশ বার খানা চাষের অধিক আবশ্যক হয় না। প্রতিবিঘায় অন্যূন ২৫ মণ গোবরের সার দিলেই হয়। † অগ্রহায়ন মাসের প্রথমার্দ্ধের

---

* ১৮৭৯ ইং র এপ্রেল মাসের ইণ্ডিয়ান এগ্রিকলচারিষ্ট নামক কৃষিবিষয়ক পত্রিকায় এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, যে, সমস্ত ইউরোপে প্রতি বিঘায় গড়ে ৬৸৹ গোধূম জন্মে। সমস্ত ভারতবর্ষে গড়ে ২৸৹ মাত্র গোধূম।

† বিলাতের কৃষি প্রণালীর সহিত আমাদের দেশের কৃষি প্রণালীর

মধ্যেই ক্ষেত্রে বীজ বুনিতে হয়। বীজ ভাল হইলে প্রতিবিঘায় ১৬ ষোল সেরের অধিক আবশ্যক করে না। বীজ বুনিবার পূর্ব্বে /২ সের পরিমাণ গরম জলের সহিত অনধিক এক ছটাক পরিমাণ তুতিয়া মিশাইয়া (জলে দিলেই মিশিয়া যাইবে) বীজ গুলি এক খানা চাটায়ের উপর ছড়াইয়া ঐ জল ছিটাইয়া দিতে হইবে কিন্তু জল অত্যন্ত উষ্ণ না থাকে। অধিক উষ্ণ থাকিলে বীজের অনিষ্ট হয়। জল ক্রমে দিবে আর ক্রমে বীজের সহিত রগড়াইয়া দিতে হইবে। * এই রূপে বীজ ভিজাইয়া অনধিক তিন ঘণ্টার মধ্যে বীজ ক্ষেত্রে বাইন করা আবশ্যক, অনেকক্ষণ থাকিলে বীজ নষ্ট হইবে। ক্ষেত্রে বীজ বুনিয়া ছোট রকম লাঙ্গল দ্বারা দুইবার অতি অল্প পরিমাণ মাটী উলট পালট হয় এরূপ ভাবে চাষ দিয়া একবার (কৃষি যন্ত্র অধ্যায়ের লিখিত) চিহ্নিত মই-য়ের দ্বারা মই দিয়া, পরে আদমণ সাজিমাটীর সহিত একমণ খইল চূর্ণ করিয়া তাহার সমপরিমাণ ছাইয়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্ষেত্রের উপর ছড়াইয়া দিয়া আর একবার মই দিতে হইবে, তখন মইয়ের পরি-বর্ত্তে এক খানা তক্তা দিয়া মইয়ের কার্য্য করা উচিত। তাহাতে মাটী সমান হইবে এবং ক্ষেত্রের মাটী কতক চাপিয়া যাইবে। † আমাদের দেশে যে পরিমাণে স্বভাবত বৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহাতে আর ক্ষেত্রে জল দিবার আবশ্যক হয় না। একেবারে অনাবৃষ্টি হইলে দুইবার অল্প পরিমাণ জল দিতে হয়, (গাছ উঠিলে একবার, এবং ফল প্রসব করিবার পূর্ব্বে আর একবার) গমের ক্ষেত্র নিড়ানি নিতান্ত আবশ্যক। এই ক্ষেত্রে আচড়া

বিভিন্নতা আছে, বিলাতে একজন সাহেব প্রতিবিঘায় ১০০। ১১৫ মণ গোবরের সার ব্যবহার করিয়া ১০॥ মণ গম উৎপন্ন করিয়াছেন। আমাদের দেশে ২৫। ৩০ মণ মাত্র ব্যবহার করিয়াও ১২ মণ গম জন্মিতে দেখা গিয়াছে। চিরপতিত স্থান কর্ষণ করা হইয়াছিল। ভারতের মৃত্তিকায় ও অধিক গুণ আছে।

* তুতিয়ার জল মাখিয়া দেওয়াতে ক্ষেত্রে পোকা ধরা নিবারণ হইবে।

† এই কার্য্য পেষণির দ্বারা সম্পাদিত হয়। ক্ষেত্রে গম বুনিয়া উপরিস্থ মৃত্তিকাকে একটু শক্ত করিয়া দিলে উপকার হয়।

ব্যবহৃত হইতে পারে, যেরূপেই হউক ক্ষেত্রের ঘাস জঙ্গল পরিষ্কার করা আবশ্যক। সাধারণতঃ কৃষকেরা ৬। ৭ মণের অধিক গম জন্মাইতে পারে না। এই প্রণালীতে গমের চাষ করিলে অন্যূন ৮ মণ হইবার অধিক সম্ভাবনা।

সরিষা।

ইহার জাতিবিশেষে কৃষি প্রণালীর কিছু বিভিন্নতা আছে। সরিষার প্রথমত দুইটী প্রধান বিভিন্নতা, কোন জাতীয় মাঘমাসে পাকে, কোন জাতি চৈত্রমাসে পাকে, এজন্য মাঘি এবং চৈত্রা এই দুই নামে খ্যাত। ইহার মধ্যেও আবার জাতিবিভেদ আছে: যথা রাই অথবা লাই, খেতি, কাজলি। কাজলি আবার দুই জাতি, দেশি এবং ঝুনি। সকল প্রকার সরিষার জন্যই, পলি মাটীবিশিষ্ট ক্ষেত্র সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। সরিষা সকল প্রদেশেই ন্যূনাধিকরূপে জন্মে। সর্ব্বাপেক্ষা আসাম প্রদেশে পার্ব্বতীয় নদ নদী ঝর্ণা ইত্যাদির তীরস্থ ক্ষেত্র সমূহে অধিক জন্মে। বৃষ্টি অধিক হইলে পর্ব্বত হইতে জল ছুটিয়া তীরস্থ ক্ষেত্রে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পলি পড়ে, তাহাতেই অধিক সরিষা জন্মে। অথবা অন্যান্য প্রদেশস্থ যে সকল স্থান বর্ষার জলে ডুবিয়া যায়, সেই সকল ক্ষেত্রে পললময় ক্ষেত্রে সরিষার কৃষি করিতে আর কোন প্রকার সারের প্রয়োজন হয় না, অথবা ইহাতে চাষ দিতে হয় না। ক্ষেত্রের মৃত্তিকা কোমল এবং রসাল থাকিতে মাত্র সরিষা বাইন করিয়া (ছড়াইয়া) দিলেই উত্তম সরিষা হয়। লাই সরিষা এইরূপ পললময় মৃত্তিকায় ভিন্ন হয় না, এইরূপ অকর্ষিত অবস্থায় বাইন করা হয় বলিয়া স্থান বিশেষে ইহাকে আছড়া ও বলে। লাই সরিষার একটী গাছ ২॥ হাত ৩ হাত পরিমাণ লম্বা হয় এবং গাছের অনেক শাখা প্রশাখা হইয়া থাকে।* কিন্তু বীজ সকল অপেক্ষাকৃত ছোট এবং এই জাতীয় সরিষার তৈল কম হয়।

---

* ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ধানের নাড়া (গোড়া) ক্ষেত্রে থাকিতেই এই সরিষা বাইন করে। কেহ খাঁসারির আর সরিষা একত্রে বাইন

এতদ্ভিন্ন সকল জাতীয় সরিষাই সাধারণত দোয়াশ মৃত্তিকায় জন্মে। তন্মধ্যে ঝুনির ক্ষেত্র আঠালের ভাগ অধিক থাকিলে ভাল হয় এবং ক্ষেত্রে বালির ভাগ কিঞ্চিৎ অধিক থাকিলে দেশী সরিষা ভাল হয়। এইরূপ ক্ষেত্র অনুসারে বীজ নির্ণয় অথবা বীজ অনুসারে ক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হয়। শ্বেতির বীজ সকল একেবারে শ্বেতবর্ণ বলিয়াই ইহার নাম শ্বেতি। কাজলি অপেক্ষা শ্বেতির গাছ বড় হয়। কাজলি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিলম্বে পাকে, এবং তৈল কিছু অধিক হয়, তৈলে ঝাঁজও বেসি।

আশ্বিন মাসের শেষার্দ্ধ হইতেই সরিষার ক্ষেত্র চাষ আরম্ভ করিতে হয়। আমাদের দেশে সরিষা ক্ষেত্রে গোবর ভিন্ন অন্য সারের বড় আবশ্যক করে না। প্রতিবিঘায় অনধিক ৩০ মণ গোবরের সার দিলেই হইতে পারে। ক্ষেত্রে মৃত্তিকা আঠাল হইলে ৩।৪ মণ ছাই দেওয়া আবশ্যক হয়। কার্ত্তিক মাসের মধ্যে সরিষা বাইন করাই কর্ত্তব্য, ক্ষেত্রের রসাধিক্য অনুসারে তাহারই মধ্যে অগ্র পশ্চাৎ করিতে হয় অর্থাৎ ক্ষেত্রের রস টানিয়া গেলে আর সরিষা বাইন করার সময় থাকে না। সরিষার ক্ষেত্রে আট দশ খানা চাষের অধিক লাগে না। অধিক গভীর খনন করা আবশ্যক হয় না। কেবল মৃত্তিকা ধূলিবৎ অত্যন্ত চূর্ণ করিতে হয় এবং ঘাস জঙ্গলাদি বাছিয়া পরিস্কার করিয়া ফেলিয়া দিতে হয়।

ক্ষেত্রের সরসতানুসারে প্রতিবিঘায় অন্যূন /১ সের অনধিক /১॥ সের বীজ লাগে। ক্ষেত্রে বীজ বুনিবার অনধিক ৩ঘণ্টা পূর্ব্বে একটা পাত্রে রাখিয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণ অল্পোষ্ণ জল ছিটাইয়া দিতে হয়, আর হস্ত দ্বারা নাড়িতে হয়, যাহাতে সমুদয় সরিষাতেই জল লাগিতে পারে। অতি অল্প পরিমাণ মাটি ধরাইয়া চাষ দিবে তাহাতে বীজ সকল মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। পূর্ব্বদিন শিশিরে ভিজিয়া ফোলে, পরে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করাতে সত্বর অঙ্কুরিত হয় এবং পক্ষি ইত্যাদিতেও খাইতে পারে না। এইরূপ করাতে বীজ সকালে অঙ্কুরিত হয়। পূর্ব্ব দিন অপরাহ্নে ক্ষেত্রে বাইন করিয়া পরদিন প্রাতে ক্ষেত্রে

করে*; তাহাতে একটা উপকার হয়, ক্ষেত্রস্থ মৃত্তিকার রস টানিতে পারে না। কৃষকের পক্ষে এইরূপ কৃষি অতি সুবিধার এবং লভ্য-জনক।

২খানা চাষ দিতে হয়। সরিষা অত্যন্ত ঘন হইলে ফসল কম হয়। মধ্যে মধ্যে সরিষা ক্ষেত্রেও পোকা লাগিয়া থাকে। বীজ বাইন করিবার সময় যে গরম জলের ছিটা দিতে হয় তাহাতে অল্প পরিমাণ হিরাকষ মিশাইয়া দিলে আর পোকা লাগে না।

সরিষাক্ষেত্রে দুইবার জল সেচিলেই যথেষ্ট হয়। যে বৎসর পৌষ মাঘ মাসে বৃষ্টি হয় সে বৎসর সরিষা ক্ষেত্রে জল দিবার আবশ্যক হয় না। ফল প্রসবিত হওয়ার প্রাক্কালে পূর্ব্বে-একবার এবং ফল প্রসব হইয়া দৃঢ় হইবার পূর্ব্বে একবার জল সেচিতে হয়, এইরূপে জল না সেচিলে ছড়াও বড় হয় না এবং ফলও পুষ্ট হয় না। সরিষা পরিপক্ক অবস্থায় পূর্ব্বে কাটিলে শুকাইয়া চিমড়া লাগিয়া ছোট হইয়া যায়। অথচ ছড়া সকল পাকিয়া শুকাইলেও ফুটিয়া পড়িয়া যায়। এই অবস্থা বিবেচনা করিয়া কাটা উচিত। সরিষা কাটিয়া বাড়ীতে আনিয়া ২দিন প্রথমত বিস্তীর্ণ ভাবে ছড়িয়া রাখিতে হয়, পরে সমুদয় ফল গুলি একদিক এবং গোড়া সকল বাহিরে রাখিয়া গোলাকার করিয়া পালা দিতে হয় (ইহাকে সরিষা জাঁক দেওয়া বলে)। চারি পাঁচ দিন এই ভাবে রাখিয়া পুনরায় বিস্তীর্ণ ভাবে ছড়িয়া দিতে হয়। তারপর বাঁশের চিকণ কঞ্চী দুইতিন খানা একত্রে লইয়া তাহার দ্বারা বাড়ি দিলেই সরিষা সকল পড়িয়া যাইতে থাকে। তখন গাছ সকল পৃথক করিতে হয়। এই সরিষা গাছের ভস্ম প্রায় সমস্ত কৃষি ক্ষেত্রের পক্ষে বিশেষ উপকারী। সাধারণতঃ প্রতিবিঘায় ৮।৯ মণ সরিষা জন্মিয়া থাকে, পললময় মৃত্তিকায় যে বাইন করা হয়, তাহা এতদপেক্ষা অধিক হয়। তাহাতে প্রতিবিঘায় ১০।১২ মণ সরিষা জন্মে, কিন্তু সকল স্থানে তদ্রূপ ক্ষেত্র পাওয়ার সুবিধা নাই।

তিসী।

যত প্রকার কৃষি আছে তন্মধ্যে তিসী আর খেসারী যেমন অযত্নে এবং অনউর্ব্বরা ক্ষেত্রে জন্মে আর কোন কৃষি তদনুরূপ জন্মে না। তিসী প্রধানতঃ সকল মৃত্তিকায় জন্মে। অপেক্ষাকৃত একটু বালির ভাগ

অধিক থাকিলে ভাল হয়। যে ক্ষেত্রে অন্য কৃষি ভাল না হয়, এবং কৃষকদিগের অধিক চাষাদি দিবার সময় না পায় তখন সেই ক্ষেত্রে তিসী বাইন করে। সাধারণতঃ তিসী ক্ষেত্রে তিনচারি চাষের অধিক দেওয়ার রীতি প্রায় নাই। এ পর্য্যন্ত কোন কৃষককে তিসীর ক্ষেত্রে সার ব্যবহার করিতে দেখি নাই। যেরূপ অযত্নে তিসীর চাষ হইয়া থাকে, তদপেক্ষা কিছু যত্ন করিলে যে ভাল হইতে পারে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু তিসীর ক্ষেত্রে অধিক সার দিলে ফসল কম হয়।

তিসী দুই রকমে ব্যবহার হয়। একরকম—তৈলের জন্য তিসীর বীজ ব্যবহৃত হয়। অপর রকম—পাট এবং শণের ন্যায় তিসীর গাছের ছালের আঁশ ব্যবহৃত হয়। শণ এবং পাট অপেক্ষা তিসীর আঁশের মূল্য অধিক। ইহার আঁশ অতি সূক্ষ্ম এবং শক্ত; দেখিতে ঈষৎ পীতাভ হইয়া থাকে। আমাদের দেশের সাধারণ কৃষকেরা তিসীর আঁশের আবশ্যকতা এবং ব্যবহার জানে না, তিসীর চাষ করিলে, তাহার বীজ অপেক্ষা আঁশেতে অধিক লাভ হয়।

যাঁহারা বীজের জন্য তিসীর চাষ করেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রতিবিঘায় ২৫।৩০ মণ গোবর দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু যাঁহারা আঁশের জন্য তিসীর চাষ করেন, তাঁহাদের পক্ষে তদপেক্ষা আরও অধিক সার দেওয়া আবশ্যক। কারণ তাহাতে গাছের বর্দ্ধন অধিক আবশ্যক। ক্ষেত্রে সার অধিক থাকিলে গাছ সকল অধিক বর্দ্ধিত হইতে পারে। বীজের জন্য হইলে সাত আট বার চাষ দিলেই প্রচুর হয়। কিন্তু আঁশের জন্য আট দশ বার চাষের আবশ্যক হয় এবং বীজও অপেক্ষাকৃত অধিক বুনিতে হয়। বীজের জন্য পাতলা বুনিবার কারণ এই যে, তাহাতে ডাল পালা মেলিয়া গাছে ফল অধিক হয়। আঁশের জন্য গাছ ঘন থাকিলে লম্বা হইতে থাকে আর ডাল পালা মেলিতে পারে না। সাধারণতঃ প্রতিবিঘায় /১ সের /১। সের বীজ লাগে। কিন্তু যাঁহারা গাছের জন্য তিসীর চাষ করেন, তাঁহাদিগকে /১৷৷ কি /১৸ পোওয়া বাইন করিতে হয়। তিসী পূর্ব্ব দিন অল্পোষ্ণ জলের ছিটা দিয়া একখানা চাটাই কি অন্য কিছুর উপর ছড়াইয়া ছায়াতে রাখিয়া দিতে হয়; পর

দিন অপরাহ্ণে ক্ষেত্রে বাইন করিয়া সকালে (সরিষা-ক্ষেত্রের ন্যায়) দুই খান চাষ দিতে হয়।

গাছ সকল একটু বড় হইলে দুই তিন বার জল সেচিতে হয়। সাধারণতঃ আমাদের দেশে যেরূপ বৃষ্টি হইয়া থাকে, তদ্রূপ বৃষ্টি হইলে আর জল সেচিবার অধিক আবশ্যক হয় না। তিসী গাছের জন্য যাঁহারা চাষ করেন তাঁহাদিগকে ক্ষেত্রে একবার নিড়ানিও দেওয়া আবশ্যক; নচেৎ ঘাসজঙ্গলাদি থাকিলে গাছ সকল অধিক বৃদ্ধি পাইতে পারে না।

বীজের জন্য হইলে ফল সকল উত্তমরূপ পরিপক্ক হইলে কাটিতে হয়। তিল সরিষা ইত্যাদি অপেক্ষা তিসীর গাছ হইতে বীজ পৃথক করিয়া লওয়া অধিক কষ্ট; কারণ বীজের উপরের আবরণ অপেক্ষাকৃত শক্ত। তিসী কাটিয়া আনিয়া গাছ সকল অত্যন্ত শুষ্ক করিতে হয়। যাহাদের অধিক চাষ থাকে তাহারা ধানের ন্যায় গরু দিয়া মাড়িয়া লয়। কিন্তু যত পরিমাণ ধান মাড়িতে যতক্ষণ সময় লাগে, তাহার তিনগুণ সময় না হইলে তিসী মাড়িয়া লওয়া যায় না। যাহাদের অল্প চাষ থাকে তাহারা এক খানা কাঠের উপর কতক পরিমাণ তিসী রাখিয়া ছোট রকম একটী মুগুর দ্বারা বাড়ি দিয়া লয়। প্রতিবিঘায় ৬। ৭ মণের অধিক তিসী ফলান যায় নাই।

কিন্তু যাহারা আঁশের জন্য তিসীর চাষ করে, তাহাদিগকে গাছে ফুল হইলেই গাছ সকল কাটিয়া লইতে হয়। নচেৎ গাছ অত্যন্ত পাকিলে আঁশ ভাল হয় না ও পরিষ্কার করা যায় না এবং আঁশ মোটা হইয়া যায় এবং একেবারে অপরিপক্ক গাছ কাটিলেও আঁশ নরম হইয়া যায়। সাধারণতঃ আমাদের দেশে পাট এবং শণ যে ভাবে জলে পচাইয়া লইয়া থাকে সে ভাবেও লওয়া যায়। পাট এবং শণ অপেক্ষা তিসীর গাছ অল্পদিনে পচে। কিন্তু এরূপ নিয়মে লইলে উত্তম হয় না। আঁশ নরম হইয়া যায় এবং বদরং হয়। এতদ্ভিন্ন উত্তম প্রণালীতে ইহা লইবার উপায় আছে।

ছোট রকম একটী কাঠের চৌবাচ্চা, অথবা যে সকল বাক্সে কাপড় আসে তাহার একটী বাক্স কিন্তু জল পড়িয়া না যায় এইরূপ একটা বাক্সে

অগত্যা বড় গামলায় গরম জল ভরিয়া তাহার সহিত কতক পরিমাণ সাজিমাটি মিশাইয়া ঐ গরম অবস্থায়ই তিসীর গাছ সকল ছোট ছোট মোঠা বান্ধিয়া জলে ফেলিতে হয়। উপরটা ঢাকিয়া রাখিতে হয়। এইরূপে রাখিলে অনধিক ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গাছ পচিয়া যায় এবং তাহা হইতে আঁশ সকল বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে, এবং অতি উত্তম পরিষ্কার হয়। জলের উষ্ণতায় গাছ গুলি সত্বর জীর্ণ করিয়া দেয় এবং সাজিমাটি থাকাতে উত্তম পরিষ্কৃত হয়। তিসীর বীজ ছাড়াইয়া লওয়াতে যেরূপ পরিশ্রম, ইহাতে তদপেক্ষা অধিক পরিশ্রম হয় বলিয়া আমরা বোধ করি না।

এক বিঘা ক্ষেত্রে অন্যূন ২/ মণ আঁশ-লওয়া যাইতে পারে। ইহার প্রত্যেকমণ ১১। ১২ টাকার কমে বিক্রয় হয় না। ৬। ৭ মণ তিসী অনধিক বার চৌদ্দ টাকা বিক্রয় হইতে পারে। ইহার দুই মণ ২২ টাকা ২৪ টাকা বিক্রয় হইয়া থাকে। তবু আমাদের দেশীয় কৃষকেরা ইহা করে না।

মুগ, মাষকলাই, ঠিকরী, দেশী মটর ও খেসারী ইত্যাদি।

যে সকল ক্ষেত্রের মৃত্তিকায় অপেক্ষাকৃত আঁটালের ভাগ অধিক থাকে এবং বর্ষার জলের সহিত পলি পড়ে তাহা মটরের জন্য সমধিক উপযোগী। একখানি উত্তম ক্ষেত্রে বিনা চাষে বিনা সারে যে পরিমাণ শস্য জন্মে অন্যবিধ ক্ষেত্রে সমধিক চাষ দিয়া সার দিয়াও সে পরিমাণ শস্য জন্মান কষ্ট; তাহাতে কৃষকের লাভ থাকে না। এই জন্যই সকল স্থানে ইহার চাষ আবাদ দেখা যায় না।

ক্ষেত্রের ধান কাটিয়া অথবা ধান সুপক্ক হইবার পূর্ব্বেই যদি দেখা যায় যে মৃত্তিকার কোমলতা এবং সরসতা অধিক দিন থাকিবে না, তবে ক্ষেত্রে ধান থাকিতেও মটর বাইন করিয়া থাকে; ক্ষেত্রে নাড়া থাকায় অধিক উপকার হয়। কার্ত্তিক মাস ইহার বাইন করিবার উপযুক্ত

সময়। ক্ষেত্রের গুণানুসারে কেহ বা আশ্বিন মাসের শেষ ভাগেও করে; কেহ বা অগ্রহায়ণের প্রথম ভাগেও করিয়া থাকে। যাহাদের মটর চাষের উপযোগী ক্ষেত্রের কোমলতা এবং সরসতা পূর্ব্বেই যায় তাহারা সেই সকল ক্ষেত্র চাষ দিয়া বাইন করে। ছয় সাত খানা চাষ দেওয়া আবশ্যক হয়, ক্ষেত্রের রস একেবারে টানিয়া গেলে তাহাতে মটর জন্মে না।

প্রতিবিঘায় ৬।৭ সের মটর বাইন্ করিতে হয়। ক্ষেত্রে বীজ বুনিবার দুই দিন পূর্ব্বে জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। একদিন ভিজিলে পর দিন জল ছাকিয়া কোন একটা পাত্রে ছড়াইয়া রাখিতে হয়। শেষ অপরাহ্ণে ক্ষেত্রে বুনিতে হয়। ক্ষেত্রে বুনিবার পূর্ব্বেই বীজ সকল অঙ্কুরিত হয়। তামাকের জলে মটর ভিজাইয়া বাইন করিলে তাহাতে পোকা লাগে না। গাছ সকল বড় হইলে তাহার আগা ভাঙ্গিয়া দিতে হয়. অনেক কৃষক ইহার আগা কাটিয়া শাক বিক্রয় করে। স্থানবিশেষে প্রতিবিঘায় ৬।৭ টাকার শাক বিক্রয় হইয়া থাকে, কিন্তু যে ভাবে তাহারা আগা কাটিয়া নেয় তাহাতে আর শস্য হইবার আশা থাকে না, মাত্র আগাটা ভাঙ্গিয়া নিলে ক্ষতি হয় না বরং উপকার হয়—শাখা প্রশাখা বাড়ে।

ফল পাকিবার সময় বৃষ্টি হইলে শস্য সকল কালা হইয়া যায় এবং সুসিদ্ধ এবং সুস্বাদ হয় না। মেঘাড়ম্বর করিয়া থাকিলে পোকা ধরে।

মটর পাকিলে গাছ সহিত তুলিয়া আনিয়া রৌদ্রে দিতে হয়। অধিক হইলে গোরুর দ্বারা ও মাড়িয়া লওয়া যায় কিম্বা লাঠি দিয়া বাড়িয়াইয়াও নেওয়া যায়।

খেসারীরও ঠিক এই নিয়ম। মটর অপেক্ষা খেসারী অনুর্ব্বরা ক্ষেত্রেও জন্মে এবং অল্প চাষেও জন্মে। অন্যান্য ঘাসজঙ্গলাদি যেমন অকর্ষিত স্থানে বিনাযত্নে জন্মে খেসারীও প্রায় সেইরূপ। অধিকাংশ কৃষকেরা প্রায় গরুর ঘাসের জন্যই খেসারী বাইন করে। *

মুগ, মাষকলাই, ঠিকরী ইহা অধিকাংশ স্থলে এইরূপ বাইন করা হইয়া থাকে। ডাল মটর খেসারী যেরূপ মৃত্তিকায় হয়, এ সকলের জন্য

* মটর এবং খেসারী উভয়েই গরুর পক্ষে অধিক পুষ্টিকর।

অবপেক্ষা হালকা মাটির ক্ষেত্র এবং অপেক্ষাকৃত বালির ভাগ অধিক থাকে, তাহাই উপযোগী। ইহা চরভূমিতে ভাল জন্মে।

মুগ তিন জাতি। সোণামুগ, হাড়িমুগ, ঘাসিমুগ। সোণামুগ দেখিতে পরিস্কার, আকৃতি ছোট; ঘাসিমুগের বর্ণ ঘাসের মত এবং আকৃতি সোণামুগ অপেক্ষা বড়; হাড়িমুগের বর্ণ কিছু কাল, এবং আকৃতি সর্ব্বাপেক্ষা বড়। সকলপ্রকার মুগের মধ্যে সোণামুগ অধিক সুস্বাদু। মুগ প্রায় বারমাসই জন্মে এবং অনধিক তিন মাসের মধ্যেই ফল পাকিয়া যায়। ক্ষেত্রে এক কৃষি ফলানের পর অন্য কৃষি ফলাইবার পূর্ব্বে যে অবকাশ থাকে ইহার মধ্যে কৃষকের একবার মুগ বাইন করিয়া লয়। টান ভূমি ভিন্ন তাহা হয় না।

যে কএকটী কৃষির বিষয় উল্লেখ করা গেল তাহা এইরূপ উপযোগী ক্ষেত্রে বাইন করিয়া শস্য উৎপাদন করা যত সুবিধা এবং লাভ, অনুপযোগী ক্ষেত্রে অধিক সার দিয়া অধিক যত্ন পরিশ্রম করিয়াও তদপেক্ষা অধিক শস্য জন্মান যায় না, কাজেই কৃষকের লাভ থাকে না। এইরূপ অধিক সুবিধায় জন্মে বলিয়াই মটর খেসারীর মূল্য এত কম। মনে কর এক জন কৃষক বিনা যত্নে বিনা পরিশ্রমে যে শস্য জন্মাইল, প্রতিবিঘায় অন্যূন ৫৲ টাকা ব্যয় করিয়াও আমাকে সেই পরিমাণ জন্মাইতে হইল; অন্য কৃষকও যে দরে বিক্রয় করে আমাকেও সেই দরে বিক্রয় করিতে হয়। কাজেই ইহা ব্যবসায়ির পক্ষে সুবিধা মনে করি না। তবে স্থানীয় কৃষির উন্নতির জন্য যাঁহারা করেন সে পৃথক কথা। বোধ হয় কোন প্রদেশেই ন্যূনাধিকরূপে তদ্রূপ ক্ষেত্র একেবারে না পাইবারও সম্ভাবনা। মটর খেসারী পূর্ব্ববাঙ্গলার যে যে স্থানে জন্মে তন্মধ্যে ফরিদপুরে অধিক এবং উত্তম মুগ মাষকলাই মাণিকগঞ্জ বিভাগে অধিক এবং উত্তম জন্মে।

মসুর।

সমপরিমাণের দোয়াশ মাটি না হইয়া আটালের ভাগ কিঞ্চিৎ বেশী থাকিলে ভাল হয়। যে ক্ষেত্রের মৃত্তিকা সিক্ত অথবা অধিক রসযুক্ত

থাকে, তাহাতে মসুর ভাল হয় না; প্রত্যুত পোকা লাগে। আশ্বিন মাস হইতে ক্ষেত্রে চাষ দিতে হয়। ৮। ১০ খানা চাষ দেওয়া আবশ্যক হয়। কার্ত্তিক মাসে ক্ষেত্রে বীজ বাইন করিতে হয়। প্রতিবিঘায় অন্যূন ২৫।৩০ মণ গোবর এবং অন্যূন ১৷৷০ মণ খইলের তরল সার ক্ষেত্রে দেওয়া আবশ্যক। প্রতিবিঘায় /৪ সের /৫ সের মসুর বুনিতে হয়। বীজের তিনগুণ পরিমাণ ঘুটিয়ার ছাই বীজের সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্ষেত্রে বুনিতে হয় তাহাতে পোকা ধরে না। বীজ বুনিয়া ক্ষেত্রে দুইবার চাষ দিতে হয়। বৃষ্টি না হইলে অন্যূন দুইবার ক্ষেত্রে জল সেচিতে হয়। ফাল্গুন মাসের শেষ তক মসুর পাকিতে থাকে। একবারে ইহার গাছ সুদ্ধ তুলিয়া আনিতে হয়, শেষ ফল ইত্যাদি মাড়িবার প্রণালী অনুসারে মাড়িতে হয়। মসুর সাধারণতঃ সকল স্থানেই জন্মিতে পারে কিন্তু সকল স্থানে ইহার চাষ আবাদ দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্ব বাঙ্গলার মধ্যে বাখরগঞ্জে উত্তম মসুর জন্মে। ইহার প্রতিবিঘায় ২০ মণ পর্য্যন্ত ফলে।

ছোলা।

স্থান বিশেষে ইহাকে বুট অথবা চানা বলে। ইহার এক জাতি সাদা অন্য জাতি লাল। আবার উভয় জাতির মধ্যেই ছোট এবং বড় দুই জাতি আছে। ইহাদের সকলেরই কর্ষণ-প্রণালী একরূপ। আশ্বিন মাসের মধ্যে ক্ষেত্রে বীজ বপন করা উচিত। কারণ দক্ষিণা বাতাস আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ফসল কাটিবার উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক; নচেৎ ক্ষেত্রে ফসল কম হয়। নদীর চর ভূমিতে (যাহাতে পলি পড়ে) চাষ করিলে আর সার দিবার আবশ্যক হয় না। দোয়াঁশ মৃত্তিকার মধ্যেও যাহাতে বালির ভাগ অধিক থাকে, তাহাতে ছোলা ভাল জন্মে। অন্যূন ৩০। ৪০ মণ গোবরের সার এবং ২ মণ পরিমাণ খইলের তরল সার ক্ষেত্রে দিতে হয়। ৮। ১০ খানা চাষ দিতে হয়। প্রতিবিঘায় চারি পাঁচ সের বীজ বুনিতে হয়। গম ইত্যাদির ন্যায়

গরম জলের সহিত হিরাকস মিশ্রিত করিয়া বীজের উপর ছিটা দিয়া পর দিবস ক্ষেত্রে বাইন করিতে হয়। দুইবার ক্ষেত্রে জল সেচিতে হয়। বৃষ্টি হইলে জল সেচিবার আবশ্যক হয় না। ছোলার গাছ ক্রমে বড় হইতে থাকে আর তাহার ডগা সকল ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ ভাঙ্গিতে হয়। তাহাতে গাছের শাখা প্রশাখা বৃদ্ধি হইয়া ফসল অধিক হয় এবং এই জন্য অপেক্ষাকৃত পাতলা বাইন করা উচিত। ছোলার ডগা সকল শাকরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাতেও স্থান বিশেষে কৃষকের লাভ কম নয়। প্রতিবিঘায় ১২ মণ ১৩ মণ ছোলা জন্মে। পূর্ব্ববাঙ্গলায় ইহার চাষ কম।

শণ।

অপ্রকৃত মৃত্তিকাবিশিষ্ট ক্ষেত্রে অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে উদ্ভিদাদির গলিত সার থাকে অথবা যে ক্ষেত্রে পলি পড়ে তদ্রূপ ক্ষেত্রই শণ চাষের উপযোগী। তদ্রূপ ক্ষেত্রে সার দিবার আবশ্যক হয় না। তদ্রূপ ক্ষেত্র না হইলে অল্প পরিমাণ গোবর আর ছাই দিতে হয়। শণের ক্ষেত্র অত্যন্ত উর্ব্বরা হইলে গাছ মোটা হইয়া যায় এবং শাখা প্রশাখা হয়, তাহাতে শণ ভাল হয় না এবং অত্যন্ত দুর্ব্বল ক্ষেত্র হইলেও গাছ সকল নিস্তেজ হইয়া পড়ে। ক্ষেত্রের উপরের মাটি শুষ্ক (কিন্তু ধূলিবৎ বালি না হয়) এবং অত্যল্প নীচে রসাল থাকিলে তাহাতে শণের চাষ ভাল হয়। শণক্ষেত্রে ১৪।১৫ খানা চাষের কমে হয় না এবং ঘাসজঙ্গলাদি পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হয়।

একবার একবীজ হইতে গাছ জন্মাইয়া পুনরায় তাহা হইতে বীজ লইয়া গাছ জন্মান এইরূপ ক্রমে এক বীজ হইতে গাছ উৎপাদন করিলে তাহাতে গাছ ভাল হয় না। যে গাছ হইতে শণ লইতে হইবে তাহা ঘন করিয়া বাইন করিতে হয়, নচেৎ গাছ অধিক লম্বা না হইয়া ডাল পালা অধিক হইয়া খারাপ হইয়া যায়। যে গাছ হইতে বীজ লইতে হয় তাহা পাতলা করিয়া বাইন করিতে হয়। পাতলা বাইন করিলে

বীজ অধিক হয়; শণের প্রত্যেক গাছে সমান সংখ্যক সূতা থাকে।* গাছ মোটা হইলে সূতাও মোটা হয়। গাছ সরু হইলে সূতা সূক্ষ্ম হয়। এই জাতীয় গাছ যাহাতে অধিক মোটা না হইয়া লম্বায় বাড়ে কৃষকের পক্ষে সেইরূপ যত্ন করা উচিত। শণের ক্ষেত্রে নিড়ানী দেওয়া আবশ্যক হয়। গাছ ঘন থাকায় নিড়ানী দেওয়া কষ্ট এ জন্য বীজ বুনিবার পূর্ব্বে ভালরূপ পরিস্কার করিলে নিড়ানীর বড় আবশ্যক হয় না। তবে দুর্ব্বল মরা গাছ সকল বাছিয়া ফেলিতে হয়; তাহাতেও দুই এক বার নিড়ানী দেওয়া আবশ্যক। গোড়ার মাটি আল্‌গা না হইলে গাছ বাড়ে না। যে সকল ক্ষেত্রের গাছ অধিক লম্বা হয় তাহার মধ্যে মধ্যে বাঁশ পুঁতিয়া লম্বা করিয়া বাঁশের চটা বান্ধিয়া দিতে হয়, নচেৎ বাতাসে বৃষ্টিতে গাছ পড়িয়া গিয়া নষ্ট হয়।

শণের গাছ অত্যন্ত পরিপক্ক হইবার পূর্ব্বেই তুলিতে হয়। যে সময় গাছের গোড়া জরদা বর্ণ হয় এবং গাছের পাতা সকল ঝড়িয়া পড়িতে আরম্ভ করে, সেই সময় গাছ শিকড় সহিত তুলিয়া আনিতে হয়। বীজ রাখিবার জন্য হইলে বীজ উত্তমরূপ পাকিলে গাছ তোলা উচিত। যে গাছ হইতে বীজ লওয়া যায় তাহার সূতা ভাল হয় না।

শণও পাটের ন্যায় জলে ফেলিয়া পচাইতে হয়। বদ্ধ জলে পচাইলে অনধিক ১০ দিনের মধ্যে শণ পচে। উত্তমরূপ পচিলে কাঠের ছোট বৈঠার দ্বারা জলের উপর এক এক মোট রাখিয়া বাড়ি দিতে হয়। ক্রমে ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে কাঠি সকল বাহির হইয়া সূতা আল্‌গা হইয়া যায় এবং পরিস্কৃত হয়। শণ লওয়া সম্বন্ধে বিলাতের কৃষকেরা আরও নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। গরম জলে নরম সাবান মিশ্রিত করিয়া তন্মধ্যে শণ ভিজাইলে, তিন চারি ঘণ্টার মধ্যে শণ পচে এবং উত্তম পরিস্কৃত হয়। আমাদের দেশে প্রতিবিঘায় ৭ সাত মণ আট মণ জন্মিতে পারে।

---

* পাট, এবং তিসীতেও ঐরূপ সমান সংখ্যক সূতা।

বার্ত্তাকু।

বেগুন বার মাস ফলে, স্থান বিশেষে সময় ভেদে ইহার চাষ হইয়া থাকে। কিন্তু সময়ের বিভিন্নতা থাকিলেও শ্রাবণ মাসে ইহার চারা করিয়া ভাদ্রমাসে ক্ষেত্রে রোপণ করা আমরা প্রশস্ত মনে করি; কারণ শীত ঋতুর প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্তই বেগুন সুস্বাদু থাকে।

শ্রাবণ মাসে বেগুনের চারা সহজে জন্মান যায় না, বৃষ্টির আধিক্য হেতু বীজ পচিয়া যায় এবং পিপড়ায় খাইয়া ফেলে। এজন্য এক কি দেড় হাত উচ্চ করিয়া মাচা করিয়া তাহার উপরে মাটি উত্তম চূর্ণ করিয়া কতক গোবরের সার মিশ্রিত করিয়া নিতে হয়, তদুপরি বীজ ছড়াইয়া এক হাত পরিমাণ উচ্চ করিয়া একখানি ছায়েলা দিতে হয়। তাহাতে রৌদ্র বৃষ্টি উভয়েরই আধিক্য নিবারণ হয় এবং পিপড়ায় ও নষ্ট করিতে পারে না। কাঁচা হরিদ্রা রসে বেগুনের বীজ ভিজাইয়া বপন করিলে পোকা ধরে না, চারা সকল চারি ছয় অঙ্গুলি লম্বা হইলে ক্ষেত্রে রোপণ করিবার উপযুক্ত হয়।

ক্ষেত্রে দশ বারখানা চাষ দিতে হয় এবং ঘাসজঙ্গল উত্তমরূপে পরিষ্কৃত করিতে হয়। ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে এবং মধ্যে ছোট রকম নালা করিতে হয়; যেন অধিক বৃষ্টি হইলে জল সরিয়া যাইতে পারে। ১॥ হাত অন্তর সারি করিয়া একহাত ব্যবধান চারা পুঁতিবার জন্য প্রথমত এক একটি গাথা করিয়া যাইতে হয়। ঐ সকল গাথা পুরাতন গোবরের সার (প্রতি গাথায় অর্দ্ধসের পরিমাণ সার) মাটির সহিত মিশ্রিত করিয়া গাথা পূর্ণ করিতে হয় এবং অল্প পরিমাণ খইলের তরল সার * দিয়া চারা পুঁতিতে হয়। চারা পুঁতিবার সময় প্রত্যেক চারার শিকড়ের অগ্রভাগ কাঁইচি দ্বারা কাটিয়া দিতে হয়, তাহাতে গাছ সত্বর ফলবান হইতে দেখা গিয়াছে। চারা তুলিয়া খইলের তরল সারের মধ্যে গোড়া গুলি ভিজা-

---

* বেগুন ক্ষেত্রে উত্তম পরিপক্ক সার না দিলে গাছ পোকা ধরে। সমুদয় ক্ষেত্রে সার দেওয়া অপেক্ষা এই ভাবে সার দিলে উপকারও অধিক হয় এবং অল্প সার দিয়া পারা যায়। প্রতিবিঘায় ২০।২২ মণ গোবর ১/ মণ খইল হইলেই প্রচুর হয়।

ইয়া রোপণ করিতে হয়। চারা রোপণ করিয়া প্রথমত দুই তিন দিন অল্প অল্প জল দিতে হয়। শেষ দিন জল দিয়া মাটি ভিজা থাকিতেই সারির মধ্যের অন্য মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিবে। তাহাতে ঐ আর্দ্রতা অনেক দিন থাকিয়া যায়। চারা সকল ক্ষেত্রে লাগিয়া গেলেই, গোড়ার মাটি খুঁড়িয়া দিতে হয় এবং সারির মধ্যের মাটি তুলিয়া দিতে হয়। ৫ দিন ৭ দিন অন্তরই গোড়ার মাটি আলগা করিয়া অন্যমাটি গোড়ায় দিয়া দিতে হয়; মাটি খুঁড়িয়া দিলেই গাছ বৃদ্ধি হইতে থাকে, পুনঃ পুনঃ মাটি দেওয়াতে প্রত্যেক সারি গুলি একটি একটি আলির মতন উচ্চ হয় এবং মধ্যভাগ নালার মতন হয়। তাহাতে অধিক বৃষ্টি হইলে গাছের গোড়ায় জল বসিয়া অনিষ্ট করিতে পারে না।

এক রকম পোকা গাছের কোন এক স্থান ছিদ্র করিয়া প্রবেশ করে, এবং সমুদয় গাছের মধ্য একবারে শূন্য করিয়া ফেলে, অথচ তাহা চেনা যায় না। কিন্তু অধিক রৌদ্রের সময় সেই সকল গাছের আগা ঢলিয়া পড়ে। হলুদের গুঁড়া জলে মিশাইয়া, অথবা কারবলিক এসিড জলে মিশাইয়া গাছে ছিটা দিলে এই পোকা ধরা নিবারণ হয়।

গাছের বেগুন বড় করিবার ইচ্ছা থাকিলে গাছের অগ্রভাগ কাটিয়া দিতে হয়, এবং ফুল অধিক হইলে কি অনেকগুলি বেগুনের কুসি হইলে অনধিক চারি পাঁচটী মাত্র রাখিয়া অবশিষ্ট গুলি ছিঁড়িয়া দিতে হয়। গাছের গোড়ার মাটি কঠিন হইয়া না যায়, তৎপ্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হয়। তাহা নিবারণের জন্য সর্ব্বদা গোড়ার মাটি খুঁড়িয়া দিতে হয়, এবং মধ্যে মধ্যে জল সেচিয়া দিতে হয়।

আশ্বিন কার্ত্তিক মাস হইতে বেগুন ধরিতে আরম্ভ হইয়া চৈত্র বৈশাখ পর্য্যন্ত ধরে। কোন কোন কৃষক এই পুরাতন গাছেরই ডালপালা কাটিয়া দেয়, তাহা হইতে শ্রাবণ ভাদ্র মাসেই বেগুন ফলিতে থাকে। কিন্তু সে উত্তম ব্যবস্থা নহে এবং সে বেগুন সুস্বাদ হয় না।

বেগুন অনেক প্রকার। যথা—মুক্তকেশী, সিংহনাদ, লাউয়া, চৈতা, মাকড়া, শিঙ্গা, তাল, সরেলা, দুধিয়া ইত্যাদি। ইহার মধ্যে দুধিয়া বেগুন দেখিতে অতি সুন্দর, একেবারে ঠিক দুগ্ধের ন্যায় ধলা; এক একটী হাঁসের

ডিমের মতন আকৃতি; মুক্তকেশী বেগুন খাইতে সুস্বাদ অধিক। সয়েলা বেগুন এক একটী অঙ্গুলিবৎ হয়, কিন্তু অপর্য্যাপ্ত ফলে; আউষকুলি নামে আর একপ্রকার বেগুন আছে তাহা বার মাস জন্মে।

বেগুন ন্যূনাধিকরূপে সকল স্থানেই জন্মে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা যশোহরে উত্তম জন্মে, এবং অধিক ফলে। এক বিঘা বেগুনের চাষ উত্তমরূপ করিতে পারিলে অন্যূন এক শত টাকা ফলিতে পারে। এই সকল কৃষি দ্বারা স্থানীয় গ্রাহকের সংখ্যা অনুসারে কৃষকের লাভ, যেখানে গ্রাহক না থাকে সেখানে অধিক এবং উত্তম ফলিলেও মূল্য অধিক হয় না কাজেই লাভ কম হয়।

মূলা।

উত্তম দোয়াশ হালকা মাটি, মূলার ক্ষেত্রের উপযোগী, বরং বালির ভাগ বেশী থাকিলে অনিষ্ট করে না। কিন্তু আঠালের ভাগ অধিক থাকিলে অনিষ্ট হয়। ভাদ্র মাস হইতে মূলার ক্ষেত্র চাষ করিতে আরম্ভ করিতে হয়। মূলার ক্ষেত্র প্রথম হইতে অন্যূন ২০ খানা চাষের কমে হয় না। প্রতিবিঘায় অন্যূন চারিমণ ছাই ৩০/ মণ গোবর এবং ২/ মণ পরিমাণ খইলের তরল সার দেওয়া আবশ্যক। মূলার ক্ষেত্র মুঠুমহাত পরিমাণ খনিত এবং মৃত্তিকা ধূলিবৎ হওয়া উচিত। প্রথমত শ্রাবণ মাসে ২ বার চাষ দিয়া ॥০ আদমণ পরিমাণ চুণা দিয়া রাখিলে মৃত্তিকা অধিক শিথিল হয়, ক্ষেত্রের ঘাসজঙ্গল বন কাষ্ঠাদি উত্তমরূপ পরিষ্কৃত করিতে হয়। ক্ষেত্রের মৃত্তিকা কঠিন কি বন কাষ্ঠ থাকিলে তাহাতে মূলা ভাল হইতে পারে না। ক্ষেত্রের কাঠিন্য গতিকেই মূলা বক্র হইয়া থাকে। সাধারণতঃ মূলার বীজ ক্ষেত্রে বুনিয়া ফেলিবারই নিয়ম, কিন্তু আমরা দেখিয়াছি কপি, শালগম, ইত্যাদির ন্যায় মূলার চারা করিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করিলেও উত্তম মূলা হইয়া থাকে। বীজ বুনিয়াই হউক অথবা চারা রুপিয়াই হউক মূলার গাছ সকল পরস্পর আদ হাত পরিমাণ ব্যবধান থাকা উচিত। যে ক্ষেত্রে গাছ ঘন হয় তাহা তুলিয়া ফেলা উচিত। মূলার

ক্ষেত্রে সর্ব্বদা খুঁড়িয়া মাটি আলগা করিয়া দিতে হয়, মূলার গাত্রস্থ ছোট শিকড় যত ছিঁড়িয়া দেওয়া যায় (মাটি আলগা করিতে যত ছিঁড়িয়া যায়) ততই বৃদ্ধি হইতে থাকে। মূলার গাছ বাতাসে বাড়ে, ক্ষেত্র হইতে আদহাত মুঠমহাত পরিমাণ উচ্চ হয়। মূলার ক্ষেত্রে অধিক জল সেচিবার আবশ্যক হয় না, জল পাইলে মাটি জটিল হইয়া মূলার বৃদ্ধির বাধা করে। ক্ষেত্রের মৃত্তিকা অত্যন্ত নীরসা হইয়া গেলে অল্প অল্প জল ছড়াইয়া দিতে হয়, যেন শিশিরের মত পড়ে। এবং জল টানিলে মাটির জড়া ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। মূলাও বারমাস জন্মান যায় কিন্তু শীত কালে যেমন সুস্বাদু থাকে অন্য সময় তেমন হয় না। একবিঘা ক্ষেত্রে ৭০। ৮০ টাকার মূলা হইয়া থাকে।

ছিমরা অথবা সিম।

ইহা ঝিঙ্গা শশা লাউ ইত্যাদি গাছের প্রণালী অনুসারে লাগাইতে হয়। কোন কোন স্থানের কৃষকেরা উল্টা রথের দিন সিমের বীজ বপন করে এবং চৈত্র মাসের সংক্রান্তি দিন গাছ কাটিয়া ফেলে। ইহার অন্য কোন কারণ আমরা উপলব্ধি করিতে পারি নাই; কেবল এই যে উল্টা রথের পর হইতে বৃষ্টির অত্যাধিক্য কমিয়া যাইতে পারে এবং চৈত্রের পর আর সিমে কোন স্বাদ থাকে না। যাহা হউক শ্রাবণ মাসের মধ্যে বীজ বপন করার উপযুক্ত সময়। যে স্থানে বীজ বপন করিতে হইবে সেই স্থানের মৃত্তিকা কিছু উচ্চ করিতে হয় এবং বীজ বপন করিয়া কলার খোল দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয় নচেৎ বৃষ্টির জলে বীজ পচিয়া যায়, গাছ জন্মে না। সিমের বীজ বপন করিবার অনধিক ২ ঘণ্টা পূর্ব্বে চুণের জলে ভিজাইয়া রোপণ করিলে পোকা লাগে না। ছিমড়া নানাজাতীয়,—ঘৃতকমলি, নলডোগ, চামুয়া, মটরছড়ি। ঘৃতকমলি সিম সর্ব্বাপেক্ষা সুস্বাদু। সিমের বিচিতে উত্তম ডাইল প্রস্তুত হয়। ত্রিপুরা এবং শ্রীহট্টে ইহার ব্যবহার অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। বিলাতি সিমের রোপণ প্রণালী এইরূপই। কিন্তু দেশী সিম অপেক্ষা তাহা পূর্ব্বে ফলে, রোপণও বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে করিতে হয়।

মানকচু।

ইহা উত্তম দোয়াশ মাটিতে জন্মে, যে ক্ষেত্রের মৃত্তিকা অত্যন্ত সিক্ত কি যে ক্ষেত্র বর্ষার জলে ডুবিয়া যায়, তাহাতে মানকচু জন্মে না। অত্যন্ত রসাল ক্ষেত্রে কি ছায়াতে মানকচু হইলে তাহাতে গলা ধরে এবং সুসিদ্ধ হয় না।

মানকচু কোন কোন স্থানে বৈশাখ মাসে লাগায়, কোন স্থানে কার্ত্তিক মাসেও লাগায়। গৃহস্থের বাটীতে যে দুই একটি হয় তাহা প্রায় বারমাসই লাগাইয়া থাকে। দুই চারি পাঁচ বৎসর পরে তোলে, যাহারা ক্ষেত্রে রোপণ করে তাহারা প্রতিবৎসরই তুলিয়া লয়। কচুর ক্ষেত্রেও গভীর চাষ দিতে হয় এবং মৃত্তিকা উত্তম চূর্ণ করিতে হয়। ১২। ১৪ চাষের কমে হয় না। ক্ষেত্রে যত অধিক ছাই দেওয়া যায় ততই ভাল। অন্যূন ১৫ পনর মণ ছাই দেওয়া আবশ্যক। ২ হাত ব্যবধান সারি করিয়া ১॥ হাত অন্তর কচুর চারা পুঁতিতে হয়। পুঁতিবার সময় চারি ছয় অঙ্গুলি পরিমাণ ডাঁটা রাখিয়া কাটিয়া ফেলিতে হয়। গাছ একটু বড় হইলেই গোড়ায় মাটি খুঁড়িয়া সারির মধ্যের মাটি তুলিয়া দিতে হয় পুনঃ পুনঃ এইরূপ মাটি তুলিতে হয় এবং ঘাস জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিতে হয়। এক বৎসরেই এই কচু সকল সোয়া হাত দেড় হাত লম্বা এবং উপযুক্তরূপ মোটা হইয়া থাকে। বাখরগঞ্জ এবং ২৪ পরগণার অধীন বারৈপুরে মানকচুর চাষ অধিক এবং তথায় সুস্বাদু কচু জন্মে। প্রতিবিঘায় ১০০৲ টাকার কচু বিক্রয় হইতে পারে।

বিদেশী শাকসবজী। *

বান্ধাকোপি।

কোপির চাষ নানাবিধ প্রণালীতে হইয়া থাকে। আমরাও প্রায়

* ইহা বহু প্রকার, সমুদয় প্রকারের কৃষি প্রণালী প্রকাশ করার সময়াভাব। সাধারণতঃ যে সকল অধিক ব্যবহার্য্য তাহারই কএক প্রকারের এ স্থলে আলোচনা করা যাইতেছে।

সকল প্রকারেরই চাষ করিয়া দেখিয়াছি তন্মধ্যে সহজে এবং সুবিধায় যে উপায়েতে উত্তম জন্মিতে পারে, অবশেষ আমরা সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছি এবং এ স্থলেও তাহাই প্রকাশ করা যাইতেছে।

কোপির ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে স্পেন, হলণ্ড, ফ্রান্স, ইংলণ্ডের পশ্চিম পার্শ্ব এবং ভূমধ্য সাগরের উপকূলবর্ত্তী অরণ্য মধ্যে ইহা স্বভাবজ জন্মিত। তৎকালে বোধ হয় সামান্য জঙ্গলা গাছের ন্যায় ছিল। ক্রমে নানাবিধ উপায়ের দ্বারা কৃষি প্রণালীর উৎকর্ষতায়, আকার অবয়বের উত্তমতা এবং সুস্বাদু হইয়াছে।

কোপির ক্ষেত্র উত্তম দোয়াশ মৃত্তিকা বিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক। পলি এবং বোদ মাটিও ইহার উপযোগী। এই দুই প্রকার মৃত্তিকা ক্ষেত্রে অধিক থাকিলে সার অল্প দিলেও ক্ষতি হয় না। ১ হাত কি ১॥ হাত পরিমাণ উচ্চ করিয়া মাচা প্রস্তুত করিয়া তাহার উপরে উত্তমরূপ চূর্ণীকৃত মৃত্তিকা এবং পুরাতন গোবরের সার মিশ্রিত করিয়া সেই মাচার উপর পাঁচ ছয় অঙ্গুলি পরিমাণ উচ্চ করিয়া তাহার উপর বীজ বুনিতে হয়! এমন পরিমাণ বুনিতে হয় যে, একটী হইতে অপরটী তিন চারি অঙ্গুলি ব্যবধান থাকে। তাহার উপর ১ হাত পরিমাণ উচ্চ করিয়া এক খানি ছাওলা প্রস্তুত করিয়া দিতে হয় (ছন পাতলা করিয়া তিন চারি খান চটা দিয়া বান্ধিয়া ছাওলা প্রস্তুত করা উচিত)। বীজে জল দেওয়া কালে ঐ ছাওলার উপর হাত দিয়া ছিটাইয়া দিলে, শিশিরের ন্যায় ফোঁটা ফোঁটা পড়ে। সন্ধ্যার সময় ছাওলা তুলিয়া ফেলিতে হয় এবং প্রাতে তুলিয়া দিতে হয়। এইরূপ প্রণালীতে চারা প্রস্তুত করিলে জল বৃষ্টি কি রৌদ্রের আধিক্যে চারার বিঘ্ন হয় না, অথবা মাটিতে চাপ বান্ধিতে পারে না। ক্রমে চারা একটু বড় হইতে থাকে আর প্রতিদিন ছাওলা হইতে দুইগাছা চারিগাছা করিয়া ছন টানিয়া ফেলিতে হয়। তাহাতে ক্রমে ক্রমে চারা সকলের রৌদ্র সহ্য করিবার শক্তি জন্মে। নচেৎ একবারে ছায়ায় থাকিলে চারা লম্বা হইয়া উঠে এবং শ্বেতবর্ণ ধারণ করে সেই চারা ক্ষেত্রে লাগাইলে রৌদ্র সহ্য করিতে পারে না এবং নিতান্ত দুর্ব্বল অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। তিন চারিটী পাতা

হইলেই আমরা গাছ ক্ষেত্রে লাগাইবার উপযুক্ত মনে করি। গাছ বড় করিয়া ক্ষেত্রে লাগাইলে, স্থানান্তর-জনিত দুর্ব্বলতা সহসা যায় না।

শ্রাবণের শেষ কি ভাদ্রের প্রথম হইতেই ক্ষেত্রে চাষ দিতে হয়। একফিট পরিমাণ মৃত্তিকা খনন করা এবং তাহা ধূলিবৎ চূর্ণ করা উচিত। প্রতিবিঘায় প্রথমত ৫ কি ৭ মণ পরিমাণ গোবরের সার দিতে হয়। ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে এবং মধ্যে ছোট ছোট নালা (কোল) রাখিতে হয়। * ১॥ হাত পরিমাণ ব্যবধান সারি করিয়া সওয়া হাত অন্তর একফিট পরিমাণ চতুষ্কোণ এবং অৰ্দ্ধ ফিট পরিমাণ গভীর করিয়া গাথা (খাল) খনন করিতে হয়। পরে /১ সের পরিমাণ গোবরের সার এবং অর্দ্ধসের পরিমাণ খইলের তরল সার একত্র করিয়া ঐ গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া অল্প পরিমাণ মাটি মিশাইয়া দিতে হয়। তৎপর সেই সকল গর্ত্তে চারা রোপণ করিতে হয় (ইহাতে প্রতিবিঘায় ৮ মণ গোবর এবং চারি মণ খইলের অধিক লাগে না)। তিন চারি দিন অল্প অল্প জল ছিটাইয়া দিতে হয়। চারা রোপণ করিয়া কলার খোলা দিয়া ঢাকিয়া দিলে ভাল হয়। ২।৩ দিনের অধিক ঢাকিয়া দিবার আবশ্যক হয় না। গাছ সকল ক্ষেত্রে লাগিয়া গেলে গোড়ার মাটি আল্‌গা করিয়া গোড়ায় মাটি ধরাইয়া দিতে হয়। ২।১ দিন পরে একবার জল সেচিয়া দিতে হয় † গাছ একটু বড় হইলে অনধিক ১৷৷০ মণ পরিমাণ খইলের গুঁড়া অৰ্দ্ধেক পরিমাণ ছাইর সহিত মিশ্রিত করিয়া গাছের গোড়ায় দিয়া মাটি চাপা দিয়া দিতে হয়। এবং গাছের গোড়ার চতুর্দ্দিকে মাটি দিয়া এক একটী গামলার মতন করিয়া দিতে হয় অর্থাৎ গাছের গোড়ায় মাটিও একটু উচ্চ থাকে পরে তাহা হইতে কিছু নিম্ন হইয়া শেষ কান্দার মতন মাটি উচ্চ করিতে হয় এবং খইল দেওয়ার ২ দিন পরে একবার জল দিয়া ঐ গামালার ন্যায় স্থানটা পূর্ণ করিয়া দিতে হয়। জল টানিয়া গেলে ২।৩ দিন পরে গাছের গোড়ার মাটি আল্‌গা করিয়া দিতে হয় তখন কোপি বাদ্ধিতে

---

* আলুর ক্ষেত্রে নালা রাখার প্রণালী অনুসারে।

† আলুর ক্ষেত্রের নালায় যেরূপ জল দেওয়ার উল্লেখ করা হইয়াছে সেইরূপে জল দিতে হয়।

থাকে। অনেকে কোপির পাতা সকল একত্র করিয়া বান্ধিয়াও দিয়া থাকেন তাহা অনাবশ্যক। গাছের গোড়ায় যে গামলার ন্যায় করিয়া মাটি দিতে হয় তাহাই ক্রমে চাপাইয়া দিলে পাতা সকল চাপিয়া রাখে আর মেলিতে পারে না।

বান্ধা কোপি অনেক জাতীয়। যথা—লার্জ ড্রম হেড, সুগার লোফ, আরলি ইয়ার্ক, বুমসডেল্, জাবসিওয়েক্ফিল্ড, ব্রোকলি, ব্রসেল্স প্রাউটস, ইত্যাদি। এ ভিন্ন ফুলকোপি, শালগম বুর্টা ইত্যাদিও কোপি জাতিতে পরিগণিত।

ফুলকোপি, ওলকোপি, এবং শালগামও আমরা এই প্রণালীতেই করিয়া থাকি। প্রভেদ এই যে, বান্ধা কোপির ন্যায় ইহাদের গোড়ায় মাটি গামলা আকৃতি করিয়া দিতে হয় না এবং সার অপেক্ষাকৃত অল্প দিলেও ক্ষতি হয় না। অন্যান্য কৃষক এবং মালিরা শালগম এরূপে প্রস্তুত করে না কিন্তু আমরা এই প্রণালীতে চার সের পরিমাণ ওজনের শালগম প্রস্তুত করিয়াছি। এক একটী সাধারণ মিষ্ট কুমড়ার ন্যায় বড় হইয়াছিল।

গাজোর, এণ্ডা ও সুরঙ্গি মূলা—এ সকল আমরা আমাদের দেশী মূলার প্রণালীতেই প্রস্তুত করিয়া থাকি। অধিকন্তু বিঘাপ্রতি ২৲ মণ হিসাবে খইলের তরল সার দিয়া থাকি এবং মূলার জল দিবার অধিক আবশ্যক হয় না, ইহাতে দুইবার জল দিতে হয়।

ছালাদ, সেলেরি, ইহা এক এক প্রকার শাক। ইহাও ঐ কোপির ন্যায় চারা করিতে হয়, ক্ষেত্র সেইরূপ কর্ষণ করিতে হয়। সার তদপেক্ষা কম দিলেও ক্ষতি হয় না এবং কোপির ন্যায় অত পরিমাণ ব্যবধান রোপণ করিতে হয় না। মুঠুম হাত পরিমাণ ব্যবধান রোপণ করিলেই হয়। এ ভিন্ন আর বিশেষ বিভিন্নতা নাই।

এ সকল ভিন্ন বিলাতি অনেক গুলি শাক সবজির চাষ এদেশে হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহার সমুদয় প্রকার আমরা চাষ করিয়া দেখিতে পারি নাই, তবে কৃষি সম্পর্কীয় পুস্তকাদি পাঠে তাহার কৃষিপ্রণালী অবগত আছি, তাহারও বিশেষ বিভিন্নতা নাই। টেম এবং মারজারম

ভিন্ন আর কোন জাতীয় সবজিতে কোপি অপেক্ষা অধিক সার দিবার আবশ্যক হয় না। অপরীক্ষিত বিষয়ে কেবল শ্রুতলিপি দ্বারা পুস্তক অধিক বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা হয় না। বিশেষতঃ সময়ও নাই, এই জন্য তৎ-সম্বন্ধে ক্ষান্ত দিলাম।

তৃতীয় অধ্যায়।

বণিক্ উপযোগী কৃষি।

যে সকল কৃষিতে ব্যয় এবং পরিশ্রমের অধিক আবশ্যক, অধিক অধ্যবসায়, এবং অধিকাংশ বিদেশীয় বণিকদিগের উপযোগী তাহাকেই বণিক্ উপযোগী কৃষি নাম দেওয়া গেল। যথা—চা, নীল, তুঁত, আফিম ইত্যাদি।

বর্ত্তমানে সর্ব্ববিধ কৃষি বাণিজ্য অপেক্ষা চা অধিক লভ্যকর হইয়াছে। কৃষি সূত্রে একস্থলে বলা হইয়াছিল যে কৃষিকার্য্যে মূলধনের শতকরা ৭৫৲ টাকা লাভ হয়। অথচ মূলধন স্থায়ী থাকে, অথবা কেবল স্থায়ী থাকে কেন, তাহাও ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকে। চা ক্ষেত্রের আয় ব্যয় দেখিলেই পাঠকবর্গের তাহাতে প্রতীতি হইবে। এস্থলে আর কএকটি কথা বলা আবশ্যক হইতেছে. কেহ মনে করিতে পারেন যে, ৩০৲ টাকা ব্যয় করিয়া ১/ বিঘা বেগুনের চাষ করিলে তাহাতে ১০০৲ টাকা উৎপন্ন করিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহা সত্য, ১৲ টাকা মূলধন নিয়া এক বৎসর ব্যাপী বেগুনের ব্যবসা করিলে ২০ টাকা ২৫ টাকা উৎপন্ন করিয়া লওয়া তাহাও সত্য। কিন্তু মনে করুন ভারতবর্ষে যে সকল প্রধান নগর কি উপনগর ইত্যাদি আছে তাহার কোন প্রধাননগর কি উপনগরে কোন ব্যক্তি অনধিক হাজার টাকা নিয়া বেগুনের ব্যবসা আরম্ভ করিলে তাহার কত লাভ হইতে পারিবে? ইহার কোন স্থানে যদি এক ব্যক্তি অনধিক হাজার বিঘা ভূমি বেগুনের চাষ করে তাহার কত লাভ হইতে পারিবে? লাভ দূরে যাউক প্রত্যুত ব্যবসাই চলিবে না। কোন ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে লাভের ন্যূনাতিরেক গণনা না করিয়া প্রথমত

মূলধনের স্থায়ীত্ব অথবা ধ্বংস সম্ভাবনা কতদূর তাহাই দেখিতে হয়। এই গণনা করিয়াই লোকে শতকরা বার্ষিক ৩ টাকা ৪ টাকা লাভে জমিদারী ক্রয় করিয়া তৃপ্ত হয়, ৪ টাকা লাভে গবর্ণমেণ্ট কাগজ করে।*

অর্থশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের মতে ব্যবসায়ে উত্তমতা অধমতা এইরূপে গণনা হইয়া থাকে, যাহার মূলধনের ধ্বংস সম্ভাবনা কম, মূলধন অধিক খাটিতে পারে অথচ লাভ অধিক সেই ব্যবসায়ই অধিক প্রার্থনীয় এবং আদরণীয়। রেলওয়ে কোম্পানীর সেয়ারারগণ বার্ষিক শতকরা ৯ টাকা ১০ টাকার অধিক লাভ পায় না তাহাতেই তাঁহারা আনন্দে পুলকিত এবং সেয়ারের মূল্য দ্বিগুণ হইয়া উঠিতেছে কারণ তাহার মূলধনের ধ্বংস সম্ভবনা অতি কম। বরং রেলওয়ে কোম্পানীর দ্বারা দেশের বহুলোক প্রতিপালন যাইতেছে; দেশের বহুবিধ উপকার উন্নতি হইতেছে; তাহা পরের হাত দিয়া না করিয়া নিজেরা করিলে অধিক সুখের হয়।

চা ক্ষেত্রেও যে মূলধনের ধ্বংস সম্ভাবনা কম তাহা যাঁহারা চা-র ইতিহাস অবগত আছেন তাঁহারাই স্বীকার করিবেন এবং লাভ যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাহাও হিসাবে অবগত হইতে পারিবেন। ২০ হাজার হইতে ২০ লক্ষ পর্য্যন্ত মূলধন লইয়া বসিলেও লাভের আধিক্য বই ন্যূনতা হইবে না।

বর্ত্তমান অবস্থায় 'চা' কৃষি বাণিজ্যের শিরস্থানীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের অনেক গুলি লোক প্রতিপালিত হইতে পারে এবং দুরারোহ দুর্ভেদ্য পাহাড় পর্ব্বতাদি ও ক্রমে আবাদ হইয়া মনুষ্যের ব্যবহার উপযোগী হইতে থাকে, পশ্বাদির অত্যাচার কমিয়া যাইতে থাকে। দেশের ধনী সম্প্রদায়কে এই কার্য্যে ব্রতী হইতে আমরা বিশেষ অনুরোধ করি।

চার ভূমিকা করিতে গিয়া বাহুল্য আলোচনা করা হইল, যাহাহউক

---

* তাহাই বলিয়া আমরা কোম্পানী কাগজ করাকে উত্তম উপায় বলিতেছি বলিয়া কেহ মনে করিবেন না। তাহাতে দেশের কোন উপকারই নাই। অন্য ব্যবসায়ে লাভ কম হইলে, কি আশঙ্কা থাকিলেও যদ্দ্বারা দেশের আর ১০ জন প্রতিপালন যাইতে পারে, তাহা মনুষ্য জীবনের প্রধান কার্য্য।

চা ক্ষেত্রের কার্য্যত আবশ্যকতাকে ২০টী ভাগে বিভক্ত করিয়া ক্রমাধীন তাহার বর্ণনা করা গেল।

কার্য্যবিভাগ।

১। চার ইতিহাস এবং আবশ্যকতা।
২। চা প্রদেশ।
৩। চার উপযোগী স্থানীয় লক্ষণ।
৪। চা ক্ষেত্রের উপযোগী ভুমি।
৫। আবাদ প্রণালী।
৬। বীজ পরীক্ষা।
৭। পালন অথবা নর্শরি।
৮। ক্ষেত্র বিভাগ।
৯। চার জাতির লক্ষণ।
১০। রোপণ প্রণালী।
১১। বাৎসরিক কার্য্য প্রণালী
১২। চার উপদ্রব এবং তন্নিবারণ।
১৩। কলম করিবার নিয়ম।
১৪। কুলি।
১৫। চা ক্ষেত্রের উপযোগী যন্ত্র এবং দ্রব্যাদি।
১৬। চা পত্র চয়ন।
১৭। চা প্রস্তুত প্রণালী।
১৮। চার জাতি বিভাগ।
১৯। বিবিধ কার্য্য-প্রণালী।
২০। আয় ব্যয়।

চা—

১। চার ইতিহাস এবং আবশ্যকতা।

চীন এবং জাপান ভিন্ন পৃথিবীর মধ্যে আর কোথাও চার চাষ আবাদ ছিল না এবং আর কোন দেশে চা জন্মিতে পারে বলিয়াও কেহ অবগত

ছিল না। জনৈক সাহেব আসামের অরণ্য মধ্যে প্রথমতঃ চা বৃক্ষের আবিষ্কার করেন। * তদ্দ্বারা নির্ব্বাচিত হয় যে, ভারতবর্ষেও চা জন্মিতে পারে। তৎপর ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রথমতঃ চার আবাদ আরম্ভ হয়; প্রথমে কেবল আসামেই চার চাষ হইতে আরম্ভ হইয়া শেষ ক্রমে ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই চার চাষ হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

ভারতবর্ষে যেরূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কয়েকটি চা ক্ষেত্র এবং এক একটা সম্প্রদায় মিলিত হইয়া কার্য্যাদি করা হইতেছে, চিন এবং জাপানে সেরূপ নয়। আমাদের দেশে যেমন সকল কৃষকই ন্যূনাধিকরূপে ধানের চাষ করিয়া থাকে সে দেশে সেইরূপ ন্যূনাধিকরূপে চার চাষ করে। সে দেশে কৃষকদিগের চা প্রস্তুত করিতে হয় না, প্রস্তুত করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় আছে। কৃষকেরা কেবল মাত্র পাতা তুলিয়া নিয়া সেই সকল কারখানায় বিক্রয় করে। ভারতবর্ষের চা-প্রদেশ সকলেও কৃষকেরা অল্প অল্প করিয়া চা ক্ষেত্র করিতে আরম্ভ করিলে কালে এদেশেও তদ্রূপ (পাতি ক্রয় করিবার) কারখানা অথবা সম্প্রদায় হইতে পারে। কৃষকেরা অন্যান্য কার্য্যের সঙ্গে যদি অল্প অল্প পরিমাণে চা ক্ষেত্র করে তবে তাহাতে অধিক ব্যয় আবশ্যক হয় না বরং অন্যান্য অনেক কৃষি অপেক্ষা অল্প ব্যয়ে এবং সহজ পরিশ্রমে সম্পাদিত হইতে পারে। † চা বৃক্ষ অনেক কাল জীবিত থাকে। চিনে জাপানে ৫০০ বৎসরের চা-বাগিচা ও বর্ত্তমান আছে শুনা যায়।

সমুদায় ইউরোপ ব্যাপী চার ব্যবহার; এভিন্ন অন্যান্য দেশেও ন্যূনাধিকরূপে চার ব্যবহার প্রচলিত আছে। একমাত্র গ্রেটব্রিটনে প্রতিবৎসর ১৪ কোটি টাকার চা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর ন্যূনাধিক ৩ কোটি টাকার চা রপ্তানি হইতেছে। চিন এবং জাপানের স্থানীয় ব্যবহার ভিন্ন ৩০ কোটি টাকার চা অন্যান্য দেশে

* গবর্ণমেণ্ট হইতে তজ্জন্য তাঁহাকে কতক ভূমি পুরস্কার প্রদত্ত হয়, অদ্যাপিও তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ তাহা ভোগ করিতেছেন। আসাম কাছাড় অরণ্য মধ্যে এখনও অনেক চা বৃক্ষ দৃষ্ট হয়।

†. আয় ব্যয়ের হিসাবের পরিমাণানুসারে দেখা যাইবে।

রপ্তানি হইয়া থাকে। দিন দিন যেমন চার আবাদও বৃদ্ধি পাইতেছে তেমন সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যকতা ও বৃদ্ধি পাইতেছে। চার আবাদ বৃদ্ধি হওয়ায় মূল্য কমিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবার যাঁহারা আশঙ্কা করেন তাঁহাদের ভ্রম।

২।—চা প্রদেশ।

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে যে সকল স্থানে চা জন্মিতেছে তাহার নাম। আসাম, কাছাড়, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, দারজিলিং (নিম্ন প্রদেশ), দারজিলিং (হিমালয়), দেরাডুন, কাংগ্রা, কমাউন, নীলগিরি শ্রেণী, (মান্দ্রাজ) রাঁচি, নাগপুর, হাজারিবাগ, জলপাইগুড়ি, ভুটান, মণিপুর।

এ ভিন্ন কাশ্মীর, নেপাল, ব্রহ্মদেশ, এই সকল রাজ্যেও চা জন্মিতে পারে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। আমরা বোধ করি ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই জন্মিতে পারে তবে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা সকল স্থানে না থাকিতে পারে। অধুনা ঢাকার অন্তঃপাতী ভাওয়াল প্রভৃতি স্থানেও অল্প অল্প চার চাষ হইতেছে, তবে ফসল তত সুবিধা হইতেছে না। ‡

যে সমস্ত চা প্রদেশের নাম উল্লেখ করা হইল, তাহার সমুদায় স্থানেই যে চার চাষ হইতে পারে তাহা নয়, স্থানীয় অনেক লক্ষণের দ্বারা স্থান নির্ব্বাচন করিতে হয়। বর্ত্তমানে যে সমস্ত স্থানে চা জন্মিতেছে তন্মধ্যে উপর আসাম সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

৩।—চার উপযোগী স্থানীয় লক্ষণ।

স্বভাবতঃ যে স্থানে সর্ব্বদা উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হয় অথচ সেই বায়ুর আর্দ্রতা অধিক থাকে, (রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা বায়ুর এই গুণ অতি সহজে পরীক্ষা করা যাইতে পারে) যে স্থানে বসন্ত ঋতুতে অপেক্ষাকৃত অধিক বৃষ্টিপাত হয়, বর্ষাকালে রৌদ্র বৃষ্টি সমপরিমাণে থাকে অর্থাৎ ক্রমাগত অনবরত বৃষ্টি না হয়, কখন রৌদ্র কখন বৃষ্টি হয়, সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত অন্ততঃ ২।৩ বার বৃষ্টি হয়, শীত ঋতুতে

‡ যদিও আমরা বিশেষ অবস্থা জানি না, তথাচ স্থানীয় লক্ষণানুসারেই বোধ হয় যে উত্তম ফসল হইতে পারে না।

অত্যন্ত হিমপাত হয় (কিন্তু বরফ না পড়ে) গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব অপেক্ষাকৃত কম থাকে বর্ষার জলে ক্ষেত্র প্লাবিত না হয়। এই সকল গুণ বিশিষ্ট স্থান চা আবাদের পক্ষে উত্তম উপযোগী।

এত গেল, স্থানীয় প্রাকৃতিক লক্ষণ। এ ভিন্নও কতকগুলি লক্ষণের আবশ্যক। ভূমির উর্ব্বরতা সর্ব্বাগ্রে দেখা আবশ্যক। স্থানীয় জল বায়ুর স্বাস্থ্যকারীতা, মালামাল আমদানি রপ্তানির যোগ্য নদী খাল অথবা অন্য রকম সুবিধা, সর্ব্বদা ব্যবহারোপযোগী জলের সুবিধা, স্থানীয় কুলির সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা এই সকল বিবেচনা করা আবশ্যক। নগর কি উপনগরের নিকটবর্ত্তী স্থান ঘটিলে অধিক সুবিধা অন্ততঃ বাজার বন্দর এবং লোকালয় অধিক দূরবর্ত্তি না হয়। এই সমুদায় বিবেচনা করিয়া কার্য্যক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিতে হয়।

পূর্ব্বে যে সকল চা-প্রদেশের নামোল্লেখ করা হইয়াছে, তৎসমুদায় প্রদেশেই কি তদন্তর্ব্বর্ত্তি সমুদায় বাগিচাতেই সর্ব্বপ্রকার সুবিধা রহিয়াছে তাহা নয়, অনেক স্থানেই কোন না কোন প্রকার অসুবিধা আছে। কদাচিৎ কাহার ভাগ্যে সর্ব্বপ্রকার সুবিধাও ঘটিতে পারে।

উল্লেখিত চা প্রদেশ সমূহের সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে এ স্থলে কতকটা সংক্ষেপ পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে আসাম সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, কিন্তু আসামেও অসুবিধা আছে। আসামে বর্ষাকালে পর্য্যায়ক্রমে রৌদ্র বৃষ্টি হয় না, আমদানি রপ্তানির অসুবিধা। কাছাড়ের প্রধান গুণ বসন্ত ঋতুতে বৃষ্টি অধিক হয় এবং বর্ষাকালেও রৌদ্র বৃষ্টির অবস্থা আসাম অপেক্ষা ভাল, কিন্তু ভূমি তেমন সারবিশিষ্ট নয়। আসামাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর, আমদানি রপ্তানি সম্বন্ধে আসাম অপেক্ষা ভাল, কাছাড় দ্বিতীয় স্থানীয়।☞ চট্টগ্রাম,—ভূমি উর্ব্বরা। বর্ষাকালে অতি বৃষ্টির অনিষ্ট নাই, কিন্তু বসন্ত ঋতুতে বৃষ্টি হয় না। তাহাতেই চা অধিক জন্মে না, কাছাড় অপেক্ষা জল বায়ু স্বাস্থ্যকর, কুলির সুবিধা আছে এবং আমদানি রপ্তানি সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা চট্টগ্রামে অধিক

☞ কাছাড় এবং দারজিলিং এই উভয়ের মধ্যে কে দ্বিতীয় কে তৃতীয় তাহাতে সন্দেহ আছে।

সুবিধা। চট্টগ্রাম তৃতীয় স্থানীয়। দারজিলিং নিম্ন প্রদেশ—ভূমি উর্ব্বরা আসাম কাছাড় অপেক্ষা স্থানীয় কুলির সুবিধা কিন্তু আমদানি রপ্তানি পক্ষে সুবিধা নাই। শ্রীহট্ট—কাছাড়ের সদৃশ, কাছাড় অপেক্ষা স্বাস্থ্যকর। এতদ্ভিন্ন আর যে সকল স্থানের উল্লেখ করা হইয়াছে সে সকল স্থান অধিকাংশ বিষয়েই নিকৃষ্ট, কেবল মাত্র কুলির সুবিধা। যেমন ফসলও কম হয় তেমন ব্যয়ও কম পড়ে, স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও প্রায় সকল স্থানই নিকৃষ্ট, কেবল কাংগ্রা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট। এই সকল সুবিধা অসুবিধা যতই থাকুক কিন্তু ভারতবর্ষের কোন স্থানেই কোন চা-কর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন এরূপ শুনা যায় নাই।

আমরা চট্টগ্রাম হইতে দারজিলিং পর্য্যন্তই চা আবাদের পক্ষে অধিক উপযোগী মনে করি। ইহার স্থান বিশেষের গুণের ন্যূনাতিরেক থাকিলেও অনুযোগী নহে। সমুদায় চা প্রদেশের সমালোচনা করিতে হইলে তাহাতেই প্রায় একখানি সাধারণ রকম পুস্তক হইতে পারে।

৪।—চা-ক্ষেত্রের উপযোগী ভূমি।

ভূমির গুণাগুণের উপরই চা-ক্ষেত্রের লাভের ন্যূনাতিরেক নির্ভর করে। অন্যান্য কৃষিক্ষেত্রের ন্যায় চা-ক্ষেত্রে সার প্রয়োগ করিয়া বাগিচা নির্ম্মাণ করা সুবিধাও নয় ব্যয়ও সহজ নয়। এপর্য্যন্ত যতগুলি চা-বাগিচা হইয়াছে অন্যূন ১০০ এক শতের কম বাগিচার কথা প্রায় শুনা যায় নাই। এইরূপ বিস্তারিত ক্ষেত্রে সার প্রয়োগ করিতে হইলে চাতে আর অধিক লাভ থাকে না। * সার দিলে উপকার না হয় তাহা বলা হইতেছে না। কিন্তু সাধারণতঃই যে ভূমি অধিক উর্ব্বরা এবং সমধিক সারবিশিষ্ট সেই স্থল নির্ব্বাচন করাই বিধি। স্থানীয় লোকে চা-বাগিচা করিলে তাহার পক্ষে বাড়ীর নিকটস্থান কথঞ্চিৎ অনুর্ব্বরা হইলেও সার প্রয়োগ করিয়া চা-বাগিচা করায় অসুবিধা নাই, যে ব্যক্তি দূরদেশ হইতে গিয়া চা-

---

* কোন কোন স্থানে সার দেওয়ার ব্যবহারও হইয়াছে, কিন্তু সে অধিকাংশই পুরাতন বাগিচা, এখন ফেলিয়া গেলে ঢের ক্ষতি হয় বলিয়াই এরূপ ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে, তবে যেখানে কুলি সস্তা ও সারও সুলভে পাওয়া যায় সেখানে দিলে লাভ হয়।

বাগিচা করিবে তাহাকে অবশ্য সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম স্থান দেখিয়া বাগিচা করাই উচিত। তাহার পক্ষে সকলই দূরদেশ। চার পক্ষে অস্থিচূর্ণই উত্তম সার। রেড়ির খইল দ্বিতীয়, সরিষার খইল তৃতীয়, গোবর চতুর্থ শ্রেণীর সার। সারের গুণানুসারে অল্পাধিক প্রয়োগ করিতে হয়।

ভূমি নির্ব্বাচন করিতে অনেক গুলি লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি করিতে হয়। আঠালমাটি একেবারে চার অনুপযোগী। যে মৃত্তিকা বসন্ত ঋতুতে স্বভাবতঃ ফাটিয়া যায়, তাহাতে চা হইতে পারে না। নিরবচ্ছিন্ন বালিতে কোন উদ্ভিদ্‌ই ভাল জন্মে না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অপ্রকৃত মৃত্তিকাই উত্তম কিন্তু কেবল ইহার দ্বারাই ভূমির লক্ষণ স্থির হইল না, কেহ কেহ বলিয়াছেন, 'কাল বর্ণ মৃত্তিকা চা-ক্ষেত্রের অনুপযোগী।' আমরা এ কথা স্বীকার করি না, যে মৃত্তিকার উপর নানাবিধ গলিত সার স্তূপাকারে জমিয়া মৃত্তিকার বর্ণ কাল হইয়াছে তাহা চা ক্ষেত্রের পক্ষে উত্তম উপযোগী। (আঠাল মাটির যে কৃষ্ণবর্ণ লক্ষণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহাই অনুপযোগী; সে কেবল চা কেন সকলেরই অনুপযোগী) যে মৃত্তিকা সহজে চূর্ণ করা যায়, অর্থাৎ একখণ্ড মৃত্তিকা এক হাতের উপরে রাখিয়া অন্য হাতে চাপ দিলে সহজে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায় তাহা চা-ক্ষেত্রের উপযোগী, (বালির ভাগ অধিক থাকিলেও সহজে এরূপ চূর্ণ হইয়া থাকে অতএব তাহার আরও পরীক্ষা করিতে হয়।) সেই চূর্ণীকৃত মৃত্তিকায় একবিন্দু জল দিয়া হস্তে ডলিলে দলা হইতে পারে, ফাটিয়া না যায় বালির ভাগ অধিক থাকা জানিবার জন্য সেই হস্ত রৌদ্রের দিকে ধরিলে বালুকা সকল চিক দেয় তাহাতে ন্যূনাধিক জানা যায়। ক্ষেত্রের কোন এক স্থান অন্যূন ২ফিট পরিমাণ খনন করিলে নীচে উত্তম শুভ্রবর্ণ মৃত্তিকা পাওয়া যায় এবং উপরে অন্ততঃ ৫।৬ ইঞ্চি পরিমাণ পলিত উদ্ভিদাদির স্তর থাকে তাহা উত্তম জ্ঞান করিতে হইবে, কিন্তু ইহার নীচের মৃত্তিকাও কঠিন না হয় রসাল থাকে অথচ জল না উঠে। মৃত্তিকার অত্যন্ত সিক্ততাও চার অনিষ্টকারী এবং একেবারে নীরস শুষ্কতাও অনিষ্টকারী, তথাচ অধিক সিক্ততা অপেক্ষা শুষ্কতা ভাল।

ক্ষেত্রের উপরিভাগের একখণ্ড মৃত্তিকা শুষ্ক করিয়া দগ্ধ করিলে যদি

পাঁচ ভাগের এক ভাগ কমিয়া যায়, তবে উত্তম উর্ব্বরা ভূমি জানা যাইবে। ইহার ন্যূনাধিক্যে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্টতার ন্যূনাধিক্য জ্ঞান করিতে হইবে। এ ভিন্ন আর এক উপায় আছে, সাধারণতঃ ভিন্ন এক স্থানের (চা-ক্ষেত্রের অনুপযোগী স্থানের) একখণ্ড মৃত্তিকা, নির্ব্বাচিত ক্ষেত্রের তৎপরিমাণ এক খণ্ড মৃত্তিকার উভয়কে শুষ্ক করিয়া ওজন করিলে যদি নির্ব্বাচিত ক্ষেত্রের মৃত্তিকা ১৬ ভাগের ১ ভাগ ওজনে কমিয়া যায়, তাহা হইলে মৃত্তিকা উত্তম জ্ঞান করিতে হইবে।

যেস্থান ঘন নিবিড় তৃণ গুল্মাচ্ছন্ন জঙ্গলময় ক্ষেত্র, তদ্রূপ স্থান দেখিয়া মনোনীত করা উচিত এবং সেই জঙ্গলাদি শীতঋতুর সময় সতেজ থাকে কি নিস্তেজ হয় সতেজ থাকিলে তাহাতে উদ্ভিদাদির পলিত সার অধিক, বৃহৎ বৃক্ষাদিবিশিষ্ট জঙ্গলে তত পরিমাণ সার থাকে না। অত্যন্ত উচ্চ নীচ বন্ধুর ভূমি অত্যধিক উচ্চ টিলা চা ক্ষেত্রের পক্ষে উত্তমোপযোগী নহে, প্রথমতঃ তাহাতে পলিত সারাদি অধিক থাকিতে পারে না বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া নীচে গড়াইয়া পড়ে, দ্বিতীয়তঃ ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ কোদালী দেওয়াতে মাটি আলগা হইতে থাকে আর বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া গাছের গোড়ার মাটি নীচে নামিয়া গিয়া শিকড় ভাসিয়া উঠে গাছ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তৃতীয়তঃ তদ্রূপ ক্ষেত্রে সার দিলেও সুবিধা হয় না তাহাতেও উক্ত কারণ ঘটে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব চা-কর সাহেব-দের বিশ্বাস ছিল যে উভয় টিলা ভিন্ন চা জন্মিতে পারে না। এখন তাঁহারা পরিতাপিত হইতেছেন, অনেকে প্রস্তুতী বাগিচা পরিত্যাগ করিয়া সমতল স্থানে বাগিচা করিতেছেন।† কিন্তু সমতল ক্ষেত্র উত্তম হইলেও এরূপ স্থান না হয় যাহাতে বৃষ্টির সময় চতুর্দ্দিকের জল আসিয়া ক্ষেত্র প্লাবিত করে; কি জল অধিক সময় স্থায়ি থাকে। গাছের গোড়ায় জল জমিয়া থাকিলে কি মৃত্তিকায় সিক্ততা থাকিলে গাছ বৃদ্ধি হইতে পারে না এবং পত্রশালী হয় না। যেখানে নিতান্ত তদ্রূপ

---

† আমরা নিকৃষ্ট বাঙ্গালি হইলেও এবং সাহেবদের এই সংস্কার জন্মিবার পূর্ব্বেই সমতল ক্ষেত্রে বাগিচা করিয়াছিলাম। তখন কোন কোন সাহেব হাসিতেন।

সম্ভাবনা ঘটে, সেখানে ক্ষেত্রের সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন দিকে ৪। ৫ ফিট পরিমাণ গভীর নালা করিতে হয়, তারপর ক্ষেত্রের অবস্থানুসারে ২০ হাত ব্যবধানে (গাছের চারিটী শ্রেণী অন্তর) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালা করিয়া বড় নালার সহিত যোগ করিয়া দিতে হয়। ক্ষুদ্র নালা সকলও ২ ফিটের কম গভীর না হয়। এইরূপ করিলে আর কোন অনিষ্ট হইতে পারে না। ঐ নালা সকল প্রতিবৎসরই কিয়ৎ পরিমাণে ভরিয়া যায়, কোদালির সময় সেই নালার মাটি ক্ষেত্রে তুলিয়া দেওয়াতে অধিক উপকার হয়। ক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তি ঝর্ণা (দেশ বিশেষে ছড়া বলে) কি ঝিল প্রভৃতি যাহাতে সর্ব্বদা জল থাকে, সেই জল বিশিষ্ট স্থান হইতে ক্ষেত্র যদি অন্যূন ৪ ফিট উচ্চ না হয় তবে তাহা চা ক্ষেত্রের উপযোগী হইবে না, কারণ নালার দ্বারা তাহার সিক্ততা দূর করা যাইবে না। সিক্ততা নিবন্ধন গাছ বৃদ্ধি এবং পরিপুষ্ট হইতে পারিবে না।

যে পরিমাণ স্থানের পাট্টা কি অন্যরূপ বন্দোবস্ত করা হয়, তাহার এক চতুর্থাংশ পরিমাণ গএর আবাদি জঙ্গল রাখা আবশ্যক, কয়লা এবং লাকড়ির আবশ্যকের জন্য রাখিতে হয়। যেখানে বিস্তৃত জঙ্গল নিকটে থাকে এবং তাহা কাটিতে কেহ বাধা না দেয় সেখানে রাখা আবশ্যক হয় না।

৫।—আবাদ প্রণালী।

কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে জঙ্গল কাটিতে আরম্ভ করিতে হয়। প্রথম বৃহৎ বৃক্ষাদি না কাটিয়া ক্ষুদ্র জঙ্গলাদি কাটিয়া শেষ শুষ্ক হইলে আগুন দিয়া পুড়িয়া দিতে হয়। যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা এক এক স্থানে স্তূপাকার করিয়া রাখিয়া দিলে ক্রমে কুলি প্রভৃতির ব্যবহারীয় লাকড়ির কাজ হয়, স্থানও পরিষ্কার হয়। বৃহৎ বৃক্ষাদির এক কি দেড় হাত পরিমাণ উচ্চ স্থানে চতুর্দ্দিকে ঘুরাইয়া কতক পরিমাণ কাটিয়া রাখিতে হয়, (গাছের বাকল এবং কতক পরিমাণ কাঠের সহিত কাটিয়া দিতে হয়, গাছের অবস্থা বিশেষে ন্যূনাতিরেক কাটা আবশ্যক) তাহাতে ক্রমে ক্রমে গাছ সকল নিস্তেজ হইয়া শুষ্ক হইয়া যাইতে থাকে।* ঐ বৃহৎ গাছ সকল

* পূর্ব্বে এ প্রথা ছিল না। একবারে সমুদয়ই কাটিয়া ফেলিত, তাহাতে ব্যয় ও অধিক ছিল এবং ক্ষেত্রেরও উপকার হইত না।

যদি পরস্পর এত ঘন থাকে যে, ক্ষেত্রে একবারেই রৌদ্র লাগিতে পারে না, তবে মধ্যে মধ্যে তাহার কতক শাখা প্রশাখা কাটিয়া দিতে হয়; এই গাছ সকল থাকায় প্রথমত কোন অনিষ্টই করে না বরং উপকার হয়। চারা সকলে অধিক তাপ লাগিতে পারে না, মাটি শুষ্ক হইতে পারে না; চারা সকল ক্রমে যত রৌদ্র তাপাদি সহ্য করিবার সমর্থ হইতে থাকে, বৃক্ষাদি ক্রমে শুষ্ক হইতে থাকে, দুই বৎসরের সময় গাছ সকল কাটিয়া দিতে হয়। † এই সকল গাছের কয়লা করা যায়।

এইরূপে জঙ্গলাদি পরিষ্কারের পর স্থানের অবস্থা ভেদে একবার কি দুই বার কোদালি দিতে হয়। কোন স্থানে একবারে কোদালি না দিলেও হয়। যে স্থানের মৃত্তিকা অধিক অসমান (কোন স্থান উচ্চ কোন স্থান নীচ) এবং প্রথম কোদালির পর তৃণাদি জঙ্গল অধিক থাকে সেখানে দুইবার কোদালি দিতে হয়। নচেৎ একবার কোদালি দিলেও চলে, যে খানে বৃক্ষ গুল্মাদির শিকড় অধিক না থাকে সেখানে কোদালি না দিলেও ক্ষতি হয় না। ফাল্গুন চৈত্র মাসে কোদাল দিতে হয় অধিক পূর্ব্বে দিলে জঙ্গলাদি হইয়া পড়ে, এবং বৃষ্টির আধিক্য সময় দিলেও কোদালিতে জঙ্গলাদি মরিয়া যায় না। যে সকল বৃক্ষ গুল্মাদির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোড়া এবং সিকড়াদি থাকে তাহা কোদালির সময় তুলিয়া ফেলিতে হয় (যাহা তিন চারি কোপে উঠে)। তদপেক্ষা বড় গোড়া থাকিয়া গেলেও কোন ক্ষতি হয় না শেষক্রমে কোদালিতে উঠিয়া যে সকল স্থানে তৃণাদি অধিক জঙ্গল থাকে সে সকল স্থানে কেহ কেহ একবার কোদালির পর মাটির চাকা সকল ভাঙ্গিয়া (তাহাকে ঢেলা করা বলে) জঙ্গলাদি বাছিয়া ফেলিয়া থাকেন সকল স্থানে তাহা আবশ্যক করে না এবং ব্যয়ও বেশি পড়ে। কোন প্রকার পরিষ্কার করিয়াও জঙ্গল উঠা নিবারণ করিয়া রাখা যায় না। যে খানে জঙ্গলাদির সবলতা ও সতেজস্কতা কম সে স্থান চা ক্ষেত্রের পক্ষে উত্তম উপযোগীও নহে। এ সকল স্থানবিশেষে কর্ত্তৃপক্ষের বিবেচনানুসারে সম্পাদিত হয়।

---

† বিনা ব্যয়তেও অনেক কাটা হইয়া যায়, কুলি প্রভৃতিরা নিজের প্রয়োজনেই শুষ্ক বৃক্ষাদি কাটিয়া নেয়।

৬।—বীজ পরীক্ষা।

চার বীজ দেখিতে ছোট। সুপারি অথবা আমাদের দেশী নাটা ফলের ন্যায় (নাটাকে কোন্ দেশে কি বলে জানিনা)। বীজের মধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ আছে, তদ্দ্বারা ইহার তারতম্য হয় না। যে বীজ ওজনে পাতলা তাহাই খারাপ, বীজ ভাঙ্গিলে তাহার মধ্যের শাঁস ঈষৎ হরিদ্বর্ণ এবং তৈলাক্তের ন্যায় দেখা গেলে তাহা উত্তম বীজ। কিন্তু বীজের যে বাক্স আসে তাহাতে সমুদয়ই এবম্বিধ উত্তম বীজ থাকে। বাক্সে কত বীজ ভাল কত বীজ মন্দ তাহা দুই রকমে পরীক্ষা করা যায়। বাক্স হইতে ১০০ শত বীজ লইয়া তাহা ভাঙ্গিলে কতটা উত্তম পাওয়া যায়, অথবা একটা গামলা কি অন্য কিছুতে জল দিয়া তাহাতে ঐরূপ কতক পরিমাণ বীজ গণিয়া ফেলিলে, যে গুলি একেবারে নীচে পড়িয়া যায়, তাহা উত্তম। যাহা একেবারে নীচে পড়ে না অথচ জলের মধ্যে ভাসিয়া থাকে তাহা মধ্যম। যাহা একেবারে উপরে ভাসিয়া থাকে তাহা খারাপ, সে গুলি প্রায়ই অব্যবহার্য্য। এরূপ বীজের শতকরা ৮। ১০ টা চারা উঠে কি না সন্দেহ এবং উঠিলেও তাহা দুর্ব্বল এবং নিস্তেজ। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা তদ্রূপ বীজ উৎপন্ন চারা রোপণই করে না। শতকরা ৭৫ টা ভাল পাওয়া গেলেও উত্তম মধ্যে পরিগণিত। ৬০টা হইলে মধ্যম, তদপেক্ষা কম হইলে নিকৃষ্ট, তাহার দামও কম।

যে সকল গাছে বীজ জন্মে তাহাতে পাতি ভাল হয় না এবং অতি অল্প হয়, এজন্য সকলে গাছের বীজ রাখে না। কলম করিবার সময়ই ফেলিয়া দেয় এবং সকল স্থানের বীজও ভাল নয়। সাধারণতঃ আসাম হইতেই চা বীজ সর্ব্বত্র নীত হয়, আসামের মধ্যেও যোড়হাট প্রভৃতি কতিপয় স্থানের বীজ অতি উত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ। মণিপুরের বীজও উত্তম। বীজ কএক জাতীয়,—চিনা, আসামি, জঙ্গলি, আসাম হাইব্রিড। সর্ব্বাপেক্ষা জঙ্গলি উত্তম বীজ। চীনা সর্ব্বাপেক্ষানিকৃষ্ট। * মণিপুরে

* ক্ষেত্রের গুণাগুণানুসারে সকল বীজেরই আবশ্যক হয় তাহা জাতির লক্ষণে প্রকাশ করা যাইবে।

জঙ্গলি বীজ ভিন্ন অন্য জাতি পাওয়া যায় না। মণিপুরের জঙ্গলের মধ্যেও অনেক চা-বৃক্ষ আছে। তাহা হইতেও অনেক বীজ সংগৃহীত হয়। বোধ হয় এই জন্যই ইহার নাম জঙ্গলি হইয়াছে।

৭।—পালং অথবা নরশরি।

চার বীজ যে স্থানে প্রথমে চারা দেওয়া হয় তাহাকে পালং বলে। পালং আসামি ভাষা; তাহারই ইংরাজি নাম নরশরি। পূর্ব্ব হইতেই চার চারা করিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করার প্রণালী। ইদানীং চারা না করিয়া একেবারেই ক্ষেত্রে বীজ বপনের প্রণালী আরম্ভ হইয়াছে। চারা রোপণাপেক্ষা বীজ বপনে অনেক সুবিধা আছে। পালং করিতে যে খরচ লাগে তাহা বাঁচিয়া যায়। দ্বিতীয়ত বীজে যে গাছে জন্মে তাহা আর মরিবার আশঙ্কা কম থাকে। চারা রোপণ করিলে (স্থানান্তরিত করার দরুণ) অনেক চারা মরিয়াও যায়। তৃতীয়ত চারা রোপণ করিলে প্রায় ৩বৎসরের কমে পাতি দেওয়ার উপযুক্ত হয় না। বীজের গাছে ২ বৎসরের সময়েই পাতি দেওয়ার উপযুক্ত হয়। অন্ততঃ উভয় গাছ এক সময়ে পাতি দিবার উপযুক্ত হইলেও চারার গাছ অপেক্ষা বীজের গাছে প্রথমতঃ অপেক্ষাকৃত অধিক পাতি দেয়। শেষে অবশ্য উভয়ই সমান হইতে থাকে। কিন্তু সকল স্থানেই প্রথমত বীজ লাগান যায় না, অধিক ঘাস জঙ্গলাদি বিশিষ্ট ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে সুবিধা হয় না। বিশেষতঃ (পালঙ্গে চারা করাই হউক কি ক্ষেত্রে বীজ বপন করাই হউক) ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বীজ বপন করা প্রশস্ত সময়। এই সময়ের মধ্যে জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া কোদালি দিয়া সমুদয় ক্ষেত্রে বীজ বপন করার সুবিধা করা যায় না। অধিকাংশ এই কারণেই বীজ রোপণের বাধা জন্মে। যাহাদের পূর্ব্ববৎসরের পরিষ্কৃত স্থান থাকিয়া যায় তাহাদের পক্ষে পরবৎসর ক্ষেত্রে একেবারে বীজ বপন করার সুবিধা হয়।*

---

* যে ক্ষেত্রে একে বারে বীজ বপন করিতে হয় তাহাতে বৃহৎ বৃক্ষাদি রাখিয়া দেওয়া অতীব কর্ত্তব্য। তাহাতে সুবিধা এই চারার কোমল অবস্থায় রৌদ্র অধিক লাগিতে পারে না।

ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতে হইলে, পেঁবোক্ত প্রণালী অনুসারে ব্যবধান করিয়া এক এক স্থানে বীজ বপন করিতে হয়। (বীজ পরীক্ষার দ্বারা যে বীজ একেবারে নীচে পড়ে সেই বীজ বপন করিতে হয়) কেহ দুইটী করিয়া বীজ বপন করিয়া (উত্তম বীজ দেখিয়া লাগাইলে একটী লাগা-নই ভাল) থাকে। দুইটী চারাটি উঠিলে, শেষ যে স্থানে চারা না উঠে সেই সেই স্থানে রোপণ করা হইয়া থাকে। দুই বীজ বপন করিতে হইলে পরস্পর দুইটী ৪।৬ অঙ্গুলি ব্যবধান থাকা উচিত। নচেৎ তুলিতে সুবিধা হয় না। ৪।৫ দিন অন্তর এক একবার করিয়া জল দিতে হয়। এইরূপে ৪।৫ বার দেওয়া আবশ্যক হয়। কতক গাছা করিয়া বন খড় দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়।

পালঙ্গে চারা করিতে হইলে, বীজের পরিমাণানুসারে কতক স্থান ১ ফুট পরিমাণ গভীর কোদালি দিয়া (দুই তিনবার কোদালি দিতে হয়) মাটি উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া গুল্ম লতাদির শিকড় এবং ঘাস] জঙ্গল বাছিয়া পরিষ্কার করত, অনধিক ২ হাত প্রশস্ত করিয়া চৌকা অর্থাৎ দুই দিকে নালার মতন রাখিয়া মাটি উচ্চ করিয়া দিতে হয়। এইরূপে পরিমিত স্থান সমুদয়ে করিতে হয়। তাহাতে বৃষ্টির জল ঐ সকল নালা দিয়া সরিয়া যায়। চারার গোড়ায় জল জমিয়া নষ্ট করিতে পারে না। ঐ সকল চৌকার উপর ৪ ইঞ্চি পরিমাণ ব্যবধানে সারি সারি করিয়া ৩ ইঞ্চি অন্তর করিয়া বীজ বপন করিতে হয় (বীজের বোঁটা যে দিকে থাকে সেই দিক উপরে রাখিয়া বপন করিতে হয়) ২ ইঞ্চি পরিমাণ মাটি উপরি ভাগে চাপা দিতে হয়। প্রতি দিন জল দিতে হয়। অন্যূন তিন সপ্তাহের পূর্ব্বে চারা বাহির হয় না; একমাস দেড় মাস পরেও চারা উঠিয়া থাকে। বীজ সকলের অঙ্কুর উদ্গম হইতে আরম্ভ করিলেই উপরে ছাওনা দিতে হয়। তিন চারিখান করিয়া চটা দিয়া পাতলাপাতলা ছন দিয়া ছাওনা প্রস্তুত করিতে হয়। সওয়া হাত দেড় হাত পরিমাণ খুঁটা দিয়া তাহার উপরে ঐ সকল ছাওনা দিতে হয় এবং একএকটী চৌকার চতুর্দ্দিকেও ঐরূপ (পরিমাণানুসারে) ছাওনার ন্যায় প্রস্তুত করিয়া আটকাইয়া দিতে হয়। ইহাতে জল বৃষ্টির আধিক্যে চারার

অনিষ্ট করে না এবং গো মেষ ও ছাগাদিতেও অনিষ্ট করিতে পারে না। সমুদয় চারা না উঠা পর্য্যন্ত জল দিতে হয়। শেষ ৫। ৭ দিন অন্তর জল দিতে হয়। ঐ নালার মধ্য দিয়া গিয়া ছাওলার উপর জল ছিটাইয়া দিতে হয় তাহাতে শিশিরের ন্যায় পড়িতে থাকে এবং উপরিস্থ ছাওলা ঠাণ্ডা থাকায় নিম্নের মৃত্তিকার রস শুষ্ক হইতে পারে না। চারা ক্রমে বড় হইতে থাকে, আর ক্রমে প্রতিদিন অল্প অল্প করিয়া ছাওলার ছন টানিয়া ফেলিতে হয়, এইরূপে আস্তে আস্তে রৌদ্র সওয়াইয়া নিতে হয়, এইরূপে কএক দিন পরে মধ্যে মধ্যে ২। ১ দিন ছাওলা তুলিয়া রাখিতে হয়। আবার ২। ১ দিন পরে ঢাকিয়া ২। ১ দিন রাখিতে হয়, এইরূপে ক্রমে সহ্য হইয়া গেলে শেষ ছাওলা ফেলিয়া দিতে হয়। পালঙ্গের মধ্যে ঘাস জঙ্গলাদি হইলে তাহার মধ্যে একএকবার পরিষ্কার করিয়া দিতে হয় নচেৎ বরাবর অনিষ্ট করে।

চারা রোপণের উপযুক্ত সময়ে ছোট ছোট খন্তি দিয়া চারা তুলিতে হয়। তুলিবার সময় সাবধান হইতে হয় যে চারার শিকড় কাটিয়া কি ছিঁড়িয়া না যায়।

এক মণ গুটিতে ২৮ হইতে ৩১ হাজার গুটি হয়। উত্তম বীজ হইলে এক চতুর্থাংশের অধিক বাদ যায় না। তিন ভাগের দুইভাগ পরিমাণ চারা উঠিয়াই থাকে। বীজের জাতি অনুসারে ব্যবধানে রোপণ করিতে হয়।

৮।—ক্ষেত্র বিভাগ।

অতি সুবিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া চায় চাষ-আবাদ হয়, তাহা সমুদয় সমভাবে পরিলক্ষিত করা এবং কার্য্যাদির সুবন্দোবস্ত রাখা সুকঠিন, এজন্য তাহার ক্ষেত্র বিভাগ করার আবশ্যক। ক্ষেত্রবিভাগের দ্বারা কার্য্যের অনেক সুবিধা এবং সুশৃঙ্খলা হইয়া থাকে।

স্থানের লক্ষণালক্ষণ এবং সুবিধানুসারে অন্যূন ৪ অনধিক ৬ একার পরিমাণ একএকখানি খণ্ড বিভাগ করিতে হয়, এবং সেই সকল খণ্ডের পরিমাণানুসারে ৪।৫টি সেকশন করিতে হয়, খণ্ড সকলে একাদিক্রমে

নম্বর থাকে এবং সেকশন সকলে (ক) কিম্বা (A) কার আদি বর্ণ দ্বারা চিহ্নিত থাকে। সমুদয় বাগিচার একখানি নক্সা (Map) থাকে তাহাতে ঐ সকল চিহ্ন অঙ্কিত থাকে, ঐ সকল স্থানে আর নম্বর দিয়া রাখার আবশ্যক করে না। কার্য্য করিতে করিতে এমন অভ্যস্ত হইয়া পড়ে যে শেষ কুলিরাও বলিতে পারে যে, কোন্ নম্বরের কোন্ সেকশনে কে কে কাজ করিল, কি করিতেছে, ঐ সকল প্রত্যেক নম্বরেরই চতুর্দ্দিকে অন্যূন ৬ হাত পরিসর এক একটী রাস্তা থাকে, এবং সেক্শন সকলের চতুর্দ্দিকের গাছের যে পলি অথবা সারি থাকে, সেই পলি গুলি অন্য পলি অপেক্ষা কিছু প্রশস্ত রাখিলেই তাহাও রাস্তার ন্যায় চিহ্ন করিয়া দিতে হয়, এই সকল রাস্তা প্রস্তুতে আর কিছুই করিতে হয় না। মাত্র ২পাশে দুইটী জুলির মতন (১হাত প্রশস্ত ১ ফুট গভীর নালা) করিয়া দিতে হয়। এই সকল রাস্তা থাকায় চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া দেখার সুবিধা হয় এবং সকলদিকে সমান নজর রাখা যায়। রাস্তা না থাকিলে অনেক সময় ইচ্ছা এবং আবশ্যকতাসত্বেও কেবল অসুবিধার গতিকে যাওয়া যায় না, বিশেষতঃ কুলি প্রভৃতি লোকজন বাগিচার মধ্য দিয়া যদৃচ্ছারূপে চলিবার তাহাতে গাছের অনিষ্ট হয়, মাটি শক্ত হইয়া যায়।

এই সকল নম্বর এবং সেকশন থাকায় কোন্ দিন কোন্ নম্বরের কোদালি দেওয়া হইল আর কত দিন পরে সেখানে কোদালি দিতে হবে তাহা ঠিক রাখা যায়, কোন্ দিন কোন্ নম্বরের পত্র চয়ন করা হইল আর কত দিন পরে সেই নম্বরের পত্র চয়নের উপযোগী হইবে তাহা জানিবার অতি সুন্দর সুবিধা হয়। নচেৎ একস্থানের পাতি শক্ত হইয়া যায় অন্য স্থানে হয় ত অনুপযোগী সময়ে পুনরায় তুলিতে প্রবৃত্ত হওয়া যায়। আরও একটী সুবিধা আছে, কোন নম্বরে কত কত পাতি দিল তৎপরিমাণ দ্বিতীয় নম্বরে তাহার ন্যূনাতিরেক হইলে তাহা হইতে একটা অনুসন্ধিৎসা উপস্থিত হয়, যে কেন এই ন্যূনাতিরেক হইল, তদনুসারে তাহার যত্নের আধিক্য আবশ্যক হয়।

কুলিদের কার্য্য সম্বন্ধে মাপের গোলযোগ হইলে তাহা সহজে ধরা যায়, কুলিদের কার্য্যের যে নিরিখ থাকে ১নল পাশে এবং স্থানের অবস্থানু-

সারে যতই দীর্ঘ দেওয়া যায়, তদ্দ্বারা প্রথমেই হিসাব রাখা যায় যে, অমুক নম্বর কোদালিতে এতটা হাজরি লাগিবে, যতজন কুলিতে যত দিন কাজ করিল তাহার সঙ্গে মিলাইলে যদি ন্যূনাতিরেক হয় তবেই ধরা যায় যে সরদার কি হাজারানবিস কোনরূপ ছল-তর্ক করিয়াছে।

বস্তুতঃ ওই ক্ষেত্রবিভাগ দ্বারা কার্য্যের অনেক সুবিধা এবং সুশৃঙ্খলা হয়। প্রশস্ত কৃষিক্ষেত্রের পক্ষে ইহা নিতান্ত আবশ্যক।

৯।—চার জাতীয় লক্ষণ।

চার বীজ যে কএকজাতি আমাদের দেশে ব্যবহার হইতেছে, তাহার পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে, এইক্ষণ সেই সকল জাতীয়ের লক্ষণ বর্ণনা করা আবশ্যক। চীনজাতীয় চা-বৃক্ষ অতিশয় বড় কিম্বা অধিক শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট (অন্যান্য জাতির ন্যায়) হয় না, ইহার পাতাও অন্যান্য চা অপেক্ষা ছোট, এবং অন্য গাছ অপেক্ষা পাতিও কম হয়। কিন্তু অধিক রৌদ্র বৃষ্টি উভয়ই সহ্য করিতে পারে না। সহজে মরে না, অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বরা ভূমিতেও জন্মে। অতি অল্প বয়সে গুটি ধরে এবং পাতা অপেক্ষা গুটি অধিক হয়। চারি ফিট অন্তর সারি করিয়া ৩ ফিট ব্যবধানে রোপণ করিতে হয়।

অঙ্গলি,—ইহার গাছ অত্যন্ত সবল এবং সতেজ হয়। অধিক শাখা প্রশাখা মেলে এবং সকল জাতীয় চার পাতা অপেক্ষা ইহার পাতা বড় হয় এবং অধিক পাতা হয়। অপেক্ষাকৃত রসযুক্ত মৃত্তিকায় ভাল জন্মে। অতি দীর্ঘকাল জীবিত থাকে এবং সমভাবে পাতি দেয়। চিনাজাতির ন্যায় ইহার জীবন কঠিন নহে, কিন্তু অন্য জাতি অপেক্ষা কঠিন। ইহা ৫ ফিট অন্তর গলি করিয়া ৫ ফিট অন্তর রোপণ করিতে হয়। স্থানবিশেষে তাহাতেও উভয় গাছে লাগিয়া যায়। অঙ্গলিতে অধিক রৌদ্র সহ্য করিতে পারে না।

আসামী চা—ইহার গাছও সবল হয়, কিন্তু অঙ্গলির সঙ্গে তুলনায় নিকৃষ্ট, পাতাও তদপেক্ষা ছোট হয়। কিন্তু চিনা অপেক্ষা পাতি বড় হয়। রৌদ্র বৃষ্টির সমতা সহ্য করিতে পারে, অর্থাৎ অত্যধিকও নয়,

অত্যল্পও নয়। এদেশের পক্ষে অধিকাংশস্থলেই এই জাতীয় চা উত্তমোপযোগী। পরস্পর ৪॥ ফিট অন্তর থাকা উচিত।

আসাম হাইব্রিড,—আসামির সঙ্গে প্রায় সম্পূর্ণ সাদৃশ্যই দৃষ্ট হয়। কেবল পাতিগুলি একটু বড় হয়, এবং গাছও অপেক্ষাকৃত সবল হয়। আসামি অপেক্ষা রৌদ্রবৃষ্টির আধিক্য সহ্য করিতে পারে। ইহাও অতি উত্তম উপযোগী, আসামির ন্যায় ব্যবধান থাকিলেই চলে।

চারা রোপণের ব্যবধানপ্রণালী যাহা নির্দ্দেশ করা গেল, স্থানীয় উর্ব্বরতা অনুর্ব্বরতা অনুসারে, ব্যবধানের ন্যূনাতিরেক করিতে হয় অর্থাৎ স্থান অধিক উর্ব্বরা হইলে অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যবধান অনুর্ব্বরা হইলে অল্প ব্যবধানে রোপণ করিতে হয়।

১০।—রোপণপ্রণালী।

ক্ষেত্রে বীজই রোপণ করা যাউক আর চারাই রোপণ করা যাউক, প্রথমতঃ লাইনবন্দী করিয়া নিতে হয়, অর্থাৎ (এক সারি হইতে অন্য সারি যত ব্যবধান হইবে এবং এক চারা হইতে অন্য চারা যতদূর অন্তর রোপণ করিতে হইবে, তাহা নির্ণয় করাকে লাইনবন্দী বলে।) লাইনবন্দী করিবার জন্য এক একটী বেত্র অথবা এক একটী লৌহশৃঙ্খল থাকে, চার জাতীয় লক্ষণ অনুসারে এবং ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা অনুসারে যত ব্যবধানে সারি এবং রোপণের ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে সেই অনুসারে ঐ বেত্রে কি শৃঙ্খলে এক একটী চিহ্ন সংযোগ করিতে হয়। যেন সহজে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় এবং স্থানচ্যুত না হয়, দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করা আবশ্যক। সেই শৃঙ্খল অথবা বেত্র ক্ষেত্রে ফেলিয়া সেই চিহ্নিত স্থানে এক হাত কি সওয়া হাত পরিমাণ এক একটী বাঁশের চটা অথবা কোনরূপ কাঠি পুঁতিয়া দিতে হয়, এইরূপ সমস্ত ক্ষেত্র চিহ্নিত করা আবশ্যক। ঐ চিহ্নিত স্থানে প্রথমতঃ এক একটী গর্ত্ত করিয়া যাইতে হয়। গর্ত্ত সকল অনধিক ১ এক ফুট চতুষ্কোণ এবং গভীর হওয়া উচিত। এইরূপ গর্ত্ত করিয়া রাখায় অনেক সুবিধা আছে। চারা রোপণের উপযোগী সময় একেবারে অধিকাংশ চারা রোপণ করা যায়। এবং বৃষ্টি

ইত্যাদি দ্বারা মাটী ধৌত হইয়া গর্ত্তের কিয়দংশ পূর্ব্বেই পূর্ণ হইয়া যায়, তাহাতে গর্ত্তস্থ মৃত্তিকা অধিক শিথিল এবং কোমল হইয়া থাকে। চারা কি বীজ রোপণ করিলে সত্বরই সতেজ এবং সবল হয়। যেদিন যখন বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয় তখনই চারা রোপণ করিতে হয়। রৌদ্রের দিনে চারা রোপণ করা উচিত নয়, তাহাতে চারার মূলে রৌদ্র লাগিয়া অনেক চারা মরিয়া যায়।

যে মাসে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইলেই চারা রোপণের উপযুক্ত সময় হয়। বীজ রোপণ করিতে হইলে ডিসেম্বর জানুয়ারির মধ্যে করা কর্ত্তব্য। আগষ্ট মাস পর্য্যন্তও চারা রোপণ করা যায়, কখন কখন কেহ কেহ কার্য্যের আধিক্যবশতঃ সেপ্টেম্বর মাসেও রোপণ করিয়া থাকেন কিন্তু যে, জুন মাসের রোপিত চারার ন্যায় সবল এবং সতেজ হয় না। ক্রমে বিলম্বে রোপিত চারাই অপেক্ষাকৃত হীনতেজ হইয়া থাকে। চারা রোপণের কালে সোজাভাবে রোপণ করা উচিত। এবং চারার শিকড়ের অগ্রভাগ যেন গর্ত্তের মধ্যে বক্রভাবে না থাকে তজ্জন্য বিশেষ সতর্কতা নেওয়া আবশ্যক। শিকড়ের অগ্রভাগ বক্র হইয়া থাকিলে সে গাছ কখনই সতেজ এবং বর্দ্ধিত হয় না। গর্ত্তের পরিমাণ অপেক্ষা যদি শিকড়ের পরিমাণ অধিক হয় তবে একখানী কাঠী দ্বারা গর্ত্তের মধ্যে ঘা দিয়া একটী ছিদ্রবৎ করিতে হয়; তাহাও এমন পরিমাণে করিতে হয় যে, তন্মধ্যে গাছের শিকড়টী সচ্ছন্দে থাকিতে পারে। চারা পুঁতিয়া গোড়ার মাটি অতিশয় দৃঢ়রূপে বসাইয়া দিতে হয়, নচেৎ বৃষ্টির জল চারার মূলে প্রবেশ করিয়া অনিষ্ট জন্মায় এবং বৃদ্ধির বাধা করে। তাহাতে অনেক সময় চারা মরিয়াও যায়।

পূর্ব্বে যে চারা রোপণের ব্যবধানতার নিয়ম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তদনুসারে চিনা-চারা (যাহার চার ফিট এবং তিন ফিট অন্তর) প্রতিবিঘায় ১২৭২টা লাগে। জঙ্গলি (যাহা ৫ ফিট অন্তর) চারা ৬২৫টা লাগে। আসামী এবং আসাম হাইব্রিড (যাহা ৪॥ ফিট করিয়া অন্তর) চারা ৭২৮টা করিয়া লাগে।

পালঙ্গে যে পরিমাণ চারা জন্মে তাহার এক চতুর্থাংশ পালঙ্গে

রাখিয়া ৩ ভাগ পরিমাণ ক্ষেত্রে রোপণ করা উচিত। কারণ রোপিত চারা নানা কারণে অনেক মরিয়া গেলে সেই সকল স্থানে পুনরায় রোপণ করা আবশ্যক হয়।

লাইনবন্দির যে সকল কাটী বা চটা পুঁতিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ক্ষেত্রে সমুদয় ছুইবার কোদালি হওয়া পর্য্যন্ত তাহা থাকা আবশ্যক; নতুবা চারা ছোট থাকায় জঙ্গলে দেখা যায় না, কোদালির সময় কাটিয়া যায়।

১১।—বাৎসরিক কার্য্যপ্রণালী।*

চারা রোপণ সমাধা হইলেই কোদালি দেওয়া আরম্ভ করিতে হয়, যেখানে জুলাই মাসের পরেও চারা রোপণ আবশ্যক হয়, সেখানে রোপণ সমাধার পূর্ব্বেই (শ্রেণী মতে (যেখানে পূর্ব্বে রোপণ করা হইয়াছে সেইখানে পূর্ব্বে, এই রূপ ক্রমান্বয়ে) কোদালি দিতে আরম্ভ করিতে হয়, অর্থাৎ চারা সকলের গোড়ায় অধিক জঙ্গল হইলেই কোদালি আরম্ভ করা উচিত। নচেৎ চারা সকল নিস্তেজ হইয়া যাইতে থাকে। প্রথম দুই বার কোদালি দিবার সময় অতিশয় সতর্ক হইতে হয়, চারা না কাটিয়া যায়, এবং কোদালিতে চারার গোড়ার মাটিতে অধিক আঘাত না লাগে। তখন গভীর খনন না করিয়া কেবল জঙ্গল পরিষ্কার হওয়ার উপযোগী চাঁছা কোব দিয়া জঙ্গল গুলি সারির মধ্যে আদি রক্ষার ন্যায় রাখিয়া যাইতে হয়। শেষ ঐ জঙ্গলাদি পচিয়া দ্বিতীয় তৃতীয় কোবের সময় ক্রমে ক্ষেত্রস্থ মাটির সহিত মিশিয়া মাটির সবলতা সম্পাদন করে। চারার গোড়ার জঙ্গল সকল হস্ত দ্বারা পরিষ্কার করিয়া দিলেই ভাল হয়। অন্ততঃ অতি সাবধানতার সহিত আস্তে আস্তে কোদালির দ্বারা পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। দ্বিতীয় বারেও এইরূপ সতর্ক হওয়া উচিত। দ্বিতীয় কোদালি প্রথম কোদালির এক মাস পরেই দেওয়া উচিত; কার্য্যের বাহুল্যতায় দশ পাঁচ দিন পরে দিলেও ক্ষতি হয়

* অতি সংক্ষেপে স্থূলং বিষয় মাত্র লিখিত হইল, বিশেষতঃ এ স্থলে প্রথম বৎসরের কার্য্যপ্রণালীই লিখিত হইল, পরেও আর অধিক কিছু নয়, পাতি তোলা চা প্রস্তুত ইত্যাদি স্থানান্তর লিখিতব্য।

য়। তৃতীয় কোদালিও এক মাস পরে দিলেই ভাল হয়, এই সময় অতি গভীর কোদালি দেওয়া আবশ্যক; এক ফিট পরিমাণ গভীর হওয়া উচিত যে, চারার শিকড়ের অগ্রভাগের মাটি পর্য্যন্ত শিথিল হওয়া উচিত। এই রূপে ক্রমে নম্বর ও সেকসন সকলে কোদালি দিতে হয়। চা গাছ কেবল কোদালিতেই বাড়ে; যত গভীর এবং ঘন কোদালি দেওয়া যায় ততই গাছ বাড়িতে থাকে। * ইহার পরে দুই মাসান্তর কোদালি দিতে হয়; কোন কোন স্থানে তিন মাসান্তরও কোদালি দেওয়ার রীতি আছে। যে নিয়মই করা হউক ঠিক সেই সময়ান্তে পুনরায় সেই স্থানে কোদালি দিতে হয়।

ক্ষেত্রের মৃত্তিকা উত্তম হইলে এবং উপযুক্ত রূপ যত্ন করিলে চিনা জাতি ভিন্ন অন্য কিন জাতীয় চারাই কোন কোন স্থানে এক বৎসরের মধ্যেও কলম দিবার উপযুক্ত হয়। ডিসেম্বর মাসে জানুয়ারি মাসে ক্ষেত্রে যে বীজ বপন করা হয়, সেই বীজ তৎপর বৎসরের যথা ১৮৮০ ইংরেজী ডিসেম্বরের রোপিত বীজে যে গাছ হয় তাহা ১৮৮২ ইংরেজী ফেব্রুয়ারি মাসে কলম দিবার উপযোগী হয়। † স্থানীয় অবস্থানুসারে কোন স্থানে ২ বৎসরে কোথাও ৩ বৎসরে কলম দিবার সময় হয়। অবস্থানুসারে উপযোগী সময়ে কলম দিতে হয়, পাতি তুলিতে হয়, ইত্যাদি নানাবিধ কার্য্য করিতে হয়।

কুলিদিগের কার্য্যের নিরিখ আছে। কোন কার্য্যই বিনা নিরিখে করাইলে সুবিধা হয় না (কাজ কম হয়) এবং কার্য্যাধ্যক্ষগণেরও তাহাতে ভয়ানক পরিশ্রম হয়। নিরিখ মতে কার্য্য হইলে কেবল সেই নিরিখটা বুঝিয়া লইতে হয়। (কোদালিতে কোন গোল করিতে পারে না তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে) এবং কাজটা উপযুক্ত রূপ হইয়াছে কি না তাহা

---

* পালঙ্গে ৪। ৫ বৎসর পর্য্যন্ত চারা থাকিলেও তাহা বাড়ে না অথবা শাখা প্রশাখা হয় না। কিন্তু সিক্তে কইয়া তাহার সমধমক ক্ষেত্রের এক চারা শাখা প্রশাখায় প্রায় তিন ফিট বিস্তৃত হয়।

† কদাচিৎ কোন কোন স্থানে এরূপ হয়। সচরাচর ২ বৎসর পরে কলমের সময় হয়। কোন স্থানে ৩ বৎসরেও কলম দেওয়া হয়, তাহা নিকৃষ্ট ক্ষেত্র মধ্যে পরিগণিত।

দেখিতে হয়। কুলিরা সময় সময় অনেক দুষ্টামি করে। দুহাত চারি হাত কে বালি করিয়া মধ্যে দুই এক হাত ফাঁক দিয়া যায়। চতুর্দ্দিকের আলগা মাটি জড়াইয়া রাখে, কি যেখানে গভীর কোদালি দিবার কথা তাহার কতক স্থান গভীর করে মধ্যে কোন কোন স্থান পাতলা কোদালি-দিয়া রাখে।* কার্য্যাধ্যক্ষকে প্রতিদিন এই সকল পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়, সমুদায় স্থানেরই দৈনিক কার্য্য দেখিতে হয় এবং সপ্তাহে এক বার কার্য্যক্ষেত্রের সমুদায় পরিদর্শন করিতে হয়। অন্যান্য সমুদায় কার্য্যই নিরিখ করা ভাল কিন্তু চারা রোপণে নিরিখ দেওয়া উচিত নয়। তাহাতে অনেক খারাপ করিয়া ফেলে। এ ভিন্ন কলম দেওয়াও নিরিখে ভাল হয় না। এই দুই সময়ে কার্য্যাধ্যক্ষের সতর্কতা এবং পরিশ্রমের আবশ্যক।

কোদালির নিরিখ ৮ হাত লম্বা নল থাকে তাহার ১ পাশে (যেখানে একেবারে প্রথম কোদালি দিতে হয় সেখানে স্থানবিশেষে) অন্যূন ৮ নল অনধিক ১২ নল নিরিখ দেওয়া হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগকে প্রথম কোদালির স্থানে দেওয়া উচিত নহে। প্রথম কোদালির স্থানকে "আদ্দা" বলে। দ্বিতীয় কোদালির সময় পূর্ব্বাপেক্ষা দেড়া (অর্থাৎ ১২র স্থলে ১৮ ইত্যাদি) করিতে হয়। তৃতীয় বারের সময় পূর্ব্বের দ্বিগুণ (১২র স্থলে ২৪ ইত্যাদি)। স্থানবিশেষে ২০ হইতে ৩০ নল পর্য্যন্ত নিরিখ থাকে। স্ত্রীলোকদিগের এতদপেক্ষা কম নিরিখ থাকে। পুরুষের ৫ ভাগের একভাগ কম (২৫র স্থলে ২০ ইত্যাদি)।

লাইন বন্দি কোন স্থানে ৩ জনেও করে, কোন স্থানে ৪ জনেও করে; ২ জনে বেত বা শিকল ধরিয়া থাকে। অপর ২ বা ১ জনে চিহ্নিত স্থানে খুঁটা পুঁতিয়া যায়। ৪ জন হইলে অল্প সময় লাগে, ৩ জনে ২০শত কি ২১ শতের বেশি পারে না, ৪ জনে ৩০ শত পর্য্যন্ত পারে, ইহার নিরিখ ঐ রূপ।

পাতি তোলা কাজ প্রায় স্ত্রীলোকেরাই করে, তাহারা পাতি তুলিয়া আনিলে কাঁচা পাতি ওজন দিয়া পাউণ্ড প্রতি এক পয়সা হিসাবে দিতে হয়; যে যত তোলে সে তত পয়সা পায়।

---

* সর্দ্দার ভাল থাকিলে প্রায় এরূপ দুষ্টামি হয় না। উপযুক্ত কার্য্যাধ্যক্ষকে ঠকান কষ্ট, এক দিন এরূপ দেখিলেই দেশের সহিত আর পুত্রের সহিত আত্মীয়তা করিয়া দেয়।

বাগিচার কুলি প্রভৃতির যে গরু থাকে সেই সকল গরুর গোবর একটী গর্ত্তের মধ্যে জমা করিয়া রাখে; ডিসেম্বর কি জানুয়ারি মাসে সেই সকল গোবর গাছের গোড়ায় দিয়া দিতে হয়। সমুদায় ক্ষেত্রস্থ গাছে ঐরূপ হওয়া সম্ভব নয়, এজন্য এক এক বৎসর এক নম্বরে দিতে হয় এবং কোন্ বৎসর কোন্ নম্বরে দেওয়া হইল তাহা ঠিক রাখিতে হয়। ইত্যাদি।

১২।—চার উপদ্রব এবং তন্নিবারণের উপায়।*

চা সম্বন্ধে প্রাকৃতিক উপদ্রব যাহা আছে,—যথা অতি বৃষ্টি অনাবৃষ্টি ইত্যাদি তাহা এস্থলে বর্ণনীয় নয়। তদ্ভিন্ন কতক গুলি উপদ্রব ঘটে তাহাই এস্থলে বর্ণনীয়।

চার চারার কোমলাবস্থায় এক রকম পোকা লাগিয়া গাছের গোড়া কাটিয়া দেয়। কিঞ্চিৎ শক্ত হইলে অগ্রভাগ কাটিয়া ফেলে; এই পোকাকে মাল পোকা বলে। মাল পোকা মাটির নীচে গর্ত্ত করিয়া থাকে। ইহার উপদ্রব যেখানে অধিক সেখানে ক্ষেত্রে বীজ বপন করা বিধেয় নহে এবং চারাও বড় হইলে রোপণ করা উচিত। কুলিদের ছেলে ছোকরা দিয়া কতক মারিয়া ফেলা যায় তাহাদিগকে দুই একটা করিয়া পয়সা দিতে হয় কিন্তু তাহাতে নিবারণ হয় না। ইহার আর এক উপায় আছে; পার্ব্বতীয় প্রদেশে প্রায়ই মুলি বাঁশ মেলে, সেই সকল বাঁশের চুঙ্গা করিয়া গাছটি মধ্যে রাখিয়া চুঙ্গাটি মাটির মধ্যে ১ কি ১॥ ইঞ্চি পরিমাণ বসাইয়া দিতে হয় এবং চুঙ্গা এমন পরিমাণ লম্বা রাখিতে হয় যে, চারার অগ্রভাগের উপরেও ২।১ ইঞ্চি থাকে। কিছু দিন এই ভাবে থাকিলে চারা একটু শক্ত হইলে আর অনিষ্ট করিতে পারে না।

গাছ অপেক্ষাকৃত বড় হইলে আর এক প্রকার পোকা ধরিয়া গাছে মূল কাটিয়া দেয়, তাহাকে বলে 'উলুপোকা'। ক্ষেত্রে উপযুক্ত সময়ে কোদালি না দেওয়ায় ঘাস জঙ্গলাদি আবৃত হইলে এই পোকা জন্মে, যে যে স্থানে এইরূপ পোকা জন্মে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সেই সকল স্থানে অতি গভীর কোদালি দিয়া পরিষ্কার রাখিতে হয়, এইরূপে ২০ দিন অন্তর দুই তিন বার কোদালি দিলেই, সে পোকার অত্যাচার নিবারণ হয়।

আর এক প্রকার পোকা গাছে বাসা বাঁধিয়া থাকে, তাহাকে পোকা বলিয়া সহসা চেনা যায় না, যেন একটা খড় কি বনের কোন অংশের ন্যায় দেখা যায়। পোকার উপরিভাগে বন খড়ের ন্যায় শুষ্ক একটা আবরণ থাকে সেইটি ফেলিয়া দিলে মধ্যে একটি পোকা পাওয়া যায়, এই পোকাকে ল্যাদা পোকা বলে। ইহারা গাছে থাকিয়া পাতা খায়, ইহা নিবারণের জন্য সোরার জলের সহিত কিঞ্চিৎ কার্ব্বলিক এসিড মিশ্রিত করিয়া ছড়াইয়া দিলে আর থাকে না।

আর এক প্রকার পোকা অন্য সময় থাকেনা গাছে কলম দেওয়ার পর নূতন পাতি উঠিতে আরম্ভ হইতে দেখা দেয় অর্থাৎ কেবল বসন্ত ঋতুর প্রাক্‌কালে। ইহার পর আর থাকে না (স্থানীয় লোকেরা ইহাকে তুত জাতীয় পোকা বলে) এবং গাছে ডিম পাড়িয়া যাখিয়া যায়। এই সময়ে তাহা হইতে পোকা জন্মে আমরা ইহার প্রত্যক্ষতা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। ইহারা গাছের নূতন কোমল পত্র সকল খায়, ইহাতে পূর্ব্বোক্ত ঔষধ প্রয়োগে নিবারণ হয়।

গাছের এক প্রকার রোগ জন্মে। গাছ কলম দেওয়ার পর নূতন পাতি উঠিবার সময় ধলা দুগ্ধের বর্ণ পাতি হয়, ইহাকে "লাধরা" বলে। লাধরা রোগ জন্মিলে আর সে গাছে পাতি দেয় না। তাহা নিবারণের জন্য কিছু লাল মাটির সহিত সদ্য গোবর একত্রে জলে মিশ্রিত করিয়া গাছে ছিটাইয়া দিতে হয়; তাহা হইলেই ক্রমে শ্বেত বর্ণ দূর হইতে থাকে এবং নূতন পাতি দিতে আরম্ভ করে।

আরও এক প্রকার রোগ আছে তাহাকে গুটিবান্ধা বলে। গাছের কোন কোন ডালে স্থূলাকার একটি গুটির ন্যায় হয়, তাহা হইলে আর প্রশাখা নির্গত হয়না এবং ক্রমে শুষ্ক হইয়া যাইতে থাকে। যে গাছের কোন এক ডালে একবার এই গুটিবান্ধা রোগ জন্মিয়া ডাল শুকাইয়া যায়, (সংক্রামক রোগের ন্যায়) সে গাছের ক্রমেই সকল ডালে ঐ রোগ দেখা যায়। এই জন্য ঐ গুটিবান্ধা রোগের লক্ষণ দেখিলেই, যে স্থানে গুটি থাকে তাহার ২। ৩ অঙ্গুলি নীচে ডাল কাটিয়া ফেলিয়া দিতে হয় তাহা হইলেই তাহার নিম্নস্থান হইতে পুনরায় প্রশাখা বাহির হয়।

এই সকল উপদ্রব যে সকল স্থানের সকল চা বাগিচায়ই ঘটিয়া থাকে কি ঘটিবে তাহা নয়, ঘটিলেও ক্ষেত্রের মধ্যের কোন একটা অংশে কি দশ পাঁচটা গাছে ঘটে। বিশেষ অনুসন্ধান না করিলে সকলের চক্ষে তাহা পড়েও না। আর একটী অবস্থা প্রায় সচরাচর সকল স্থানেই ন্যূনাধিক্যরূপে ঘটে। এক প্রকার পাতা হয় তাহাকে বাঞ্জী পাতি বলে। অর্থাৎ বন্ধ্যাপাতি, আর পাতি হইতে দেয় না, পাতি তোলার সময় সেই পাতি ছিঁড়িয়া না ফেলিলে আর পাতি হইতে দেয় না। পাতি তোলার দোষেই অধিকাংশ এরূপ ঘটে।

১৩।—কলম করার নিয়ম।

চা বৃক্ষের শাখা প্রশাখা সকলের অগ্রভাগ কাটিয়া দেওয়াকে কলম করা বলে, গাছ কলম দেওয়ার সময়ের উপযুক্ততা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। গাছ অন্যূন ২ ফিট উচ্চ না হইলে আর কলম দেওয়ার উপযুক্ত অবস্থা হয় না। তবে ২০ কি ২১ ইঞ্চি পরিমাণ উচ্চ হইয়া যদি অধিক শাখা প্রশাখাবিশিষ্ট হয় তবেও কলম দেওয়ার উপযোগী মনে করা যাইতে পারে।

সকল কুলি কি সকল সরদারই ভাল কলম করিতে পারে না। কলম দেওয়ার দোষ গুণে গাছ পাতি কমও দেয় বেশিও দেয়; গাছ সতেজ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। প্রথম বৎসর কলম দিতে গাছের অবস্থা বুঝিয়া অন্যূন ১৫।১৬ ইঞ্চি না রাখিয়া কলম দেওয়া উচিত নহে; ক্রমে প্রতিবৎসর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উঠাইয়া (১৮।১৯ ইঞ্চি রাখিয়া) কলম দিতে হয়, গাছ ক্রমে বড় হইলেও কোন অবস্থায়ও ২॥ ফিটের উর্দ্ধে আর কলম দিতে হয় না। দুই ফিট রাখিয়াই কলম দেওয়া প্রচলিত নিয়ম। একটা হিসাব রাখিতে হয়, যে বৎসর যে পরিমাণ রাখিয়া কলম দেওয়া হইয়াছিল, পরের বৎসর তাহার নীচে কলম করা না হয়। গাছের নিম্নভাগ হইতে কি মূল হইতে যে সকল শাখা প্রশাখা বাহির হয় তাহা একেবারে সম পরিমাণ হয় না এবং তাহা এক উচ্চ রাখিয়াও কলম দেওয়া যায় না। তাহার কোমলতা অনুসারে কলম দিতে হয় অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত যে অংশ

কোমল শাখাই কলম করিতে হয়। তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা ঐ সকল শাখা প্রশাখা কলম কাটার ন্যায় তেরছা করিয়া কাটিতে হয়। ক্রমে শ্রেণী মতে নীচা হইয়া আসে দেখিতে সুন্দর একটি ঝাড়ের ন্যায় দেখা যায়। গাছের শুষ্ক ডাল, গুটিবাঁধা ডাল, বাঙ্কীডাল, (একপ্রকার ডাল বন্ধ্যা হয় অর্থাৎ তাহাতে আর শাখা প্রশাখা হয় না কেবল ফুল ফল হয়) কাটিয়া দিতে হয় গাছের মধ্যে অন্যবিধ লতা গুল্মাদি থাকিলে তাহা পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়, যেন পর্য্যাপ্তপরিমাণে রৌদ্র, বৃষ্টি, শিশির, বাতাস, প্রবেশ করিতে পারে। কলম না দিলে গাছে ডাল পালা অধিক হইয়া ঝাড় বাঁধে না। কলম দেওয়াতে ক্রমে এক একটী গাছ এমন ঝাড় বাঁধে যে, ৩ কি ৪॥ ফিট পরিমাণ যে গলি থাকে উভয় দিকের গাছে তাহা প্রায় ভরিয়া যায়।

কলম দেওয়ার সময় গাছে ফল ফুল যাহা থাকে তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে হয়, যে গাছে ফল ফুল অধিক হয় তাহাতে শাখা প্রশাখা কম হয় পাতিও কম হয়। *

জানুয়ারি মাসই গাছ কলমদেওয়ার উপযুক্ত সময়, গাছ একবার কলম দেওয়ার উপযুক্ত হইলে প্রতিবৎসরই জানুয়ারি মাসে কলম দিতে হয়। কলম দেওয়ার পর, ক্রমে শীতও কমিতে থাকে। গাছেও নূতন শাখা পত্র বাহির হইতে থাকে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম মাসের মধ্যেও কল দেওয়া হইয়া থাকে।

১৪।—কুলি।

চাবাগিচার কুলিই প্রধান উপকরণ। যে স্থানে কুলির অভাব ঘটে না সুলভে এবং সুবিধায় পাওয়া যায়, সেই প্রধান সুবিধা মনে করিতে হয়। কুলি সংগ্রহ, কুলি রক্ষা করিয়া রাখা একটী প্রধান কাজ। তদ্ভিন্ন চা গাছিচা করার আর কোন উপায় নাই। কয়েকটি উপায়ের দ্বারা এই কুলি সংগৃহীত হইয়া থাকে।

কলিকাতায় এবং অন্যান্য স্থানে কুলি ডিপো আছে। সেই সকল

* গাছে ফুল ফল অধিক হওয়া ক্ষেত্রের মৃত্তিকার দুর্ব্বলতার লক্ষণ।

ডিপো হইতে কুলি আনিতে হয়। কুলিদের ২টা শ্রেণী আছে, এক শ্রেণী হিন্দুস্থানী, রাঁচি, নাগপুর, বীরভূম, মেদিনীপুর, কটক, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, প্রভৃতি স্থানের কুলিদিগকে জঙ্গলি বলে, ইহারাই ভাল কুলি। পরিশ্রমী স্ত্রী পুত্র পরিবারাদি সব আসে, ইহারা অপেক্ষাকৃত নীরোগী এবং প্রায় পালায় না। ছাপরা, আরা, গাজিপুর, বাঁকীপুর, মোজফরপুর প্রভৃতি স্থান হইতে যে কুলি আসে তাহাদিগকে হিন্দুস্থানী বলে, ইহারা অবাধ্য উদ্ধতস্বভাব আষাঢ় শ্রাবণ মাস পড়িলেই (যে সময় বাগিচার কাজের অধিক আবশ্যক) পীড়িত হয়, অধিকাংশই স্ত্রীপুত্রাদি নিয়া আসেনা (যাহারা স্ত্রীপুত্র বিহীন তাহাদিগকে "ডেফুয়া" বলে) এবং পলায়; মাদ্রাজ বোম্বে হইতে কুলি আনিতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহারাও এই শ্রেণীভুক্ত। ডিপোতে এই দুই শ্রেণীর দরের ন্যূনাতিরেক আছে, বর্ত্তমানে প্রতি জঙ্গলি কুলিতে ১০০৲ টাকা, হিন্দুস্থানীতে ৭৫৲ টাকা, বাঙ্গালি ডিপোতে কিছু কম; এ ভিন্ন যাতায়াত খরচ। এইরূপ কুলি-সংগ্রহে যে কত ব্যয় পড়ে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু এক সুবিধা এই, ৩ বৎসরের এগ্রিমেণ্ট থাকে (এসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের আইন আছে পলাইলে গুরুতর দণ্ড পায় এবং এগ্রিমেণ্টের অবশিষ্ট কাল খাটিয়া দিতে হয়) নিয়মানুসারে কাজ করিতে হয়, পুরুষদের মাসিক ৫৲ টাকা স্ত্রীলোকদের ৪৲ টাকা বেতন থাকে। সাহেবেরা এই কুলিই অধিক সুবিধা মনে করেন কারণ ইহাদের একেবারে হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা তাঁহারা। অদৃষ্ট লিপির লেখনী তাঁহাদেরই হাতে।

আর এক প্রকারে কুলি সংগৃহীত হয়, বাগিচায় যে কুলির সরদার থাকে (৫ জন ৭ জন ১০ জন ১৫ জন কুলি যে সংগ্রহ করিয়া আনে সেই সরদার হয়। ইহাদের কার্য্যদক্ষতানুসারে ৭ হইতে ১০ টাকা পর্য্যন্ত বেতন থাকে) সেই সরদারেরা লাইসেন্স নিয়া কুলি আনিতে যায়, তাহারা কুলি আনিয়া এরূপ আইনমতে ৩ বৎসরের এগ্রিমেণ্টে আনে, ইহাতে ব্যয় অনেক অল্প হয়।

আর এক প্রকারে সংগ্রহ হয়। এই সকল বিদেশী কুলি যে বাগিচায় আসিয়া থাকে, তাহাদের এগ্রিমেণ্টের মেয়াদ অতীত হইলেও অধিকাংশই

পুনরায় দেশে যায় না, পুনরায় তাহারা এক এক বৎসরের এগ্রিমেণ্ট দিয়া অন্যান্য বাগিচায় কাজ করে সেই এগ্রিমেণ্ট দিবার সময় তাহাদিগকে (স্থান বিশেষের নিয়মানুসারে) ১৪ টাকা হইতে ১৮ টাকা পর্য্যন্ত দিতে হয়। স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষ অপেক্ষা ৪ টাকা কম দেওয়া হইয়া থাকে। এক এক হাজিরিতে পুরুষের ৵০ আনা স্ত্রীলোকের ৵১০ আনা। ইহারা অনেকে এগ্রিমেণ্ট না দিয়া কাজ করে, তাহাদের হাজিরির দাম কিছু বেশি দিতে হয়। পুরুষ ৵১৫ পয়সা ও স্ত্রীলোক ৵০ আনা।

এতদ্ভিন্ন স্থান বিশেষে স্থানীয় কুলিও পাওয়া যায়; আসামি, কাছাড়ি, মণিপুরী, নাঙ্গালী, ইত্যাদি। ইহারা অন্য স্থানে গিয়া কাজ করে না, ইহারা আপন ইচ্ছাধীন কাজ করে, তাহাতে বাগিচার কার্য্যের সুবিধা হয় না। কিন্তু ইহারা যদি নিয়ম মত হাজির হইয়া কার্য্য করে তবে অনেক সুবিধা হয় এবং ব্যয়ও অনেক কম পড়ে।

কুলিদের বাসা করিবার ঘর দিতে হয়। লম্বা লম্বা ঘর করিয়া ১০ হাত এক এক কোঠা করিয়া দিতে হয়; তাহাকে কুলি লেন বলে। রোগাবস্থায় চিকিৎসা করিতে হয়, যে বাগিচায় পূর্ব্বোক্ত রূপের তিন বৎসরের এগ্রিমেণ্টের কুলি থাকে সেখানে ঔষধ এবং ডাক্তার না রাখিলে আইনানুযায়ী দণ্ড পাইতে হয়। স্থানীয় রাজকীয় কার্য্যকারকেরা সময় সময় তাহার তদন্ত করিয়া থাকেন *। এতদ্ভিন্ন ইহারা যে গো মেষাদি পালে তাহার রক্ষক এবং গোবর ফেলিয়া পরিষ্কার করার জন্য লোক নিযুক্ত করিতে হয়।

কটকের কএদি যেরূপ পাহাড়ায় থাকে এবং কামস্থানিকে আনে নেয় ইহাদিগকে সেইরূপে রাখিতে হয়। কুলির সংখ্যানুসারে চৌকিদার অল্পাধিক রাখিতে হয় তাহারা পাহাড়ায় থাকে, কাজে বাহির করে, গণতি দেয় নেয় ইত্যাদি।

অনেকে বলেন যে কুলিদের প্রতি অত্যাচার হয়, কিন্তু সময়

* এ সকল কেবল শাস্ত্রে আছে মাত্র, কেবল রীতি রক্ষা করা বই কিছুই নহে। ঔষধ প্রায় সোডা ও এসিড কুনিয়ান কাষ্টের অএল ভিন্ন প্রায় থাকে না। ডাক্তার ও প্রায়ই কম্পাউণ্ডার থাকে, রাজকীয় কার্য্যকারকেরা বাগিচায় আসিয়া খানা খাইয়া যান।

সময় ইহারাও এক দুষ্টামি করে যে তখন বাধ্য হইয়া অত্যাচার না করিয়া পারা যায় না। যাঁহারা এখন এরূপ নিন্দা করেন ক্রন্দন করেন তাঁহারা নিজে বাগিচা করিলে তাঁহাদিগকেও তদ্রূপ ব্যবহার করিতে হয়। কুলিরা তদ্রূপ ব্যবহার ভিন্ন ভাল থাকে না।

১৫।—চা ক্ষেত্রের উপযোগী যন্ত্র এবং দ্রব্যাদি।

১। দাও—ইহা স্থানীয় লৌহ কর্ম্মকারের দ্বারাই প্রস্তুত হয় এবং জঙ্গল কাটা ইত্যাদি কার্য্যে ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহার সাধারণ মূল্য সকলেই অবগত আছেন।

২। কুঠার অথবা কুড়ালি—ইহা দেশি ও ব্যবহার হয় এবং বিলাতিও হয় (বস্তুত তাহা কলিকাতায়ই প্রস্তুত হইয়া থাকে, তবু নাম বিলাতি) বিলাতি গুলিকে তবল বলে, তবল সহসা ভাঙ্গিয়া যায় না, এবং তীক্ষ্ণধার। ১২ টাকা হইতে ১৮ টাকা পর্য্যন্ত ইহার ডজন বিক্রীত হয়, দেশি কুড়ালির মূল্য অবগতই আছেন। বৃহৎ বৃক্ষাদি কাটিতে ব্যবহার হয়।

৩। কোদাল—চা ক্ষেত্রে ইহারই অধিক আবশ্যক এবং বার মাস ব্যবহার্য্য, আমাদের দেশী কোদালে এ কায চলে না, বৃক্ষ লতা গুল্ম ইত্যাদি নানা সিকড় থাকে, পাথর থাকে; দেশী কোদাল একদিন ব্যবহার করিলেই অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। বিলাত হইতে একপ্রকার কোদাল প্রস্তুত হইয়া আসে ১ আদিক্রমে ৯ নম্বর পর্য্যন্ত আছে। ৫ নম্বরের নীচে যে কোদাল তাহা ভাল নহে, নম্বর ক্রমে ১৩ ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা এবং তদনুরূপ প্রশস্ত থাকে। এই কোদাল অতি সুতীক্ষ্ণ এবং ভাঙ্গে না। একেবারে ক্ষয় হইয়া যায় তবু ভাঙ্গে না ইহার দ্বারা অতি গভীর খনন হয়। ইহার ডজন ৮ হইতে ১২ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রীত হয়।

৪। তে কাটা, পাঁচকাটা—ইহার ইংরাজী নাম থ্রী ফ্রাক এবং ফিপ ফ্রাক। ইহাতেও কোদালির ন্যায় বাঁট লাগাইয়া কোদালির ন্যায় ব্যবহার করিতে হয়। কোদালি যেমন সমভাবে লোহা একখানি

লোহ পাতের ন্যায়, ইহা তদ্রূপ নয় যেমন তেকাটা পাঁচ কাটা নাম সেইরূপই এক জাতিতে ৩টি করিয়া কাটা, এক জাতিতে ৫টি করিয়া কাটা থাকে। সকল স্থানে ইহার ব্যবহার আবশ্যক হয়। যে সকল স্থানে পাথরের খণ্ড অধিক থাকে সেই সকল স্থানে ইহার ব্যবহার আবশ্যক হয়। ইহার ও মূল্য কোদালের ন্যায়।

৪। ছুরি,—চা বৃক্ষ কলম করিবার সময় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা সমেত ৭।৮ ইঞ্চি লম্বা হয়, অগ্রভাগ ঈষৎ বক্র; ইহাও বিলাত হইতে প্রস্তুত হইয়া আসে, দেশি ভাল কর্ম্মকার দ্বারা ও ইহা প্রস্তুত করিয়া লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু অত্যন্ত সুতীক্ষ্ণ হওয়া আবশ্যক। বিলাতির মূল্য ডজন প্রতি অন্যূন ১০ টাকা, দেশে ৪ টাকায় প্রস্তুত হয়।

৫। বেত্র অথবা শিকল—পাইনবক্সির জন্য ব্যবহৃত হয়। তাহার পরিচয় স্থানান্তরে দেওয়া হইয়াছে।

৬। টুকরি,—বাঁশের চটার দ্বারা প্রস্তুত হয়, ইহা দেশী লোকেরাই প্রস্তুত করিয়া থাকে, ./ আনা হইতে ॥৵ আনা পর্য্যন্ত কুড়ি বিক্রী হয়। চা'র পাতি তুলিবার ব্যবহারে আবশ্যক হয়, এক একটি কক্ষে বাঁধিয়া পাতি তোলে।

৭। বড় চালা,—বাঁশের চটা দ্বারা ২॥ হাত ৩ হাত লম্বা ২ হাত পাশ, দেশেই প্রস্তুত করিয়া লওয়া যায়; এক এক খান ৵৹ আনা ।৹ আনা করিয়া বিক্রয় হয়। কাঁচা পাতি তুলিয়া আনিয়া রৌদ্রে দিতে হয়।

৮। চালনি—ইহা অনেক রকম আছে। একরকম বাঁশের বেতির নির্ম্মিত, সে গুলিন চিন দেশের প্রস্তুতীয়; একরকম বিলাতি, সে গুলিন পিতলের গুণায় নির্ম্মিত। এই উভয় প্রকারের মধ্যেই জাতি ভেদ আছে। ১২ নম্বর পর্য্যন্ত চালনি থাকে, চা জাতি দিতে লাগে। এই চালনির দ্বারা চা'র জাতি বিভাগ করিতে হয়। জাতি বিভাগ করিতে ১০ হইতে ১২ নম্বর চালনি অধিক ব্যবহার্য্য। বাঁশের চালনী ৩ হইতে ৬ টাকা পর্য্যন্ত মূল্য। বিলাতি গুলিন ৫ হইতে ১০ টাকা পর্য্যন্ত মূল্য হয়।

৯। টেবেল—দেশি মিস্ত্রির দ্বারা সাধারণ তক্তা দিয়া ২ হাত ২॥৹ হাত পাশে এবং ৮হাত ১০ হাত লম্বা করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়।

তাহার উপর পাত রোল করিতে হয়। প্রস্তুত করিতে ১০। ১২ টাকার অধিক ব্যয় পড়ে না।

১০। বাক্স—চা প্যাক করিবার জন্য আবশ্যক হয়, অর্থাৎ বাক্স ভরিয়া পাঠাইতে হয়। এক একটার মূল্য ১টাকা হইতে ১।৹ পর্য্যন্ত পড়ে।

১১। টিলেড—একরকম সীসার পাত। বাক্সে চা ভরিবার সময় এই পাত দিয়া বাক্সের মধ্য মুড়িয়া দিতে হয়। ওজন করিয়া পৌণ্ড হিসাবে বিক্রয় হয়। এক এক পৌণ্ড ৵০ আনা ৵১০ আনা মূল্য।

১২। রঙ্গা—বাক্স মুড়িবার সময় সীসার পাত সকল আঁটিয়া দিবার জন্য ব্যবহার হয়। রাঙ্গের খাণ্ডামাত্র, ইহা ওজনে বিক্রয় হয়। পৌণ্ডের দাম ।০ আনা ।৵০ আনা।

১৩। তাঁতাল—রঙ্গ গালিয়া যদ্বারা সীসার পাত আঁটে; এইটা গরম করিয়া রাঙ্গের উপর ধরিলেই গলিয়া যায়। কাঁসারি দোকানে যদ্বারা রঙ ঝালা করে ও সেই যন্ত্র আর বিভিন্নতা নাই। ইহার এক একটার মূল্য ৵০ আনার অধিক নয়।

১৪। পরিমাণ যন্ত্র—ইহা যেরূপেই যিনি ব্যবহার করুন মোট কথা ওজন করিবার জন্য।

রোল করিবার জন্য এক রকম কল প্রস্তুত হইয়াছে। বড় বড় বাগি-চায় সেই কলের দ্বারা পাত্তি-রোল করা হয়, তাহাতে কার্য্যের অনেক সুবিধা হইয়াছে। যে কার্য্যে ১০০ শত কুলি খাটিত তাহা এখন অন-ধিক ১০ জনের দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে।

এ ভিন্ন চা শুকাটি দিবার জন্য চুলা, কয়লা, ফ্রেমযুক্ত এক এক খানি টিনের পাত আবশ্যক। চুলা সকল সারি করিয়া (কাঁচা পাকা দুই থাকে অর্থাৎ ইটের এবং মাটির) নীচটা অল্প পরিসর থাকিয়া ক্রমে উপরে অধিক পরিসর হয় একহাত দীর্ঘ প্রস্থের অধিক হয় না। একটি পরিমাণ উচ্চ হয়। নীচে মুখ থাকে, তদ্দ্বারা কয়লা দিয়া বাতাস দিতে হয়। উপরে থাক থাক আছে। এক এক খান টীনের ফ্রেম তাহার উপরে দিয়া চা দিতে হয়। স্তরে স্তরে সাজান যায় ইচ্ছায়।

১৬।—চা পত্র চয়ন।

সাধারণতঃ ইহাকে পাতি তোলা বলে, এপ্রিল মাস হইতে পাতি তোলা আরম্ভ হইয়া নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত তোলা হয়। কিন্তু স্থানীয় প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ইহার বিভিন্নতা আছে। আসাম কাছাড় শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানের সাধারণ নিয়ম এই, পাতি তোলাও শিক্ষা করিতে হয়। পাতি তোলার দোষে গাছে পাতি কম হয়। যে পাতির গোড়া দিয়া দ্বিতীয় কুড়ি দেওয়ার সম্ভব হইয়াছে কি আছে তাহা ভাঙ্গিলে আর ডগা বাহির হয় না, পাতি কম হয়। চা গাছের পাতি না ভাঙ্গিলে গাছে পাতি দেয় না। ক্রমে ডগা ভাঙ্গিয়া দিলে নূতন ডগা হইতে আরম্ভ হয়।

গাছের যে সকল ডগা বাহির হয়, (অবস্থা বিশেষে) তাহার দুই পাতি, আড়াই পাতি, তিন পাতি, সাড়ে তিন পাতি পর্য্যন্ত ডগা সহ ভাঙ্গিয়া লইতে হয়। আড়াই পাতি সাড়ে তিন পাতি কিরূপে তোলে? দুই পাতি সহ ডগা ভাঙ্গিতে হয়। যদি দেখা যায় যে তাহার নিম্নের পাতিও কোমল আছে, অথচ তাহার গোড়া দিয়া কুঁড়ি লইয়াছে তবে সেই পাতার অর্দ্ধাংশ গাছে রাখিয়া উপরিভাগের অর্দ্ধাংশ ছিঁড়িয়া লইতে হয়। সাড়ে তিন পাতিও এই নিয়মে তুলিতে হয়। পাতা সকল একটু বড় হয়, অথচ কোমল না থাকে এই অবস্থায় তুলিতে হয়। একেবারে ছোট পাতি তুলিলে, তাহাতে চা মন্দ হয় না, কিন্তু আয় দেয় না।

গাছের অবস্থা ভাল হইলে এবং ভালরূপ তুলিতে পারিলে প্রতি-সপ্তাহে একবার পাতি তোলা যায়। এপ্রিল হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত ৩০। ৩২ বার পাতি তোলা যায় অবস্থা বিশেষে ইহার কম বই অধিক আর হয় না। ১৫। ১৬ বারও কোন কোন স্থানে তোলা হইয়া থাকে।

পাতি তোলা হইলে তাহা ওজন করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত পরিমাণানুসারে পয়সা দিতে হয়, কাঁচা পাতি মোট কত হইল তাহা জানা যাইতে পারে; চা প্রস্তুত হইলে কাঁচা পাতির এক চতুর্থাংশ হয়।

যে বৎসর গাছের পাতি প্রথম তোলা যায় তৎপর [illegible]র দ্বিগুণ

পরিমাণের পাত্তি উঠিবে। তৎপর বৎসর তাহার দেড়া উঠিবে, তৎপর বৎসর দেড়ার কিছু কম হইবে। কিন্তু এই সময়ে যাহা উঠিবে তাহাই স্থায়ী।

১৭।—চা প্রস্তুত প্রণালী।*

যত কিছু পরিশ্রম এবং কার্য্যদক্ষতা, সমুদয় পরীক্ষাস্থল চা প্রস্তুত করা। প্রস্তুত প্রণালীর দোষ গুণেতে মূল্যের ন্যূনাতিরেক হয়, (গত ২।৩ বৎসর চার বাজার সস্তা ছিল,) প্রস্তুত প্রণালীর দোষ গুণে কোন বাগিচার চা (প্রতি পাউণ্ড) ৸৹ আনা ৷৴৹ আনা, কোন কোন বাগিচার চা ১৶১০ আনা বিক্রয় হইয়াছে।

চার পাত্তি তোলা হইলে, (চা ক্ষেত্রের উপযোগি যন্ত্রাদির ৭ সংখ্যক) বড় চালায় পাতা সকল ছড়িয়া রাখিয়া দিতে হয়। তাহাকে ধুপ দেওয়া বলে। ঘরের মধ্যে ঐ চালা সকল স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখিতে হয় যেন সমস্ত পাতাতেই বাতাস লাগিতে পারে। পাতা ধুপ দিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়, পাতার অধিক ধুপ থাকিলে রং জলিয়া যায়। ধুপ অল্প হইলে পাত্তি বোল হয় না ভাঙ্গিয়া যায়, পাতার গাত্রস্থ রসটা একটু টানিলেই হয়। অত্যন্ত গরম দিন হইলে ৫।৬ ঘণ্টায় ধুপ হয়, বৃষ্টি বর্ষার সঁতিকে দিন ঠাণ্ডা হইলে এক দিন বা তদধিকও লাগে। রং জলিয়া গেলে পাতা সকল ঈষৎ নীল বর্ণ হয়। অধিক ধুপ হইলে চার রং ভাল হয় না, গন্ধ ভাল হয় না এবং বিস্বাদ হয়।

পাত্তি ধুপ হইলে (৯ম সংখ্যক) টেবলের উপর রাখিয়া দুই হাঁতে ডলিতে হয়। (সে ডলিবার নিয়ম, সে হাতের ভঙ্গী আমি লিখিয়া কি অঙ্কিত করিয়া বুঝাইতে পারি এমন সাধ্য নাই) এক এক জনে একবারে ১ পাউণ্ডের অধিক পাত্তি ডলিতে আরম্ভ করা ভাল নয়, অথচ একিবারে অল্প নিলেও ডলা যায় না। এক এক বার কতক্ষণ ডলিয়া, ডলিলে যে দলা বাঁধে তাহা ভাঙ্গিয়া ঝর ঝরা করিয়া টেবেলের উপর ছড়িয়া রাখিতে হয়। পুনরায় একত্র করিয়া ডলিতে আরম্ভ করিতে হয়, এইরূপে

* ওয়াকার সাহেব নামক এক ব্যক্তি এই চা প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে এক-খানি [illegible] লিখিয়া ১৪ শত টাকা কপি রাইট বিক্রয় করিয়াছেন।

তিন চারিবার দল। ভাজিয়া ছড়িয়া ডলিতে হয়। (ছড়িয়া দেওয়াকে হাওয়া দেওয়া বলে) এই বারের পর পাতি সকল একত্র করিয়া ২ হাতে চাপিয়া একটী স্তূপ করিয়া রাখিয়া একখানা মোটা কাগজ অথবা কম্বলের দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে হয়। অনধিক ১০ মিনিট পরে পুনরায় ঐরূপ নিয়মে ডলিতে হয় এবং ডলারি সময় পাতা হইতে যে রস নির্গত হয় ঐ রস পুনঃ প্রবেশ করাইতে হয় এইরূপ তিনবার ডলার পর যে ঢাকিয়া রাখা যায়, সেই ঢাকার পর, যদি অধিকাংশ পাতি হরিদ্বর্ণ ধারণ করে তবেই রোল করা উত্তম হইয়াছে জ্ঞান করিতে হইবে। প্রথম রোল, দ্বিতীয় রোল তৃতীয় রোলের ভিন্ন ভিন্ন লোক থাকে, যাহারা অশিক্ষিত তাহারা প্রথম রোল করে, যাহারা উত্তম শিক্ষিত তাহারাই তৃতীয় রোল করে, কারণ তাহাদের রং চেনা আবশ্যক। অল্প ডলার রং আসিলে অল্প দিয়া রাখে, অধিক আবশ্যক হইলে অধিক দেয়। যাহারা প্রথম রোল করে তাহারা অবিশ্রান্ত অনবরত তাহাই করে, এইরূপ শ্রেণীমত কার্য্য করে (২০পাউণ্ড করিয়া পাতি শেষ ডলা হইলে এক এক হাজরি পুরা হয়) এই পাতির উক্ত রূপ রং আসিলে আর বিলম্ব করিতে হয় না তখনই ভাটিতে চড়াইতে হয়, বিলম্ব হইলে চাতে দুর্গন্ধ হয়।

পাতি রোল করার দ্বারাই চায় রং ঠিক হয়। অনেকে গ্রীণ চা নাম শুনিয়া থাকিবেন। এ সময় ইহার বড় আদর ছিল, এখন আর তাহা নাই। গ্রীণ চা প্রস্তুতে পরিশ্রম কম। প্রথম রোল হইলেই সমস্ত পাতা গ্রীণ রং থাকিতেই ভাটি দেওয়া হইত (তখন ভাটি দেওয়ার জন্য বড় বড় লোহার কড়া ব্যবহার হইত) এবং ভাটিও কড়া (অর্থাৎ বেশী তাপ) দেওয়া হইত না। বস্তুত এখন যে প্রণালীতে চা প্রস্তুত হইতেছে তদপেক্ষা গ্রীণ চা ভাল ছিল না।

রোল করার সময় যে রং থাকে, চাও জলও সেইরূপ রং লইয়া থাকে। রোলের দ্বারা রং, ভাটির দ্বারা ঘ্রাণ জন্মে, একটির দোষে গুণের সঙ্গে অন্যটীর গুণও নিকট, ভাটির দোষে রং খারাপ হয় এবং রোলের দোষে ও ঘ্রাণ খারাপ হয়।

ভাটি দিবার যে যন্ত্রাদির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে অর্থাৎ ড্রেস যুক্ত

টিনের পাত্রের উপর চালনি বড় করিয়া ঐ রং হওয়া পাতি অল্প পরিমাণ ছড়িয়া চুলার উপর দিতে হয় স্তরে স্তরে দিতে হয়, এবং পুনঃ পুনঃ উল্টাই পাল্টাইয়া দিতে হয়। চুলার কয়লা হইতে কোনরূপে ধূম না উঠে অথবা আগুন জ্বলিয়া না উঠে কেবল তাপ লাগে। ধূঁয়া লাগিলে গন্ধ খারাপ হয়। চালনির নিচে টিনের পাত্র দিবার কারণ এই যে চালনির মধ্যে দিয়া চা-পাতার ভগ্নাংশ আগুনে পড়িয়া ধূঁয়া না হয়, এবং তাপও অধিক না লাগে।

প্রথমতঃ এইরূপ ভাটি দিয়া রাখা হয়। শেষ বাক্স বন্ধ করিবার সময় আর একবার ভাটি দিতে হয় তাহাকে পাকা ভাটি বলে। তখন তাপ দ্বারা কেবল গরম হইলেই বাক্স বোঝাই করিয়া বাক্সের উপর বন্ধ করিয়া রাখে। কেহবা প্রথম ভাটির সময় শেষ ভাটির কাজ সারিয়া বাক্স বন্ধ করিয়া থাকেন।

রোলের কার্য্য কলের দ্বারা হইতেছে, কিন্তু তাহাতে নির্গত রস পুনঃ প্রবেশ করানের সুযোগ নাই, যদ্দ্বারায় উত্তম চা প্রস্তুত হইতেছে না। অপেক্ষাকৃত কম দরে বিক্রয় হয়, কিন্তু তাহাতেও ক্ষতি হয় না পরিশ্রমের মূল্যও কম দিতে হয়।

১৮।—চার জাতি বিভাগ।

চিন এবং জাপান চার জন্মভূমি, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। চার যে সকল নাম তাহাও ঠিক চাই নিজ ভাষাতে, ইদানীং সাহেবেরা তাহার কতক শাখা প্রশাখা বাহির করিয়াছেন।

চা প্রধানতঃ ৪ জাতি যথা। পিকো, সুসঙ্গ, কাঙ্কু, সয়রা। পিকো হইতে আর দুইটী শাখা বাহির হইয়াছে, ফ্লেওয়ারি পিকো; আর ব্রোকিং-পিকো। গাছের যে ডগা ভাঙ্গা যায়, তাহার অগ্রভাগের পাতা পিকো হয়, তন্নিম্ন পাতা সুসঙ্গ হয়। তন্নিম্ন পাতা কাঙ্কু, তন্নিম্ন পাতা সয়রা হয়। অগ্রভাগের পাতার সর্ব্বাগ্রে যে অঙ্কুর পত্রটী থাকে যাহাকে সাধারণ ভাষায় কুঁড় অথবা কুঁশিপাতা বলে, সেইটি সর্ব্বাগ্র ভাগে ফুলের [illegible] বলিয়াই ফ্লেওয়ারি-পিকো নাম দেওয়া হইয়াছে।

ইহা পৃথক রূপে প্রস্তুত করিয়া কোন ব্যবসায়ী লোক বাজারে বিক্রয় করে না, অথবা ইহা পৃথক করিবার উপযোগী যন্ত্রও এ পর্যন্ত বাহির হয় নাই। ইহা কেহ কখন সখ করিয়া কতক অল্প পরিমাণ পৃথকরূপে প্রস্তুত করে, অথবা কোন বিশেষ সম্ভ্রান্ত লোককে উপহার দিবার জন্য প্রস্তুত করে। ইহা যে সর্বাপেক্ষা উত্তম তাহা এখন আর অধিক বলিবার বোধ হয় আবশ্যক নাই।

ব্রোকিং পিকো—ইহাই (ফ্লেওয়ারি পিকো এবং পিকোর কোমলাংশ যাহা চালনির সময় ভগ্ন হইয়া পড়ে তাহা) ইহাই সাধারণতঃ সর্বাপেক্ষা উত্তম চা বলিয়া পরিগণিত। পিকো দ্বিতীয়, সুসঙ্গ তৃতীয়, কাংকু চতুর্থ, মম্বরা পঞ্চম। মম্বরা অতি নিঃকৃষ্ট চা ইহা অধিক হয়ও না। তিন পাতার নীচের পাতা প্রায় কেহ তোলে না। যাহাদের ইষ্টিমিটের মাল পোষায় না তাহারাই কতক তুলিয়া থাকে।

এই সকল পৃথক করিবার জন্য চালনি আছে (৮ম সংখ্যক যন্ত্র) তদ্দ্বারা পৃথক করিতে হয়। প্রথমত ১২ নম্বর চালানিতে দিলে যাহা পড়িয়া যায় তাহা ব্রোকিং পিকো হয়, ১১নম্বর চালানিতে দিলে যাহা পড়িয়া যায় তাহা পিকো হয়, ১০ নম্বর চালনিতে দিলে যাহা পড়িয়া যায় তাহা সুসং হয়; ৯ নম্বর চলনিতে যাহা পড়ে তাহা কাংকু, যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা মম্বরা।

চার স্বাদ, ঘ্রাণ, রং এই তিনের দ্বারা উত্তমতা অধমতা স্থির করা এবং স্বাদ বুঝা সকলের পক্ষে সহজ নয় এবং নিতান্ত সহজে তাহা বুঝান কষ্ট। চার ঘ্রাণ ঈষৎ মিষ্ট হয়। (ভাটি উত্তম হইলে তখন তাহা হইতে দুগ্ধের ন্যায় ঘ্রাণ নির্গত হয়) তাহাই উত্তম; চা যে প্রণালীতে প্রস্তুত করিয়া খাইতে হয়, সেইরূপ প্রস্তুত করিয়া একটা কাচের গ্লাস (টী-প্রুফ গ্লাসই একরকম আছে, যাহউক সাধারণ গ্লাসেও বুঝা যায়) ঢালিলে উজ্জ্বল তাম্রবর্ণ হইলে তাহা উত্তম।

১৯।—বিবিধ কার্য্য প্রণালী।

চা-ক্ষেত্র করিতে উপযুক্ত কার্য্য দক্ষতারই অধিক আবশ্যক। কৃষক জীবনের সমুদয় লক্ষণ থাকা উচিত। বি এ, এম এ না হইলে যে কার্য্য-

দক্ষতা জন্মিতে পারে না তাহা নয়, কতকটা শিক্ষা না থাকিলেও হয় না, কিন্তু শিক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্প থাকিয়াও কার্য্য দক্ষতার আবশ্যকতা আমরা অধিক মনে করি।

অনেক বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়। চা-গাছের গোল করা দেখিতে হয়, ছাটি দেওয়া দেখিতে হয়, পাতি তোলা দেখিতে হয়। প্রত্যেক সময়ের কোদালির পর্য্যায়ানুসারে লোক নির্ব্বাচন করিতে হয়। প্রতি দিন ৬ ঘটিকার সময় কুলির গণতি দিয়া কোথায় কোন্ কার্য্যে কত জন থাকিবে তাহা নির্ণয় করিয়া দিতে হয়। পর দিনের কার্য্য পূর্ব্ব দিনই ঠিক করিয়া রাখিতে হয়। নচেৎ কুলি সকল উপস্থিত হইলে তখন তাহা স্থির করিতে বিলম্ব এবং গোলমাল হইয়া অনেক সময় যায়। মনে করুন ৪শত লোকের অর্দ্ধ ঘণ্টা বিলম্ব হইলে একজনের প্রায় ২০ দিন বাদ পড়িয়া যায়। অন্যূন সপ্তাহে একবার কুলি-লেন দেখিতে, ময়লা দুর্গন্ধাদি থাকিলে পরিষ্কার করিতে সাবধান করা আবশ্যক, নচেৎ ব্যারাম জন্মে। রুগ্ন কুলিদিগের অবস্থা দেখিতে হয়। ডিস্পেন্সরি দেখিতে হয়, কত ঔষধ কিসে ব্যয় হইল তৎসম্বন্ধে ডাক্তারের সাপ্তাহিক রিপোর্ট দেখা আবশ্যক। রোগীর সংখ্যা কত, আরোগ্যের সংখ্যা কত, এ সকল হিসাব করিতে হয়। সময় মতে কুলিদের ঘর দরজা প্রস্তুত মেরামত ও করাইতে হয়। তজ্জন্য যথাসময়ে ছন বাঁশ ইত্যাদি কাটাইয়া মজুত রাখিতে হয়। চা প্রস্তুতের সময়াগত হইবার পূর্ব্বেই ভাটি দিবার কয়লা প্রস্তুতের বন্দোবস্ত করিতে হয়। চা প্যাক করিবার বাক্সের বন্দোবস্ত করিতে হয়। যে স্থানে মেস্তরি রাখিয়া বাক্স প্রস্তুত করিলে সুবিধা হয় সেখানে আরও অধিক সুবিধার কথা। কার্য্যোপযোগী যন্ত্রাদি যথাসময়ে সংগ্রহ করিয়া মজুত রাখা আবশ্যক যে, অভাবে কার্য্যের ক্ষতি না হয়। মালামাল আমদানি রপ্তানির বন্দোবস্ত পূর্ব্বেই করিয়া রাখা উচিত, নচেৎ সময় মতিকে বন্দোবস্ত করিতে বেশী ব্যয় পড়ে। বাগ কাবারে কুলি প্রভৃতির বেতনাদি দিতে হয়, যদিও হিসাব কিতাব লিখিবার অন্য লোক থাকে, তত্রাচ তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। এবং নিজের [illegible] মোটা মোটি ব্যয়ের একটা হিসাব রাখিতে হয়, তাহার

মাসকাবার সাপ তামাদি প্রস্তুত করা, এবং আগামী বৎসরের আয় ব্যয়ের ইষ্টমিট প্রস্তুত করিতে হয়। পূর্ব্ববৎসরের ইষ্টমিটের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সতর্ক ভাবে ব্যয় করিতে হয়। আয় পূরণ করিবার জন্য যত্ন রাখিতে হয়। কোন স্থানে সুবিধা মত অন্যান্য ফল ফুলের বাগিচা করায় কি তৎপ্রতি মনোযোগ করিতে হয়। বাগিচার সীমান্ত স্থানে মূল্যবান বৃক্ষাদির চারা আনাইয়া রোপণ করিতে হয়। ইত্যাদি বহুবিধ কার্য্য করিতে হয়। কার্য্য-ক্ষেত্রের আয়তন ছোটই হউক কি বড়ই হউক সকলের পক্ষেই এ সমস্ত আবশ্যক।

এপর্য্যন্ত কার্য্যাধ্যক্ষের বাসস্থান সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা হয় নাই। কৃষকের বাসস্থান নির্ব্বাচন অধ্যায়ে যাহা লিখিত হইয়াছে কার্য্যাধ্যক্ষের বাসস্থান সেইরূপ মধ্য স্থানে হওয়া আবশ্যক। সেই স্থলের নিয়মানুসারেই করিতে হয়, চা-ঘর কিছু ব্যবধানে করিতে হয়। যদি ক্ষেত্রের আয়তন অনেক বড় হয় তবে কুলি-লেন ২।৩ ভাগে অর্থাৎ দূরবর্ত্তি দূরবর্ত্তী স্থানে করিলে সুবিধা হয়; নচেৎ একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে যাইতে অনেক সময় যায়। যাহারা চা ঘরে ভাটির কাজ রোলের কাজ ইত্যাদি করে তাহাদের বাস করিবার স্থান চা-ঘরের নিকটবর্ত্তী স্থানে থাকাই উচিত। তাহাতে যাতায়াতের সময় বৃথা ব্যয় হয় না। কিন্তু একেবারে এমন নিকট থাকা উচিত নয় যে, সেই কুলি-লেনে অগ্নি লাগিলে চা-ঘরের অনিষ্ট হইতে পারে এবং এই অগ্নি কাণ্ডের জন্যও চৌকিদার এবং কুলিদিগকে সতর্ক করিয়া দিতে হয়।

২০।—আয় ব্যয়।

চা-ক্ষেত্রের আয় ব্যয়ের বিষয় অনেক সময় অনেকের মুখে শুনা যায়, এবং সময় সময় কোন কোন পত্রিকাদিতেও দেখা যায়, সে সকল নিতান্ত অসম্পূর্ণ হিসাব। তাহার প্রতি নির্ভর করিয়া কোন ব্যক্তি এরূপ বৃহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না, আমরাও যে ইহার রীতিমত বিস্তার বিবৃতিযুক্ত হিসাব দেখাইয়া দিতে পারি এমন সময় নাই এবং তাহাতে অনেক আবশ্যক করে। আমরা এস্থলে কেবল মোটামোটি একটা ব্যয়, উৎপন্ন এবং লাভের নক্সা দেখাইব।

চাকরদিগের একটা মোট হিসাব আছে কিন্তু সে সাহেবি হিসাবের সঙ্গে বাঙ্গালি হিসাবের ঠিক ঐক্য হয় না। যাহা হউক তবু সেই হিসাবের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখাইতেছি। তাঁহারা প্রথম বৎসরের জঙ্গল কাটা এবং জমির বন্দোবস্ত করায় খরচ ভিন্ন একার প্রতি ১০০৲ টাকা করিয়া ব্যয় ধরেন। তৎপর প্রতিবৎসরই এই হিসাব কিন্তু ম্যানেজারের খরচ ইহার অতিরিক্ত কার্য্যক্ষেত্রের আয়তনানুসারে ১জনও থাকে ২জনও থাকে। এসিষ্টেণ্ট যে থাকে তাহারা প্রায় এপ্রেণ্টিসের ন্যায়; তবু তাহার খরচপত্রের জন্য অন্যূন ১৫০৲ টাকা মাসিক বন্দোবস্ত থাকে। হেড ম্যানেজার ৩০০ হইতে হাজার বারশত পর্য্যন্ত থাকে। কাজেই বাঙ্গালী হিসাবে ঐক্য হয় না। বাঙ্গালীর এত ব্যয় পড়ে না; তবে তাহারা কার্য্য ক্ষেত্রের আয়তন অত্যন্ত বৃদ্ধি করে বলিয়া পোষাইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন ও তাহাদের ঘোড়া, সৈস, চৌকিদার, পাঙ্খাওয়ালা সর্দ্দার ইত্যাদির খরচ এবং ট্রাবলিং। মনে করুন ২০০ শত একার বাগিচা করিয়া ৩০০৲ টাকা ম্যানেজারকে দিতে হয়, এ ভিন্ন তাহার অন্যান্য খরচ ও ১০০ টাকা পড়ে তাহার প্রতি একার ২৪ টাকা করিয়া বার্ষিক ব্যয় পড়িতেছে, তবে ১২৪ টাকা করিয়া একার প্রতি খরচ পড়িল। এস্থলে বাঙ্গালী ষ্টেটে ১০০ টাকার স্থলে ৭০ টাকা এবং ২৪ টাকার স্থলে ১৫ টাকা—এই ৮৫ টাকা হইলে সেই কাজ উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে।

১০০ একার পরিমাণ একটা বাগিচার আয় ব্যয় ধরিয়া দেখাইতেছি। কিন্তু ১০০ একার ন্যূন বাগিচা করা আমরা কাহাকে পরামর্শ দেই না, তবে যাঁহারা ঘরের খাইয়া বাটী বসিয়া করিতে পারেন তাঁহাদের পক্ষে ৫বিঘা ৭বিঘা যাহা করেন সেই লাভ, তাঁহাদের সঙ্গে কোন কথা নহে যাহাদের ভিন্ন স্থান হইতে কার্য্যাধ্যক্ষ রাখিয়া বাগিচা করিতে হয় তাহার পক্ষে ১০০ একারের কম বাগিচা করিতে হইলে ষ্টাবলিসমেণ্ট ব্যয় বেসি পড়িয়া যায়, অর্থাৎ ৫০ একারে বাগিচায় ম্যানেজারকে যত দিতে হইবে সেই ম্যানেজারের দ্বারা ১০০ একার বাগিচায় কার্য্যও নির্ব্বাহ হইতে পারিবে।

১০০ একার বাগিচার আয় ব্যয়ের মোট তালিকা।

প্রথম বাৎসরিক ১০০ একার জমীর বন্দোবস্ত বাবত (গবর্ণমেণ্টের রেট অনুসারে) ব্যয়
১০০৲

জঙ্গল কাটা খরচ অনধিক
২০০৲

একার প্রতি ইষ্টমিট খরচ ৭০ টাকা হিসাবে——
৭০০০৲

ম্যানেজারের খরচ অনধিক মাসিক ১০০ টাকা হিসাবে
১২০০৲

অন্যান্য খরচ——
১০০৲

৮৩০০৲

৮৩০০৲

দ্বিতীয় বাৎসরিক——
৮৩০০৲

১৬৬০০৲

তৃতীয় বৎসরে নিয়মিত ব্যয়——
৮৩০০৲

চা ঘর প্রস্তুতের লওয়াজিমা ইত্যাদি——
৫০০৲

অতিরিক্ত কুলি গং
৫০০৲

বাকস ও অন্যান্য খরচ
২০০৲

১২০০৲

৯৫০০৲

১৬৬০০৲

৯৫০০৲

তৃতীয় বৎসরের সময় একার প্রতি অন্যূন ১/ মণ করিয়া ১০০/ মণ চা উৎপন্ন হইবে তাহার মূল্য ৭০টাকা হিসাবে
৭০০০৲

এই বৎসরের ব্যয়িত টাকা হইতে তাহা বাদ দিলে যত থাকে তাহা মূলধনে যোগ হইবে——
২৫০০৲

১৯৪০০৲

এই থানে আরও ৬০০ টাকা রিকার্ভ যোগ করিলে২০,০০০ টাকা মূলধন হইল——
৬০০৲

২০,০০০৲

উৎপন্ন বাজার চা মূল্য	বাৎসরিক অবশিষ্ট ব্যয় লাভ	প্রতি শতকরা বাৎসরিক বৃদ্ধি লাভ হয়
৪। তৃতীয় বৎসরের দ্বিগুণ এইবৎসর হইবে সুতরাং ২০০/ ১৪০০০৲	তৃতীয় বৎসর অপেক্ষা কার্য্য বাড়িলেও ব্যয় অধিক হবে না কারণ এই বৎসর চা ঘর ইত্যাদিরখরচ লাগিবে না সুতরাং সেই ৯৫০০৲ ৪৫০০৲	অবশিষ্ট রিজার্ভ ২২৲ ১০০৲
৫। চতুর্থ বৎসরের দেড়া উৎপন্ন হবে সুতরাং ৩০০/২১০০০৲	পূর্ব্বাপেক্ষা এই বৎসর অতিরিক্ত ৫০০ টাকা ব্যয় পড়িবে—— ১০,০০০৲ ১১০০০৲	৪৫৲
৬। এই বৎসর পূর্ব্ব বৎসরের দেড়ার কিছু কম হইবে ৪০০/২৮০০০৲	এবৎসরেও অতিরিক্ত ৫০০ টাকা ব্যয় হইবে ১০৫০০৲ ১৭৫০০৲	অবশিষ্ট প্রতি-বৎসর রিজার্ভ ফণ্ডে থাকিবে ৭৫৲ ২৫০০৲

ষষ্ঠ বৎসরের সময় চা বাগিচার যে আয় ব্যয় ধার্য্য হয় তাহা এক প্রকার স্থায়ী; বিশেষ কোন অবস্থা ভিন্ন ইহার ন্যূনাতিরেক হয় না। ব্যয় বাড়িলেও রিজার্ভের অতিরিক্ত হয় না এবং আয় কম হইলে শতকরা ৭৫ টাকার কম হইবার সম্ভব অতি কম। উৎপন্নের ও উচ্চ রেট ধরা হয় নাই এবং ব্যয়ও কম ধরা হয় নাই। তবে অতি সাধারণ কিছু ন্যূনাতিরেক হইতে পারে।

মূল ধনের ৬০০ টাকা রিজার্ভ আছে তদ্ভিন্ন চতুর্থ বৎসরের ১০০ এবং ষষ্ঠ বৎসরের ২৫০০০ মোট ৩০,২০০ টাকা থাকিল। এ ভিন্ন প্রতিবৎসর ২৫০০ টাকা জমিয়া থাকিবে। কম্পানী ভাবি আশঙ্কা নিবারণের অতিশয় সুবিধা হইবে।

তুত। *

তুতের চাষে কৃষি প্রণালীর বিশেষ কোন গুণাগুণের আবশ্যকতা আমরা বোধ করিতে পারি না। মাত্র চাষ করিয়া পাতা তুলিয়া বিক্রী করিলেও কৃষকের অধিক লাভ হয় না। ১/ মণ পাতার মূল্য অনধিক ১৲ টাকা। ১/ বিঘা তুতের ক্ষেত্রে ৮ কি ৯ মণের অধিক ব্যবহার উপযোগী পাতা সংগ্রহ হয় না, সুতরাং ইহাতে আমরা কৃষকের অধিক লাভ দেখিতে পাই না। বিশেষ সকল স্থানে মাত্র তুতের চাষ করিয়াও ফল হয় না যেখানে কুঠি ইত্যাদি থাকে সেই সকল স্থানে চাষাদি চলিতে পারে। তুতের চাষ বীরভূম, বর্দ্ধমান, ভাগলপুর, মালদহ, মুরশিদাবাদ, রাজসাহি প্রভৃতি স্থানেই অধিক। তুতের কৃষি প্রণালী অপেক্ষা Manufacture প্রণালীই অধিক।

সাধারণতঃ সমতল ভূমিতে, যাহাতে জলপ্লাবিত না হয় তদ্রূপ ভূমিতেই তুতের চাষ হইতে পারে। উক্ত প্রদেশ সকলের কৃষকদিগকে তুতের চাষ করিতে অধিক সার ব্যবহার করিতে দেখা যায় নাই। আমাদের মতে সার দিলে যে ভাল হইতে পারে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তুতক্ষেত্রে অস্থিচূর্ণ সার আমরা উত্তম উপযোগী মনে করি। যে উদ্ভিদে দৃঢ় কাষ্ঠ সংস্থিত হয় এবং যাহার শাখা পত্রাদি বর্দ্ধন করাই অধিক আবশ্যক তাহার পক্ষেই অস্থিচূর্ণ সার উত্তম ব্যবস্থা। ক্ষেত্রে ৭।৮ বার চাষ দিয়া ৫ হাত অন্তর এক একটী করিয়া গর্ত্ত করিয়া (অন্যূন আধ হাত অনধিক মুঠুম হাত লম্বা তুত গাছের ডাল কাটিয়া) সেই কাঠি সকল চারি অঙ্গুলী পরিমাণ উপরে রাখিয়া পুঁতিতে হয়। কাঠি সকলের উপরিভাগে এক এক দলা কাঁচা গোবর লাগাইয়া দিলে ভাল হয়। † রৌদ্রে ডাল কাটিয়া গেলে

---

* আমরা ইহার চাষ আবাদ করি নাই, কেবল অনুসন্ধানের দ্বারা এবং পুস্তকাদি পাঠ দ্বারা যতদূর জানিয়াছি তাহাই এস্থলে প্রকাশ করা যাইতেছে।

† সাধারণ কৃষকেরা তাহা দেয় না। আমরা গোলাপ প্রভৃতির ডাল পুঁতিতে দিয়া দেখিয়াছি তাহাতে শুষ্ক হইয়া চারা বাহির পূর্ব্বে জন্মাইতে পারে না।

আর তাহাতে গাছ হয় না। এক এক পার্শ্বে ৩।৪ চারি খানা করিয়া ডাল পুঁতিতে হয়। কার্ত্তিক মাসে তুতের চাষ করিতে হয়। যত দিন কাটি সকল উত্তমরূপ লাগিয়া নূতন পাতা বাহির না হয় তাবৎকাল ক্ষেত্রে জল সেচিয়া দিতে হয়। যে বৎসর ক্ষেত্রে প্রথম কাটি পোতা হয়, সে বৎসর পাতা কম হইয়া থাকে। তুতের গাছ এক বৎসর লাগাইলে ৩ বৎসর থাকে, দ্বিতীয় তৃতীয় বৎসরে গাছের ডাল সকল কাটিয়া ফেলিতে হয় এবং গোড়ার মাটী খুঁড়িয়া আলগা করিয়া দিতে হয় এবং ঘাস জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। তুতের চাষ সম্বন্ধে এইতকই ; এখন তাহার ব্যবহার বলা যাইতেছে।

তুতের গাছ ৪ জাতীয়, সার, ডোর, চিনা, দেশী। প্রথম প্রকার তুতের পাতা কীটদিগকে প্রথম খাওয়ায় না আমাদের দেশের পক্ষে চিনা এবং দেশী এই উভয় জাতিই অধিক ব্যবহার্য্য। পোকাদিগের সকল অবস্থায়ই ইহা খাওয়ান যায়। তুত গাছের নূতন পাতা সকল কীটদিগকে খাওয়াইতে হয়। কীটদিগকে অল্প পরিমাণে পাতা খাওয়াইলে তাহা হইতে গুটি এবং সূতা উত্তম হয় না।

তুতের কৃষকদিগর কীট প্রতিপালনের জন্যে পৃথক গৃহ থাকে। ঐ গৃহ সকল সাধারণতঃ ১৬হাত দীর্ঘ এবং ১০হাত প্রস্থ হইয়া থাকে; এক এক গৃহে ৫টী করিয়া মাচা থাকে। মাচার পায়া সকলের নিম্নভাগ জলে ডুবান রাখা আবশ্যক; নচেৎ পিপীলিকা ইত্যাদি উঠিয়া পোকা সকলকে নষ্ট করিয়া ফেলে। গৃহের দরজা এবং জানালা দক্ষিণ ও পূর্ব্বাভিমুখে রাখা হয়। এক এক মাচায় ১৬ খানি করিয়া ডালা থাকে, মহিষের মল দ্বারা ডালা সকল লিপিয়া রাখিতে হয়, তাহাতে পোকা ভাল থাকে।

তুতের কৃষকেরা ফাল্গুন মাসের শেষ কতকগুলি স্ত্রীজাতি এবং কতকগুলি পুরুষ জাতি কীটের গুটি একটা মাটির পাত্রে রাখে, সেই গুটি হইতে ৮।১০ দিন পর প্রজাপতি বাহির হয়। শেষ ২।১ দিনের মধ্যে স্ত্রীজাতি প্রজাপতি গুলি ডিম্ব পাড়িতে থাকে, এক একটী প্রজাপতিতে ৩৫০টা পর্য্যন্ত ডিম্ব প্রসব করে। কিন্তু সচরাচর ১১২ টার অধিক প্রায় প্রসব করে না। এই কীট সকল ডিম্ব প্রসব করিতে বিলম্ব করিলে কৃষ-

কেরা উহাদিগের নিকট দীপ আনিয়া আগে দীপের আলো দেখিলেই ডিম্ব প্রসব করিতে সমর্থ হয়, ডিম্ব সকল সরিষার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয়। এই কীট সকল চারি জাতি। পলুকীট, দেশী, চিনা, এবং বর্ণসঙ্কর। দেশী, এবং চীনা কীট উৎকৃষ্ট ; ইহারা এক বৎসরের মধ্যে ১০।১২ বার ডিম্ব প্রসব করে। কীটের জাতিভেদে এবং ঋতুর গুণানুসারে ডিম্ব ফুটিতে সময়ের ন্যূনাধিক্য হয়। শীতকালে স্বভাবতই ডিম্ব ফুটিতে বিলম্ব হইয়া থাকে। গৃহ সর্ব্বদা উষ্ণ রাখার জন্য যত্নপর থাকা আবশ্যক। গৃহ উত্তম রূপ উষ্ণাবস্থায় রাখিতে পারিলে ৩।৪ দিনে ডিম্ব ফুটিয়া কীট বাহির হয়। তখন কৃষকেরা তুঁতের কোমল পত্র সকল ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া গৃহস্থিত পূর্ব্বোক্ত ডালায় রাখে, কীট সকল ঐ ডালায় থাকিয়া ঐ পত্র সকল খাইতে থাকে। এক ডালার পত্র খাওয়া শেষ হইলে অপর এক ডালায় কোমল পত্র সকল দিয়া দিলে কীটগণ নূতন পত্রের সঙ্গে পূর্ব্ব ডালা পরিত্যাগ করিয়া নূতন ডালায় প্রবেশ করে। ডালা পরিবর্ত্তন না করিলে কীটগণ আপন মল মূত্রের এবং মৃত কীটাদির দুর্গন্ধে মরিয়া যায়। (এক প্রকার মাছি আছে তাহারা কীট সকলের পেটে ডিম্ব পাড়ে তাহাতে কীটগণ শীঘ্র শীঘ্র গুটি বান্ধে, কিন্তু গুটি বান্ধা শেষ না হইতেই ঐ ডিম্ব সকল পোকা বাহির হইয়া গুটি খাইতে থাকে তাহাতে গুটি সকল একেবারে অব্যবহার্য্য হইয়া যায়।) কীটগণ চারি দিন পাতা খাইয়া নিদ্রিত হইয়া থাকে। কৃষকেরা তাহাকে [illegible] ঘুম কহে। নিদ্রা ভাঙ্গিলে পুনরায় পাতা খাইতে থাকে। এইরূপ ৪ বার নিদ্রিত হয় এবং জাগরিত হয়। শেষ ক্ষুধা মন্দ হইলে ১০ দিনের পর কীট[illegible] দিগের রং মোমের ন্যায় হয়। ইহার পর এককালে আহার ত্যাগ করে। এইরূপে আহার ত্যাগ করিলে আর একটি পাত্রে রাখিতে হয় সেই পাত্রে[illegible] [illegible] তাহাতে ছোট ছোট বাঁশের ফুঁকরি নির্ম্মাণ করিয়া [illegible] এক এক ফুঁকরিতে এক একটী পোকা রাখে, ঐ ফুঁকরিতে পোকা [illegible] গুটি বান্ধে। ঐ সকল গুটিকে কোয়া অথবা কোয়া কহে। গুটি [illegible] ৭।৮ দিনের অধিক রাখে না। কৃষকেরা এই গুটিই ফুটিতে [illegible] [illegible]।

বীজ, গুটি সংগ্রহ, ডিম্ব ফুটান, রেশম প্রস্তুত, বৎসরের মধ্যে তিনবার হইয়া থাকে, ঐ সময়কে বন্দ কহে। আশ্বিন হইতে মাঘ পর্য্যন্তকে প্রথম বন্দ, ফাল্গুন হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত দ্বিতীয় বন্দ, বৈশাখ হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত সময়কে তৃতীয় বন্দ কহে। ইহার মধ্যে প্রথম বন্দ সর্ব্বোৎকৃষ্ট; ঐ সময় কীটগণ অধিক সতেজ থাকায় রেশম ও উত্তম জন্মে।

গুটি কোথাও ওজনে বিক্রী হয়, কোথাও গণতি করিয়া বিক্রী হয়। গুটি ২ প্রকার; শ্বেত এবং পীত। শ্বেত গুটিই উত্তম এবং অধিক মূল্যবান কিন্তু শ্বেতবর্ণ গুটি অতি অল্প হইয়া থাকে। ১/ একমণ গুটিতে সাধারণত অন্যূন /২॥ সের অনধিক /৩। সের পর্য্যন্ত রেশম পাওয়া যাইয়া থাকে।

৪৮টি কীটে এক ছটাক পরিমাণ রেশম পাওয়া যাইতে পারে। তাহার মূল্য (উত্তম হইলে) ৫ টাকা পর্য্যন্ত হয়।

আফিম। *

আফিমের চাষ অগ্রহায়ণ মাসে আরম্ভ হয়। কিন্তু ইহার দুই তিন মাস পূর্ব্ব হইতে ক্ষেত্র খনন করিয়া পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। এ প্রদেশের কাল মৃত্তিকা স্বাভাবিক উর্ব্বরা এবং ইহাতেই আফিম উত্তম রূপ আবাদ হইয়া থাকে। বীজ বপন করিবার সময় কিছু জলের আবশ্যকতা হয়, তাহার পর ঐ সকল বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ যখন পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে সেই সময় অতিশয় জলের প্রয়োজন। গাছগুলি উর্দ্ধে প্রায় দুই হাত পরিমাণ হইলে ফুল হইতে আরম্ভ হয় এবং এই ফুল হইতে ফল হইলে ফুল গুলি পড়িয়া যায়। আফিমের ফুল দেখিতে সাদা এবং লাল। এই ফুল হইতে যে ফল উৎপন্ন হয়, তাহা পরিপক্ক হইলে কৃষকেরা কোন তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা একে একে চিরিয়া দেয়। একটী ফল ৩।৪ বারের অধিক স্থানে স্থানে চেরা যায় না।

---

* আমরা কখনও নিজে আফিমের চাষ করিয়া দেখি নাই।

ইহার ভিতর হইতে যে রস নির্গত হয়, তাহাকে আফিম বলে। প্রতি দিবস অতিপ্রত্যুষে এই রস কোন পাত্রে একত্রিত করিয়া আফিম জমায়। ইহা অতিশয় তেজস্কর এবং ইহার বর্ণ পাপড়ি খয়েরের মত।

আফিমের চাষ পূর্ব্ববাঙ্গলায় কোথাও দেখা যায় না। হিন্দুস্থান প্রদেশে এবং ভাগলপুর পূরুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ইহার চাষ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের মধ্যে মালওয়াই আফিমের জন্য বিখ্যাত। সর্ব্বাপেক্ষা চীনে আফিমের চাষ অধিক, আসাম প্রদেশীয় উচ্চস্থান সমূহেও আফিমের চাষ হইয়া থাকে। যে গাছ হইতে আফিম নির্গত করিয়া লওয়া হয়, তাহার নাম পোস্ত গাছ। পোস্তের দানা অনেক প্রকার ব্যবহারে লাগে। ঐ দানা হইতে তৈল নির্গত করিয়া লওয়া যায়। রৌদ্রের আধিক্য হইলে গাছ ভাল জন্মে না।

নীল।

বীজ পরীক্ষার প্রণালী।

নীলের বীজ ভাল মন্দ পরীক্ষা করিতে হইলে নিম্ন লিখিতমত পরীক্ষা করিতে হয়—

১। কিছু বীজ হাতে নিয়া উভয় হস্ত দ্বারা বীজ ঈষৎ চাপিয়া ধরিলে যদি বীজ ঘামে তাহা হইলে সেই বীজ ভাল।

২। কতকটা বীজ কোন এক পাত্রে এক টুকরা ফ্লানেল দিয়া তাহার উপর বীজ রাখিয়া পূর্ব্ব দিবস জল দিলে পরের দিবস কি তাহার পর দিবস যে বীজ ফাটিয়া উঠে তাহা ভাল।

৩। ১০০ বীজ লইয়া একস্থানে চারা দিলে যদি ৯০টী চারা উঠে, তবে ভাল। কম সংখ্যা ৫০টী উঠিলেও তাহা বাইনের উপযুক্ত। ইহার কম হইলে তাহা বাইন করা উচিত নহে।

নীলের উপযুক্ত ভূমি এবং চাষপ্রণালী।

নীল ভাদ্র মাসের শেষ হইতে কার্ত্তিক মাস এবং ফাল্গুন মাসের শেষ হইতে চৈত্র মাস মধ্যে বাইন করা বিধি। শীতের সময় বাইন করিলে

অর্দ্ধ পরিমাণ চারা উঠে না। যাহা উঠে তাহাও অতি কমতেজ; তবে কোন কোন স্থানে অর্থাৎ যে দেশে বর্ষার জলে শীঘ্র নষ্ট না করে এমত স্থানে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসেও বাইন করা যাইতে পারে। নীল চরা ভূমিতে ভাদ্র মাসের শেষ বর্ষার জল টানিবার সময় ছিট বাইন করা নিয়ম আছে। অর্থাৎ যেমন জল টানিতে থাকে তাহার সঙ্গেং ছিট বাইন করিতে হয়। তাহা হইলে চাষের খরচ অতি কম লাগে, কিন্তু এমত চরা ভূমিতে বাইন করিতে হইবেক যে, বর্ষার জল হঠাৎ আসিয়া অর্থাৎ নীল প্রস্তুত করার নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে নষ্ট করিতে না পারে। আশ্বিন মাস হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত যে জমি বাইন করিতে হয় তাহা সহজ চাষ করিলে ভাল রকম মৈ দিলে বাইন করা যাইতে পারে। ফাল্গুন হইতে চৈত্র মাসের বাইনও ঐ রকম যে জমির উপর ৩।৪ ইঞ্চি বালু থাকিয়া নীচে মাটি থাকে তাহাতে নীল ভাল হয়। চাষ করিয়া বাইন করিলে জমিতে জঙ্গল কম এবং নীলও অপেক্ষাকৃত ভাল হয়; নীল প্রায় সাধারণত সকল মৃত্তিকাবই হয়। নীল ক্ষেত্রে সার দিবার ব্যবস্থা কোথাও দেখা যায় নাই। নীল বীজ বাইন হইলে পৌষ মাস হইতে নীল কাটা সময় তক ক্ষেত্রের মধ্যে যে জঙ্গল হয় অর্থাৎ চরা ভূমিতে ঝাউ ও খাঁগিরা ঘাস ও অন্য যে জঙ্গল হয় তাহা কাটিয়া দিতে হয়। ঐ সকল জমির জঙ্গল কাচি এবং পাচন অর্থাৎ খুরপাই দ্বারা নিরানি করিতে হয়। জঙ্গল ভূমি হইলে বাইনের পূর্ব্বেই কোদালী দিয়া ভূমি ছাপ করিয়া নিতে হয়। নীল সাধারণত বাঙ্গলা সনের জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে ভাদ্র মাসতক কাটিতে হয়। তবে স্থানের উচ্চতা বিবেচনায় কোন কোন স্থানে অর্থাৎ ফরিদপুর যশোহর পাবনা নদীয়া ইত্যাদি উচ্চ স্থানে আষাঢ় মাস হইতে কাটিয়া থাকে। ঢাকা ময়মনসিংহ ইত্যাদি নীচ স্থানের নীল জ্যৈষ্ঠ মাসে কাটিতে আরম্ভ না করিলে জলে নষ্ট করিবার খুব আশঙ্কা আছে। যে স্থানে শীঘ্রই জল উঠিবার আশঙ্কা নাই, ঐ স্থানের নীল একবার কাটিয়া পুনঃ পরমাণী রক্ষা করিয়া রাখিলে পুনঃ যে তাহাতে গাছ হইবে তাহা প্রথম অপেক্ষা ভালও হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত উচ্চ স্থানে নীল প্রথম কাটিয়া রাখ দিয়া থেকে ঐ নীল

বোঝাটা করা যায়। নীল সাধারণতঃ ৫।৬ শিকলে মাপিয়া এক বস্তা হয়।

নীল প্রস্তুতের বিধি—

নীল কাটিয়া আনিয়া অর্থাৎ হাউজে তাহা শ্রেণী মত রাখিয়া তাহার উপরে ৩টা বিম অর্থাৎ বড় রকম কাঠ দিয়া হাউজের দেওয়ালে যে কাঠের বিম আটকানের কাষ্ঠ অর্থাৎ দেওয়ালগীর আছে তাহার মধ্যে লোহার/কা-বিলা দিয়া আটকাইয়া ঐ হাউজ কোনটা ৯ঘণ্টা কোনটা ১০।১১।১২ঘণ্টা তক জল দিয়া রাখিতে হয়. ঐ প্রকার রাখিলে ক্রমে তাহার কষ বাহির হইয়া পোট ছাড়িতে থাকে। ঐ প্রকার জাত দিয়া রাখিলে শেষ যখন দেখা যায় যে গাছের আর কষ বাহির হইতে বাকি নাই অর্থাৎ পোট ছাড়ে না তখন ঐ হাউজের জল বাহির করিয়া দ্বিতীয় হাউজে আনিতে হয়। অর্থাৎ যে হাউজে জল দিতে হয় সেই হাউজের নীচে দ্বিতীয় হাউজে জল আনিয়া সেই জল ছোট২ বাঁশের বৈঠা বানাইয়া ৮জন কুলিদ্বারা তাহা গাজনী অর্থাৎ ঐজল নাড়াইতে হয়। ঐ জল ক্রমে২ ঘণ্টাতক ঐ বৈঠা দ্বারা গাজনী করিলে কষ গুলিন জলের মধ্যে নির্গত হওলে ফেনা হইতে থাকে। ঐ ফেনা জলে মিশাইতে হয়। তাহা গাজনিতে না মিশাইলে তৈলের সঙ্গে জল মিশ্রিত করিয়া ছিটা দিলে মিশিয়া যায়। তৎপরে ঐ জলের মধ্যে নষ্ট দুগ্ধের ছানার মত এক রকম দানা হয়। সেই জল গাজনী ক্ষান্ত করিয়া ২।৩ ঘণ্টা রাখিয়া দিলে নীল নীচে পড়িয়া উপরে জল ভাসে। পরে ঐজল হাউজের মধ্য ভাগে দেওয়ালে যে আজরা অর্থাৎ পিন ক্রমে উচ্চ নীচা মত আছে, ঐ পিন দ্বারা ক্রমে জল কাটাইতে হয়। পিন ছাড়িতে এত সা-বধানতার সহিত ছাড়িতে হয় যে, খুব বেগে জল বাহির হইয়া নীল বাহির হইয়া যায়, ক্রমে জল তাবত কাটান হইলে শেষ ঐনীল ভাল জল দ্বারা ছাপ করিয়া হাউজ হইতে বাহির করিয়া নিবার যে দ্বিতীয় পাম আছে তদ্বারা নির্গত করিয়া নরদামা দিয়া নিয়া কোন রকম Pump অর্থাৎ বোমা কল কি চিনা কি বিলাতি দ্বারা ঐ জল টানিয়া জালের কড়াইতে উঠানের সময় ক্যানেস অথবা কম্বল কি পিতলা ছাকনা দিতে হয়। যেন

কোন প্রকার বালু যাইতে না পারে ঐ জল উঠান হইলে তাহা জাল দিতে হয়, ক্রমে তাহা জাল হইলে অর্থাৎ কড়াইর জল বলকা উঠিলেই নীল জাল হইল। কড়াইর নিকট একটি মেজ আছে; তাহার চতুঃপার্শ্বে বেল আছে ঐ মেজে বাঁশের চালি দিয়া তাহা তেসুতি অথবা ডবল মার্কিনের মোটা একটি চাদর পাতিতে হয়। পরে কড়াইর গরম জল ঐ চাদরে আনিলে ক্রমে চাদরের নীচে পড়িতে থাকে ঐ জল এক জন লোক একটী বোমা কল আবার উঠাইয়া দেয়, পরে জল শীতল হইলে যখন নীল চাদরে জমা হইয়া শুধু জল পড়িতে দেখা যায় তখন আর ঐ জল উঠাইয়া না দিয়া ছাড়িয়া দিতে হয়। কিন্তু ঐ জল এমন সাবধানতার সহিত ছাড়িতে হবেক, যেন কোন গতিকে ঐ জল পুনঃ হাউজে যাইতে না পারে। নীল চাদরে জমা হইয়া জল নিঃশেষ হইলে সমুদয় মেজের নীল অর্দ্ধমেজে জমাইয়া মেজের বাকি অর্দ্ধ ভাগ কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া তাহার উপর সাধারণ ভার দিয়া সেই দিবস রাখিলে পরের দিবস প্রাতে ঐ চাদর উলটাইয়া নীল উঠাইয়া পুনঃ জাত দিতে হবেক, জাত দিবার কারণ কাষ্ঠের এক রকম (Frame) ফরমা আছে, সেই ফরমা দ্বিতীয় একটী কাষ্ঠের উপর বসাইতে হয় এবং ঐ ফরমার চতুঃপার্শ্বের তক্তার ছোট রন্ধ্র আছে কেনবিশ এবং মোটা মারকীন কাপড় তাহার চতুর্দ্দিকে এবং নীচে দিতে হয়। পরে তাহার মধ্যে নীল দিয়া ফরমা পূর্ণ করিয়া তাহার উপর কাপড় দিয়া তাহার উপর একটী কাষ্ঠের ডালা দিয়া ফরমার ২ পার্শ্বে ২টি Scrue পেঁচ আছে ঐ পেঁচের ২ পার্শ্বে ২টি ভারি কাষ্ঠ দিয়া ঐ ২ কাষ্ঠের উপর অর্থাৎ পেঁচের মধ্যে ২ খানা চাপা কাষ্ঠ দিতে হয়। পরে ঐ চাপা কাষ্ঠের উপর পীতলের মহরি দিয়া ক্রমে জাত দিলে ফরমার চতুঃপার্শ্বে যে ছোট ২ রন্ধ্র আছে তদ্বারা জল নির্গত হইয়া শেষ আসল খাটি নীল হয়। পরের দিবস ঐ ফরমা খুলিয়া পীতলের তার দ্বারা কাটিয়া ৩। ৩॥ ইঞ্চি পরিমাণ করিয়া টুকরা টুকরা করিয়া রাখিতে হয়। উক্ত টুকরাকে বড়ি কহে, এক এক ফরমায় ৮০০ বড়ি থাকে অর্থাৎ যাহার যে নিয়ম তাহার মত রাখে। একটী বড়ি ।/ছটাক ওজনে হয়। বড়ি তৈয়ার হইলে পরে তাহা নিয়া গুদামে অর্থাৎ এমন স্থানে রাখিতে হুর

যেন সর্ব্বদা বাতাস যাইতে পারে, রৌদ্র না লাগে। নীল প্রস্তুত করিতে অনেক জলের আবশ্যক এবং সেই জল অতিপরিষ্কার হওয়া উচিত। কোন রকম বালু অথবা অন্য রকম ময়লা না থাকে একারণ পূর্ব্বেই জল উঠাইয়া এক স্থানে মজুত রাখা উচিত। সেই জল Pump অথবা চীনা কল কিম্বা দোলতি কি অন্য কোন রকম কলে না উঠাইলে অনেক খরচ পড়ে এ কারণ কোন রকম একটী জলের কল আবশ্যক। যেদিন যতটি হাউজ হইবে সেই দিন তত পরিমাণে জল আবশ্যক। সময় মতে জলের যোগাড় না হইলে নীল জন্মিয়া যায়, নীলের গাছ সকল এমন সময় কাটিতে হবেক যেন তাহা বর্ষায় জল না পায়। শুকনায় নীল কাটিলে ১০০০ (Bundles) বাণ্ডীলে যদি ৮মণ হয় এক দিবস জল পাইলে ৩মণ ২ দিবসে ২মণ ৩।৪ দিবস পরে কাটিলে তাহাতে কিছুই হবেক না। এ কারণ জলের বৃদ্ধি হ্রাসের একটী ঠিকানা রাখা কর্ত্তব্য এবং তাহা রোজ রোজ লিখিলে অন্য বৎসর সঙ্গে মিল করিলে কোন্ সময় বৃদ্ধি কখন হ্রাস তাহা বিলক্ষণ জানা যায় এবং তাহা হইলে খুব সতর্কতার সহিত কাজ করা যায়।

কখন কোন কল ও পোক্তা কাজের নষ্ট হয়, তাহার নষ্ট উদ্ধার কারণ মিস্ত্রী লোহার কামার, রাজমিস্ত্রী আবশ্যক।

সম্পূর্ণ

পরিশিষ্ট।

শত ভাগ শুষ্ক গোবরে ২৮'০২৪ ভাগ দাহ্য পদার্থ, এই পদার্থে ০৬'৪৩ মাত্র ক্ষার জল হইবে। সুতরাং ২০০, মণ গোবরে ॥৩॥৶ ক্ষার জল বা ৸.৶ আমোনিয়া হইবে। শতভাগ গোবরে ৫'৫৯ ভাগমাত্র অদাহ্য পদার্থ এই অদাহ্য পদার্থের ২৭'৫৫ ভাগ জলে দ্রবণীয়, আর ২০'৪৫ ভাগ অদ্রবণীয়।

অদাহ্য পদার্থের দ্রবণীয় ২৭'৫৫ ভাগে—

বালুকা	৪'২৫
অস্থিসার	৫'৩৫
চুণ	১'১০
ম্যাগনেসিয়া	০'২০
সোরা	০'৯২
পটাস	১০'৬
লবণ	০'৫৪
গন্ধক অম্ল	০'২২
অঙ্গার অম্ল ইং	৪'৭১
	২৭'৩৫

অদ্রবণীয় ২৭'৪৫ ভাগে—

দ্রবণীয় বালুকা	১৭'৩৪
অদ্রবণীয় বালুকাময় পদার্থ ...	১০'০৪
অস্থিসার	৬'৮৮
লৌহ ইত্যাদি	১'৫৯
চুণ	২০'২১
ম্যাগনেসিয়া	২'৫৬
পটাস	১'৭৪
সোরা	০'৩৮
গন্ধক অম্ল ... ... —	০'২৭
অঙ্গার অম্ল ইং	১০'৪০
	৭১'৪১
	৯৮'৭৬